শ্রদ্ধার্ঘ্য

অতুলপ্রসাদ সেন

অতুলপ্রসাদ সেন

শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী
সম্পাদিত

বাক্-সাহিত্য প্রাঃ লিমিটেড
৩৩, কলেজ রো
কলিকাতা ৯

অতুলপ্রসাদ সেন জন্ম-শতবর্ষপূর্তি উৎসবে শ্রদ্ধার্ঘ্য

প্রকাশক :
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড,
৩৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

মূল্য : দশ টাকা

উৎসর্গ

সাহিত্যবন্ধু, সুকবি ও যশস্বী চিকিৎসক

শ্রীগোরাচাঁদ নন্দী

সুহৃদবরেষু

সূচী

শ্রদ্ধার্ঘ্য ঃ

অতুলপ্রসাদের রচনা ঃ

পূর্বাভাস

উনবিংশ শতাব্দী। বিধাতার আশীর্বাদপুষ্ট এই শতকে বঙ্গজননীর অঙ্ক আলোকিত করে বহু মহামানবের আবির্ভাব শুধু বঙ্গদেশ নয়—ভারতবর্ষকেও গৌরবের সুউচ্চ শিখরে উন্নীত করেছিল। শিক্ষা-দীক্ষায়, সমাজ-সচেতনতায়, আধ্যাত্মিক-সাধনায়, স্বদেশ-সেবায়, সাহিত্য-চর্চায়—নানা দিকের সতর্ক প্রহরী, এক একজন দিকপালসদৃশ।

এমনই এক চিহ্নিত যুগে খ্যাতনামা গীতিকবি এবং পূর্বকালীন সংযুক্ত প্রদেশের অবিস্মরণীয় প্রতিভাধর পুরুষ অতুলপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করেন ২০শে অক্টোবর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ঢাকা শহরে। অবসান—'প্রবাসে দৈবের বশে' নয়—নিজ পরম প্রিয় কর্মভূমি লখনৌ নগরীর নিজ নিকেতনে ২৬শে অগষ্ট, ১৯৩৪-এ রাজকীয় মর্যাদায়।

কালের দুর্লঙ্ঘ্য দূরত্বে অনেক প্রতিভাই সাধারণ নিয়মে স্মরণাতীত লোকে অন্তর্হিত হয়। অতুলপ্রসাদ এ বিধানের একটি উজ্জ্বল ক্রমভঙ্গ। দিন দিন তিনি আপন মহিমায় ভাস্বর। আরও প্রকাশমান। তাঁর সংগীত ধনীর প্রাসাদ বা গৃহস্থের অপরিসর গৃহপ্রাঙ্গণ সমভাবে সঞ্চারী। অমৃত-নিষ্যন্দিনী তাঁর গানের সুরধারা বঙ্গবাসী ও বঙ্গভাষীর অন্তরলোকে নিত্য বহমান।

অতুলপ্রসাদের অভিধার সঙ্গে যুক্ত আপামর বাঙালি মানসের কাছে তিনি একবাক্যে কবি ও গীতিকাব্য রচয়িতা। এ সংসারে যেন এই তাঁর সীমাবদ্ধ পাথেয়।

অথচ একদা এই দীপ্তিমান কর্মযোগীর বিভূতি প্রভাবে সমস্ত উত্তর-ভারত আচ্ছন্ন।

ব্যবহারজীবী মহলে তাঁর প্রসিদ্ধি সুদূরপ্রসারী।

সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর অধিকার নিঃসংশয় প্রমাণিত।

দেশ-প্রেমের স্বাক্ষর দেশাত্মবোধক সংগীত-রচনায়।

সমাজসেবীর ভূমিকায় তিনি সুচিহ্নিত।

বদান্যতা ও উদারতা কবচ-কুণ্ডলের মত সহজাত।

'এবার তোর ভরা আপন
বিলিয়ে দে তুই যারে তারে।'

শুধু কয়েকটি শব্দেরই ঝঙ্কার নয়, অন্তরের আকুতির সার্থক রূপায়ণ অতুলপ্রসাদের অসাম্প্রদায়িক চরম দানপত্রে।

প্রবাসী বাঙালি-সমাজের পথিপ্রদর্শক, প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার অভিজ্ঞানে। যাহার উপরে নাই—গীতিপুষ্পে তিনি শতদলে প্রস্ফুটিত।

সংসার-সমুদ্র মন্থনে শুধু হলাহলই নয়, উঠেছিল অবাক পারিজাত বৃক্ষটি—যার কুসুম-সুবাসে 'জগজন মানিল বিস্ময়।'

অতুলপ্রসাদেব মহাপ্রয়াণের চারিটি দশকের প্রান্ত-সীমা। এত দীর্ঘ প্রতীক্ষিত অবসরেও এই লোকোত্তর মনীষী কবির একখানি প্রামাণ্য জীবনী-গ্রন্থের উপস্থাপনায় কেহই উৎসাহিত হন নি। তাঁর লোকান্তরের অব্যবহিত পরেই 'উত্তরা'র "অতুল-স্মৃতি" সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তাঁর সমসাময়িক অন্তরঙ্গ স্বজন-বন্ধুদের শ্রদ্ধার্ঘ্যই এই সংখ্যাটির উপকরণ। বিশ্বকবিব স্নেহগর্বিত অতুলপ্রসাদ। 'বন্ধু তুমি বন্ধুতার অশুভ্র অমৃতে, পূর্ণ পাত্র এনেছিলে মর্ত ধরণীতে।' এই স্মৃতিপাত্রে অমর পুষ্পার্ঘ্যটি অর্পণ করেন রবীন্দ্রনাথ।

সাহিত্যাকারে তাঁর স্মৃতিরক্ষার এটিই প্রথম পদক্ষেপ।

অন্যভাবে অতুলপ্রসাদের স্মৃতিবক্ষার কর্তব্যতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন। বাৎসরিক অধিবেশনসমূহে প্রথম প্রথম প্রবল ভাব-উদ্দীপনায় প্রবুদ্ধ হ'য়ে তাঁর স্মৃতিরক্ষাকল্পে গঠনমূলক প্রস্তাবাদি এবং লক্ষ-পূরণের সদিচ্ছায় সম্মেলনের প্রভাবশালী সভাদের তালিকাভুক্ত করে কমিটিও গঠিত হয়। এত বহ্বারম্ভ সত্ত্বেও স্মৃতিরক্ষার সার্থক রূপায়ণ অদ্যাবধি অপরিণত। একালে সম্মেলন-রঙ্গমঞ্চে এ প্রতিশ্রুতি বিস্মরণের একটা নজীর মাত্র।

অতিক্রান্ত এক যুগ।

সর্বভারতীয় স্তরে না হলেও অতুলপ্রসাদের কর্মসাধনভূমি লখনৌর কৃতজ্ঞ নাগরিকরা তাঁদের প্রাণপ্রতিম মুকুটহীন এই সম্রাট 'সেন সাহেব'-কে চিরস্মরণীয় করবার অধিষ্ঠানে এবার পুরোবর্তী। শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের অধিনায়কতায়

ও অপরাপর গুণমুগ্ধ পুরবাসীর প্রযত্নে স্থাপিত হ'ল এক আবক্ষ মর্মর প্রতিমূর্তি স্থানিক পৌরসংঘের সম্মুখবর্তী শান্তি পার্কে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে।

প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করলেন আচার্য নরেন্দ্র দেব। লখ্নৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। স্থির ছিল উত্তর-প্রদেশের মাননীয়া রাজ্যপাল শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু মহোদয়া এই স্মরণীয় উৎসবের পুরোধা হবেন। অসুস্থতা বাধা হ'ল। স্বয়ং সভামঞ্চে আগন্তুক হ'তে না পারলেও বাণী পাঠাতে বিস্মৃত হন নি। এক কবির প্রতি আর এক কবির রমণীয় শ্রদ্ধার্ঘ্যটি :

"I deeply regret I have sustained an injury to my leg and hence must forego the pleasure of unveiling the marble bust of my old and dearly valued friend Atul Sen. I do not remember a time when I did not know him or have his exquisite Bengali poetry. He chose law for his bread but poetry was his Narcissus flower, food for his soul, which fulfilled as it is said in the Hadis, an injunction of the prophet Mohammad who said, 'if thou hast two loaves of bread, go and sell one for the flower of Narcissus, for bread feeds the body, but the flower of Narcissus is food for the soul.'

Atul Sen's genius, for it was genius and not only talent, had the authentic lyric note which moved deeply the hearts of all who heard his songs. He had the gift of poignant and beautiful word in which he interpreted the most profound and subtle emotions and experience of his soul. There are and will be many lawyers in the world but only one Atul Sen the poet who has assured his own immortality through the medium of his lovely lyric genius...."

এই সুরম্য নগরীর লালন-পালনে অতুলপ্রসাদের অনেক অবদান। এক কালের পৌরসংঘের সহ সভাপতি। তাঁর জীবদ্দশাতেই পৌরপিতারা তাঁর প্রাসাদ সম্মুখবর্তী সরণীটি এ পি. সেন রোড নামাঙ্কিত করে কৃতজ্ঞতার ঋণমুক্ত।

লখ্নৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য অতুলপ্রসাদ। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁদের পরমপ্রিয় সহকর্মী এ পি. সেন নামাঙ্ক স্মারক হল্ প্রতিষ্ঠিত করলেন বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে।

অতুলপ্রসাদের জন্মশত জয়ন্তীর লগ্নক্ষণে আবার এসে তিনি দাঁড়িয়েছেন পাদপ্রদীপের সম্মুখে। গুণগ্রাহী দেশবাসী, অতুলপ্রসাদের অনুরাগী বন্ধু ও মুগ্ধ ভক্তজন সকলেই সোচ্চার ও তৎপর হ'য়ে উঠেছেন এই মানবদরদী, কর্মী ও কবির জন্মশতবর্ষ পালনের অঙ্গীকারে।

এমনক্ষণে আমারও কোন ভূমিকায় অংশ নেবার জন্য আহ্বান এল। এ আহ্বানের প্রথম উদ্‌গাতা লখনৌ য়ুনিভারসিটির ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও উঃ বঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অতুলপ্রসাদের স্নেহধন্য শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। লিখলেন: "অতুলপ্রসাদের জন্মশতবার্ষিকী। তার কি করছ? শুনছি নানা সম্মেলন, গানের আসর ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে। আমার ইচ্ছা তাঁর স্মৃতি রাখবার জন্য একখানা Commemoration Volume (স্মারক গ্রন্থ)। সেটা একা তুমিই করতে পার। আমরা তো বৃদ্ধ হয়েছি আর যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে ধন্য, তারা প্রায় সব ই গত।"

নিজেকে বৃদ্ধত্বের মুখোশ পরিয়ে, তাঁরই সমসাময়িক এক বন্ধুকে যৌবনের রাজটিকা পরাবার প্রচ্ছন্ন কৌতুক অনুভব করলেও বিনয়েন্দ্রনাথ যে মন্ত্র কর্ণকুহরে অনুপ্রবিষ্ট করালেন, তার প্রভাবমুক্ত হ'তে পারলাম না।

Commemoration Volume অর্থাৎ স্মারকগ্রন্থের প্রধান সর্তই খ্যাতিনামা বিদ্বজ্জনের প্রবন্ধসম্ভারে মূল্যবান করে প্রকাশ করা।

আমি এই স্মারক গ্রন্থখানির রচনা-মালার জন্য বর্তমানকালের খ্যাতিবান সাহিত্যিক, কবি বা বিদগ্ধজনের শরণার্থী না হ'য়ে—অতুলপ্রসাদের সমকালীন আত্মীয়-বন্ধুজন, একদা যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যের স্পর্শে, সাহচর্যের উত্তাপে অন্তরঙ্গ হ'য়েছিলেন এবং তাঁর লোকান্তরের পূর্বে বা পরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ অতুলপ্রসাদের গানের ভাব ও সুরবৈচিত্র্যের মূল্যায়ণ-চর্চা বা তাঁর ব্যক্তিরূপের স্মৃতিচারণ করেছেন—ইতঃস্ততবিক্ষিপ্ত সেই লেখাগুলি সংগ্রহ করে একসূত্রে গ্রথিত করবার সংকল্পে স্থির হ'লাম।

আনুষঙ্গিক আরও কিছু সংযোজন। যথা: গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অতুলপ্রসাদের গুটি কয় কবিতা ও গদ্যরচনা—যা মাসিক পত্রিকার অন্তরালে সুদীর্ঘকাল নির্বাসিত।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভক্ত অতুলপ্রসাদের নিবিড় সখ্য-সমৃদ্ধ সম্বন্ধ সমন্বিত কিছু পত্রাবলীও এ সংকলন গ্রন্থে উপস্থাপিত।

আমার এই নির্ধারণের যথার্থতা যাচাই করবার উদ্দেশ্যে প্রথম যাঁর কাছে এ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করি তিনি শ্রীপুলিনবিহারী সেন। এ রূপের সংকলন-গ্রন্থের সম্পাদনায় যিনি সিদ্ধকাম। সোৎসাহে আমরা পরিকল্পনাকে সমর্থন করে লেখেন: 'এ প্রস্তাব সাধু। সাধু বলছি এই জন্য যে, এ-সব ছড়ানো লেখা লোকে পাবে কোথায়, যদি একত্র সেগুলি সংগ্রহ না করা হয়। তবে আধুনিক পাঠকের জন্য যখন বই, তখন আধুনিক সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে অতুলপ্রসাদের রচনার বিবেচনা, বর্তমানের কাব-পাঠক কি বলেন, তারও কিছু নিদর্শন থাকলে ঠিক হয়।'

তাঁর পরামর্শমত দু'টি নতুন প্রবন্ধ এ-গ্রন্থে সন্নিবেশ করা গেল। শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্রের 'গীতশিল্পী অতুলপ্রসাদ' ও শ্রীদেবীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি অতুলপ্রসাদ'। এ দুটি লেখা পুলিনবাবু তাঁদের দিয়ে লিখিয়ে আমায় দেন।

"'বিশ্বভারতী' কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী ও অতুলপ্রসাদের রচনাদির ন্যাসংরক্ষক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষ সেন মহাশয়ের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও প্রবন্ধসমূহ এ সংকলন-গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দেওয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। 'প্রবাসী' বিভাগের প্রবন্ধগুচ্ছ [illegible] আশ্বিন ১৩৬১ ও ভাদ্র ১৩৬৩, প্রবাসী [illegible] ১৩৩১ ও কার্তিক ১৩৪১, দেশ সপ্তম [illegible] ১৭ অগ্রহায়ণ, [illegible] সংখ্যা ১৩৫৫, আনন্দবাজারের ১৬ পৌষ ১৩৬১ [illegible] ও শ্রীদিলীপকুমার রায়, 'সুরতরঙ্গ' গ্রন্থ থেকে [illegible]। [illegible] দিলীপকুমার 'সুরতীর্থ' গ্রন্থ [illegible] লেখাটি [illegible] অন্য লেখাগুলি [illegible]। এই সব সাময়িকপত্র সম্পাদক ও লেখক লেখিকাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

প্রকাশন-স্থান থেকে দূরে অবস্থানের জন্য প্রুফ দেখার অসুবিধায় অনিবার্যভাবেই মুদ্রাকর প্রমাদ কিছু কিছু ঘটেছে।

'ওগো সুখ নাহি চাই' ও 'কঠিন শাসনে কর মা শাসিত' অতুলপ্রসাদের এই দু'টি গানের হস্তলিপি লখ্নৌপ্রবাসী শ্রী কে কে. বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

এই সংকলন-গ্রন্থের রচনাগুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে অনুলিপি করে আমায় ঋণপাশে আবদ্ধ করেছেন নবীন সাহিত্যব্রতী শ্রীমান প্রবালমণি চট্টোপাধ্যায় ও স্নেহভাজন শ্রীমান শচীন্দ্রনাথ ঘোষাল।

শ্রীচিত্রজিৎ ঘোষ-এর তোলা কয়েকটি আলোকচিত্র লখ্‌নৌ-এর শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয়ের সুজনতায় মুদ্রিত হল।

অতুলপ্রসাদ সেন-এর প্রথম ছবির ব্লক এবং অতুলপ্রসাদ সেন নামক রবীন্দ্রনাথের কবিতার ব্লক সাধারণ ব্রাহ্মমিশন প্রেসের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থপ্রকাশক প্রতিষ্ঠান বাক্‌-সাহিত্য প্রাঃ লিঃ এর কর্তৃপক্ষেব আগ্রহ ও সহযোগিতায় এত পরিপাটিরূপে এই স্মারক গ্রন্থখানি প্রকাশ সম্ভব হ'ল।

'অতুলপ্রসাদের জন্মশত জয়ন্তীর লগ্নক্ষণে আবার এসে তিনি দাঁড়িয়েছেন পাদপ্রদীপের সম্মুখে। গুণগ্রাহী দেশবাসী, অতুলপ্রসাদের অনুরাগী বন্ধু ও ভক্তজন সকলেই সোচ্চার ও তৎপর হয়ে উঠেছেন।' কথনটির পুনরাবৃত্তি করছি ফলশ্রুতি লক্ষ করে :

পত্র-পত্রিকা, সংবাদপত্রে অতুলপ্রসাদের প্রতিভাসিত জীবন-আলেখ্য প্রদর্শিত হয়েছে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে।

সভা-সমিতি, জলসা, গানের আসরে আসরে কীর্তিত হয়েছে তাঁব সংগীত-সাধনা, সুরোচ্ছ্বাসে উদ্‌বেলিত হয়েছে নাটমন্দির।

মাধুকরী আশ্রয় করে, আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে দু'তিন খানি অতুল-জীবনী রচিত ও প্রকাশিত হয়ে গেছে এই অবসরে। আমি খুশি।

শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী

অতুলপ্রসাদ জন্মশতবার্ষিকী
বারাণসী

জীবনবৃত্ত

অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪ খ্রী) জন্ম ২০ অক্টোবর ১৮৭১, ঢাকা; মৃত্যু ২৬ অগস্ট ১৯৩৪, লখনৌ। পিতা রামপ্রসাদ সেনের আদি নিবাস ছিল ফরিদপুর জেলার মগর গ্রামে। তিনি যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ঢাকায় চিকিৎসকরূপে ইঁহার খ্যাতি হইয়াছিল। অতুলপ্রসাদ বাল্যেই পিতৃহীন হইয়া মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের স্নেহে বর্ধিত হন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিয়া অতুলপ্রসাদ বিলাত যান এবং ব্যারিস্টারি পাশ করিয়া দেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। কলিকাতায় ও রংপুরে কিছুকাল আইন-ব্যবসায় করিবার পর তিনি লখনৌ শহরকে নিজ কর্মভূমি বলিয়া গ্রহণ করেন। এইখানে তিনি ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবীদের মধ্যে আসন লাভ করেন; আউধ বার অ্যাসোসিয়েশন ও আউধ বার কাউন্সিলের তিনি সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

মাতামহ কালীনারায়ণ ভগবদ্‌ভক্ত, সুকণ্ঠ গায়ক ও সহজ ভক্তিসংগীত-রচয়িতারূপে খ্যাত ছিলেন; অতুলপ্রসাদ মাতামহের এই সকল গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন—অল্প বয়সেই তিনি যে গান রচনা করিয়াছিলেন ('তোমারি উদ্যানে তোমারি যতনে') এখনও তাহা 'ব্রহ্মসংগীত'-ভুক্ত থাকিয়া গীত হইয়া থাকে। নানাকর্মব্যস্ত বেদনাহত জীবনে এই সংগীত রচনাই চিরদিন তাঁহার মনের এক প্রধান আশ্রয় ছিল। তাঁহার রচিত গানের সংখ্যা বহু নহে; দুইশতের কিছু অধিক; কিন্তু ইহারই সুর ও ভাব-বৈশিষ্টে তিনি আধুনিক বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পরাধীনতার বেদনায় রচিত তাঁহার গান 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী', 'বল বল বল সবে শতবীণাবেণুরবে', 'হও ধরমেতে ধীর হও করমেতে বীর' প্রভৃতির জনপ্রিয়তা স্বাধীন ভারতেও অক্ষুণ্ণ আছে। তাঁহার ভগবৎসংগীত. প্রকৃতি ও প্রেম-গাথা, সর্বত্রই যে গভীর বেদনার মধ্যেই ভক্তি ও প্রেমের আস্পদের প্রতি একান্ত আত্মনিবেদন ও নির্ভর কথার ঋজুতায় ও সুরের বৈচিত্র্যে মূর্ত হইয়াছে, তাহারই ফলে তাঁহার রচিত গান দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙালি শ্রোতার মর্মস্পর্শী হইয়া আছে। বাংলা কাব্যগীতির বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ না করিয়াও তিনি তাহাতে হিন্দুস্থানী সংগীতের সুর ও বিশিষ্ট ঢঙের সার্থক যোজনা করিয়াছেন; বাউল ও কীর্তনের সুরের যোগসাধনা করিয়া, কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাহাতে

হিন্দুস্থানী ঢঙেরও সংযোজন করিয়া তিনি বাংলা গানে বৈচিত্র্যের সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহার গানগুলি 'গীতিগুঞ্জ' (১৯৩১ খ্রী) গ্রন্থে সংকলিত হয়; তৎপূর্বে 'কয়েকটি গান' প্রকাশিত হইয়াছিল। 'কাকলি' গ্রন্থমালায় এ সকল গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হইয়াছে।

অন্তর্মুখী এবং ভগবৎমুখী গীতিরচয়িতা অতুলপ্রসাদ বহির্জীবনেও স্বীয় প্রতিভার চিহ্ন নানা ভাবে মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন। গত শতাব্দীতে ও বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে সকল বাঙালি বিভিন্ন প্রদেশকে নিজ কর্মভূমি বলিয়া স্বীকার করিয়া জনসেবার যোগে তত্তৎপ্রদেশবাসীর ঐকান্তিক শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন অতুলপ্রসাদ সেনের নাম তাঁহাদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক হইয়াও, চিরদিন বাংলা ভাষার সেবা ও জন্মভূমির স্মৃতি অন্তরে বহন করিয়াও, বঙ্গেতর প্রদেশে তিনি নিজেকে কখনও প্রবাসী বলিয়া মনে করেন নাই—"নিজেদের প্রবাসী বলতে আমি সংকোচ বোধ করি। ভারতে বাস করে ভারতবাসী নিজেকে পরবাসী কি করে বলবে?...এদেশও আমাদের দেশ", আর এই দেশের কল্যাণকর্মে তিনি শ্রম অর্থ ও প্রীতি অকুণ্ঠভাবে নিয়োগ করিয়াছিলেন। যুক্তপ্রদেশ বিশেষত লখনৌ নগরীর সংস্কৃতি ও জীবনধারার সহিত তিনি সম্পূর্ণ একাত্ম হইয়াছিলেন। লখনৌ শহরের যে রাজপথে তিনি গৃহ নির্মাণ করিয়া বাস করিতেন, তাঁহার জীবিতকালেই তাঁহার নামে সেই রাজপথ সরকারিভাবে চিহ্নিত হইয়াছিল। দীনদুঃখীকে উদারহস্তে দান করিয়া, সার্বজনিক নানা প্রতিষ্ঠানে কর্মভার গ্রহণ করিয়া তিনি সর্বসাধারণের হৃদয়ে যে শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছিলেন মৃত্যুর পর তাহার স্মরণে তাঁহার গুণানুরাগীগণ লখনৌ শহরে তাঁহার মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন, তথায় তাঁহার স্মরণে একটি 'হল' চিহ্নিত হইয়াছে। রাষ্ট্রনৈতিক কর্মের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। গোখলের অনুবর্তীরূপে তিনি কংগ্রেসের সহিত যুক্ত ছিলেন, পরে লিবারাল ফেডারেশন বা উদারনৈতিক সংঘভুক্ত হন ও ইহার বার্ষিক সম্মিলনে সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রবাসী (বর্তমানে নিখিল-ভারত) বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন প্রতিষ্ঠাকালে তিনি ইহার অন্যতম প্রধান ছিলেন। সম্মিলনের মুখপত্র 'উত্তরা'র তিনি অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। সম্মিলনের কানপুর ও গোরখপুর অধিবেশনে তিনি সভানেতৃত্ব করেন।

তাঁহার উপার্জিত অর্থের বৃহৎ অংশ জীবিতকালেই লোকসেবায় ব্যয়িত হইয়াছিল; অবশিষ্ট সম্পত্তির অধিকাংশ, তাঁহার আবাসগৃহ এবং গ্রন্থস্বত্বও তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান করিয়া গিয়াছেন।

পুলিনবিহারী সেন

ভারতকোষ, প্রথম খণ্ড।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

অতুলপ্রসাদ সেন

বন্ধু, তুমি বন্ধুতার অজস্র অমৃতে
পূর্ণপাত্র এনেছিলে মর্ত্য ধরণীতে।
ছিল তব অবিরত
হৃদয়ের সদাব্রত,
বঞ্চিত করোনি কভু কারে
তোমার উদার মুক্তদ্বারে॥

মৈত্রী তব সমুজ্জ্বল ছিল গানে গানে
অমরাবতীর সেই সুধা-স্বপ্ন দানে।
সুরে-ভরা সঙ্গ তব
বারে বারে নব নব
মাধুরীর আতিথ্য বিলালো;
রসতৈলে জ্বেলেছিল আলো॥

দিন পরে গেছে দিন মাস পরে মাস,
তোমা হতে দূরে ছিল আমার আবাস।
"হবে হবে দেখা হবে"
এ কথা নীরব রবে
ধ্বনিত হয়েছে ক্ষণে ক্ষণে
অকথিত তব আমন্ত্রণে॥

আমারে যাবার কাল এলো শেষ ডাকি
"হবে হবে দেখা হবে" মনে ছিল বাকি।
সেখানেও হাসিমুখে
বাহু মেলি ল'বে বুকে
নব জ্যোতি-দীপ্ত অনুরাগে,
সেই ছবি মনে মনে জাগে ॥

এখানে যেমন তোর নীরব ধুলায়
কবে সে বিষম ছুরি খরধার ভুলায়।
যদি দুঃখহীন কাল
ছিন্ন শেষ ফেলে জাল,
বিরহের স্মৃতি লয় হরি'
সব চেয়ে সে ক্ষতিরে ডরি ॥

তাই বলি দীর্ঘ আয়ু দীর্ঘ অভিশাপ,
বিচ্ছেদের তাপ নাশে সেই বড় তাপ।
অনেক হারাতে হয়
তারেও করি নে ভয়;
যতদিন ব্যথা রহে বাকি
তার বেশি যেন নাহি থাকি ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭ ভাদ্র
১৩৪১
শান্তিনিকেতন

অতুলপ্রসাদ ও তাঁর সংগীত

শ্রীদিলীপকুমার রায়

অতুলপ্রসাদের গানের সঙ্গে বাঙালি অপরিচিত নয়। তাঁর 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী' গানটি স্বদেশীযুগে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। তাঁর 'বঁধুয়া, নিদ্ নাহি আঁখি-পাতে' গানটি অথবা 'বঙ্গভাষা' গানটিও অনেকে শুনেছেন। কিন্তু এরকম বিক্ষিপ্তভাবে অতুলপ্রসাদের গানের সঙ্গে অনেকে পরিচিত হলেও, বোধহয় খুব কম লোকেই খবর রাখে যে তিনি একজন প্রকৃত সংগীত-রচয়িতা—যাকে ইংরেজি সংগীত-পরিভাষাতে বলে—Composer। আমি আজ যে-কয়টি গান আপনাদের শোনাবার জন্য নির্বাচিত করেছি, সেগুলির দ্বারা তার গান অপিচ সুন্দর-সুন্দর সুর দেওয়ার ক্ষমতাটিই যাতে পরিস্ফুট হয় সেইদিকেই বিশেষ করে দৃষ্টি রাখব।

ইংরেজী ভাষায় Composer বা ফরাসী ভাষায় Compositeur কথাটির সদর্থ হচ্ছে নূতন সুর বা সুরসমষ্টির স্রষ্টা। তাই অতুলপ্রসাদকে শুধু Composer বললে তার যথার্থ সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হবে না। সুতরাং তাঁর প্রতি যথেষ্ট সুবিচারও করা হবে না। কেননা তিনি সুর-রচয়িতা মাত্র নন—সঙ্গে সঙ্গে একজন মনোজ্ঞ কবি। তাই এক-কথায় তাঁকে গীতিকবি আখ্যা দেওয়াই বোধ হয় বেশি সংগত। কারণ তাঁর গানে কাব্য ও সংগীতের বড় সুন্দর সম্মিলন সংসাধিত হয়েছে বলে আমার মনে হয়।

যে-কোনো গীতিকবির মধ্যে দুটো উপাদান থাকবেই। প্রথম গীতির দিক ও দ্বিতীয় কবিত্বের দিক। তাই আমি অতুলপ্রসাদের রচনাকে এই দু-দিক থেকে আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

এই গীতিকবির রচনাকে যদি সুরের দিক থেকে দেখা যায়, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, তাঁর গানগুলিকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটি ধারা হচ্ছে আমাদের খাঁটি বাউল-কীর্তনকে আধুনিক refinement-এর —হৃদয়ের সৌকুমার্যের মধ্য দিয়ে বড় হৃদয়স্পর্শীভাবে প্রকাশ করার প্রয়াস;

আর-একটি হচ্ছে আমাদের হিন্দুস্থানী সুরের খাঁটি হিন্দুস্থানী ঢঙকে বাংলা গানের মধ্যে অভিনবভাবে মূর্ত করে তোলা। এখন এ দুটি ধারা-সম্বন্ধে যথাক্রমে একটু বিশদভাবে দৃষ্টান্ত দিয়ে আলোচনা করা যাক।

আমাদের দেশে বাউল, ভাটিয়ালি, ছোট চালের কীর্তন প্রভৃতি সুর সাধারণ লোকমুখে পথে-ঘাটে শোনা যায়। তাদেব মধ্যে একটি সরল আবেদন আছে। কিন্তু চলিত অনেক বাউল গানের কথার মধ্যেই আমবা একটা প্রাচীনতার আমেজ পেয়ে থাকি যাকে ইংরেজিতে বলে archaism; আমাদের মন বস্তুটি archaism-এ কখনই ঠিক সাড়া দেয় না। কথাটা একটু পরিষ্কার করে বলি। একটা পুবনো বাউল গান শুনেছিলাম যার আরম্ভটা ছিল—'কে গড়লে এই ঘর, সে ধন্য কারিগব।' এখানে ঘব অর্থে বোঝা হয়েছে দেহ। পুরনো অনেক গানে অভাবনীয় দেহতত্ত্ব, কুল-কুণ্ডলিনীর মাহাত্ম্য, ষড়রিপুব অত্যাচার প্রভৃতির লোমহর্ষক বর্ণনা আছে। এরূপ গানেব কথার মধ্যে কোনো আধ্যাত্মিক গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে কি না আমি জানিনে—তাই সে-সম্বন্ধে কোনো কথা না বলে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করাই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ পন্থা। কিন্তু একটি কথা জানি, সুতরাং সে-সম্বন্ধে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করা ভাল নয়, সেটি হচ্ছে এই যে, এ-সব গানে আর যাই থাকুক না কেন, একটি জিনিসের বালাই নেই, যার নাম কবিত্ব। এ-কথায় পুরাতনপন্থীগণ আশা করি ক্ষুণ্ণ হবেন না। আর যদিই বা হন, তবে তাঁরা এই কথাটি মনে করে যেন সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করেন যে মানুষের কোনো দিকের সৃষ্টিকে প্রায়ই সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে গড়ে উঠতে দেখা যায় না। তাই আমরা এইভাবে মনকে প্রবোধ দিতে পারি যে, এই পুরনো বাউল-কীর্তনের অনেক গানের কথায় যদি আমাদের মনটি সাড়া না দেয় তবে সুরে ত দেয়! সেটাও ত একটা কম লাভ নয়—মানুষের শিল্পজগতে সৃষ্টির দিক দিয়ে।

তবে সে যাই হোক আমার মোট বক্তব্যটি এই যে, এ-সব archaic গানে সুবের সৌন্দয থাকলেও কবিত্বের মাধুয প্রায়ই পাওয়া যায় না, যাতে আমাদের আধুনিক মনটি সাড়া দিতে পাবে।[১] ধরুন 'ধন্য কারিগব, যে গড়লে এই ঘর'

---

[১] একথা কবিদেব কীর্তন-সম্বন্ধে—বিশেষত চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি দু'চার জন সম্ভাবার কবির রচনা-সম্বন্ধে—প্রযোজ্য নয়। কারণ এঁদের অনেক গানে শ্যামের ও রাধার রূপ বর্ণনারূপ অপেক্ষাকৃত নিম্নদরের কারবার থাকলেও—উচ্চতম কাব্যরসেরও অভাব নেই। আমি তাঁদের বিরহ সংগীতের কথা উল্লেখ করে একথা বলছি যার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ চরম কথা লিখে গেছেন—'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?'

এ গানটি শুনলে কি আমাদের মনে সে পুলক শিহরণ জাগে,—রবীন্দ্রনাথের বাউল 'গ্রাম-ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ আমার মন ভোলায় রে' গানটির কথায় যে-শিহরণের উদয় হয়? আগেকার এরূপ অনেক তথাকথিত আধ্যাত্মিক গানের কথায় আমাদের মন সাড়া দেয় না। যেমন নরেশচন্দ্রের একটা গান

শ্যামাপদ-আকাশেতে মন-ঘুড়িখান উড়তে ছিল
কলুষের কুবাতাস লেগে গোঁত্তা খেয়ে পড়ে গেল।

সাড়া দেয় না কারণ, আসল কবিত্বের পরশমণিতে যে কাব্যানুরাগীর মন একবার স্বর্ণবর্ণ হয়ে গেছে সে যতই কেন চেষ্টা করুক মনরূপ ঘুড়ির গোত্তা খেয়ে পড়ে যাবার উপমায় কখনই সাড়া দিতে পারবে না। কারণ মন বস্তুটির ওরূপভাবে মাধ্যাকর্ষণের কবলিত হওয়ার মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্য থাকতে পারে বা আধ্যাত্মিক তত্ত্বও থাকতে পারে, কিন্তু একটা জিনিস থাকতে পারে না যেটা হচ্ছে—কবিত্বের নামগন্ধ। যদি কেউ বলেন তা হোক, বৈজ্ঞানিক তথ্য বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কবিত্বের সত্যের চেয়ে মহান, তাহলে তাঁর সঙ্গে আমাদের বিবাদ নেই। যেহেতু আমরা বর্তমানে আলোচনা করতে বসেছি আধ্যাত্মিকতার নয়, কবিত্বের।

কিন্তু পূর্বেই প্রসঙ্গত বলেছি যে, পুরনো অনেক বাউল ভাটিয়ালি প্রভৃতি লোক-সংগীতের (folk-music) কথায় না হলেও সুরে আমাদের আধুনিক মনও কম-বেশি সাড়া না দিয়েই পারে না। তার কারণ এরূপ গানের সুরের স্থান অনেক সময়েই নিছক সাময়িকতার উপরে। তাই সেগুলির আবেদন সরল হলেও হৃদয়স্পর্শী। অতুলপ্রসাদ এ-সুরগুলির ছাঁচে তাঁর কবিত্ব ঢেলে যে-গান তৈরি করেছেন তার মিলিত আবেদন দাঁড়িয়েছে ভারি মনোজ্ঞ।

এ-গানটিতে আপনারা দেখবেন কীর্তন ও বাউলের ঢঙ কেমন স্বাভাবিকভাবে মেশানো হয়েছে। এখানে অতুলপ্রসাদের একটা সুন্দর মৌলিকতা দৃষ্ট হয়। আমাদের বর্তমান বাংলার অনেক কবিই শুধু কীর্তনে বা শুধু বাউলে উৎকৃষ্ট গান রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু বাউল ও কীর্তনের সুরের এ-ভাবে মিলন সাধন করে তাতে কবিত্বের সাহায্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার কৃতিত্ব বোধ হয় অধুনাতন কবিদের মধ্যে অতুলপ্রসাদের এককের।

তাঁর আরও কৃতিত্ব এই যে এ মিলন-সাধনের পর্বে তিনি কোনো

কোনো স্থলে হিন্দুস্থানী ঢঙকেও মেশাতে কৃতকার্য হয়েছেন। ফলে হয়েছে এই যে, তাঁর সহজ কীর্তন-বাউল মেশানো গানেও হিন্দুস্থানী মনোজ্ঞ তানালাপের খানিকটা রস আমদানি করা যায়, যেমন তাঁর 'ওগো আমার নবীন শাখী, ছিলে তুমি কোন বিমানে' গানটিতে। এই সুন্দর-করুণ গানটিতে কীর্তন-বাউলের সঙ্গে হিন্দুস্থানী পিলুর রস দিয়ে যে-ব্যঞ্জনাটি মূর্ত হয়ে উঠেছে তার আস্বাদের বিচিত্রতা ও মনোহারিত্ব যে কোনো যথার্থ সংগীত নুরাগীর হৃদয়কে বোধ হয় স্পর্শ না করেই পারে না।

অতুলপ্রসাদের গানের কবিত্ব-সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা আমার এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, তবু একটা কথা আমি এ-প্রসঙ্গে বলতে চাই। সেটা হচ্ছে এই যে, অতুলপ্রসাদের গানের কথার দিক দিয়ে দেখতে গেলে তার একটা বৈশিষ্ট্য মনে হয়, ভক্তিরসকে একটু অভিনবভাবে উদ্রেক করায় তাঁর ক্ষমতা। তার এ ক্ষমতার মূল শুধু তাঁর কবিত্বশক্তি নয়— কারণ শ্রেষ্ঠতর কবিত্বের সাহায্যেও অনেক সময়ে আমাদের আধুনিক মনে ঠিক বৈরাগ্য বা other worldliness-এর আবেদনটি পৌঁছয় না, যদি সে-কবিত্বের সঙ্গে একটা directness না থাকে। অতুলপ্রসাদের গানে এই directness জিনিসটি প্রায়ই আমাদের আধুনিক refinement-এর সাহায্যে এক অভিনব রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে দেখা যায়, ফলে হয়েছে এই যে তাঁর ভক্তিরসাত্মক গান ঠিক মামুলিভাবে আমাদের ভক্তি না জাগিয়ে অনেকটা তার কবিত্ব ও directness-এর সাহায্যে আমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করে। এর স্পর্শে আমাদের হৃদয়ে যে-অনুভূতিটি জাগে তাকে একটু বিশ্লেষণ করে দেখতে গেলে দেখা যায় যে সেটা ঠিক পুরাতন ভক্তিরসাত্মক গানের ভক্তির অনুভূতি নয়— এ একটা নূতনরকম complex অনুভূতি। এটির বিষয়ে বিশদ বর্ণনা শুধু কথায় সম্ভব নয়, কারণ এ-অনুভূতির জাগরণ হতে পারে এক কথা ও সুরের সামঞ্জস্যে। তাই আমি আমার বক্তব্যটি পরিস্ফুট করে তোলবার জন্য দুটি গান গেয়ে আপনাদের শোনাতে চাই।[১]

অ-ভক্তেরও যে অতুলপ্রসাদের এ-শ্রেণীর গানগুলি সচরাচর ভালো লেগে থাকে, তার কারণ বোধ হয় (১) কবির এ-শ্রেণীর গানের সুর অনন্য-

১ এখানে লেখক 'হরি হে, তুমি আমার সকল হবে কবে' ও শ্রীযুক্ত রণজিৎ সেন 'থাকিসনে বসে তোরা সুদিন আসবে বলে' গানদুটি গেয়েছিলেন।

সাধাবণ না হলেও মনোহব ও (২) তাঁর এ-শ্রেণীব গানের কথাব মধ্যে যে আবেদনটি আছে তাতে আমাদেব ভক্তিবস না হোক মানব-মনেব চিবন্তন অসীমেব আকাঙ্ক্ষাটি কবিত্বরূপ জাদুকরের সোনাব কাঠিব পবশে সজাগ ও চঞ্চল হযে ওঠে। 'সীমাব মধ্যে অসীমেব সুব' চিরদিনই মানবহৃদয-বাজ্যে এমনি সুষমা বিস্তাব কবে এসেছে, এমনি মোহজালই বেড়ে এসেছে। কেন? কে জানে। সংগীত ও কবিত্বেব স্বপ্ন-বাজ্য আমাদেব মনোজগতে এ-মোহপবশ যেমনভাবে এনে দেয অন্য কোন ললিতকলা সে-সৌবভ তেমন-ভাবে এনে দিতে পাবে কি না জানিনে, তবে এটা জানি যে, যে-শিল্প এ অজানা-অচেনাব সুবভি যত গভীবভাবে এনে দিতে পাবে, তাব গবিমাও ততই মহাযসী হযে ওঠে।

অজানাব চবণে মানব-মনেব এই যে চিবন্তন আবেদন, মানুষেব যুগ-যুগান্তব ধবে তাকে পাওয়াব এই যে নিহিত বাসনা—এ-সব অতুলপ্রসাদেব নানান গানেই মূর্ত হযে উঠেছে। যেমন তাব 'বাংলা ভাষা' গানটিব শেষ চবণ দুটিতে যেখানে কবি গেযে উঠেছেন .

> ঐ ভা[illegible] [illegible] [illegible] ডাকনু [illegible] বলে
> ঐ [illegible] বলব 'হরি' সাঙ্গ হলে [illegible]।

অথবা 'মিছে তুই ভাবিস মন' গানটিব শেষ চবণ দুটিতে :

> [illegible] বিরহে নয়নে অশ্রু বহে
> (ওরে) [illegible] সমাপন

অথবা 'থাকিস নে বসে তোবা' গানটিব শেষ চবণ দুটিতে .

> [illegible] [illegible],
> [illegible] [illegible]।

অজানা, অচেনা, অসীমেব প্রতি মানব-মনেব এই যে নিগূঢ আকাঙ্ক্ষা, তাব জন্য অবোধ হৃদয়েব এই যে চিবন্তন অশ্রুসজল আবাধনা, একে বোধ হয় ভাবতেব মনোজগতেব একটা বৈশিষ্ট্য বললেও অত্যুক্তি হবে না। আমি অবশ্য বলতে চাইনে যে এ-মনোভাবটি শুধু ভাবতেবই একচেটে। কারণ পরজগতেব এই যে আকর্ষণ, জীবনেব নানান তৃষ্ণার মধ্যে অজ্ঞাত

রহস্যের এই যে মাদকতা, এরা বোধ হয় মানব-মন মাত্রকেই কমবেশি অভিভূত না করেই পারে না। তবে আমার মনে হয় যে এ-মনোভাবটি নিয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠমনারা—কবি, দার্শনিক, বাউল, কীর্তনী প্রভৃতি যতটা চেষ্টা করেছে ততটা অন্যান্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠমনারা করে নি।

তবে এই পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকলেই যে তাকে প্রকাশ করার ক্ষমতা সকলের সমান থাকে তা নয়। এইখানেই কবিত্বের বৈশিষ্ট্য। কবিত্ব বস্তুটি জগতে সুলভ নয়—বিরল। একথা সব সভ্যতার শিল্প সম্বন্ধেই খাটে। গানের উদাহরণ হিসেবে বোধ হয় বিদেশী সংগীতের দু'একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া মন্দ নয়, যেমন ধরুন ইংরেজি ধর্ম-সংগীতের ক্ষেত্রে। এ ভাণ্ডার প্রায় অফুরন্ত বললেই চলে। কিন্তু হলে হবে কি, যীশু-সম্বন্ধে ইংরাজ ভক্তির অধিকাংশ গানই যেমন একঘেয়ে, তেমনি কবিত্বলেশহীন। একথা যে অত্যুক্তি নয়, তা যে-কোনো ইংরেজি hymn-book-এর গানগুলির উপর একবার চোখ বুলিয়ে গেলেই প্রতীয়মান হবে। এ-শ্রেণীর গানের অধিকাংশই কবিত্বের ধার দিয়েও যায় না এবং কৃত ও অকৃত পাপরাশির গুরুভারে নিষ্প্রভ ও অবসন্ন। যেমন

> The Mistakes of my life have been many
> And my spirit is sick with sin

অথবা আর একটা গানে আছে:

> How helpless and hopeless
> we sinners had been

এরূপ গানের মধ্যে আর কিছুর অভাব বোঝা যাক বা না যাক একটা জিনিসের অভাব কাব্যপিপাসুর কাছে এক মুহূর্তেই ধরা পড়ে, যার নাম কবিত্ব। পক্ষান্তরে Abide with me নামক প্রসিদ্ধ গানটির মধ্যে কবিত্বের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বোধ হয় কোনো কাব্যামোদীরই সংশয় থাকবে না:

> Abide with me, fast falls the eventide
> The darkness deepens, Lord! with me abide
> Heaven's morning breaks and earth's
> vain shadows flee
> In life in death O Lord! abide with me

য়ুরোপে কর্তব্যবোধ ও সামাজিকতার খাতিরে কত ধর্ম-সংগীতই না শুনতে

হয়েছে। কিন্তু এরূপ দু'চারটি কবিত্বময় গান ছাড়া অধিকাংশ গানেই মনটা সাড়া দেয়নি। এখানেই শিল্পের মহিমা। প্রকৃত শিল্পের মধ্যে মানুষের বাণী বা অনুভূতি যেভাবে আত্মপ্রকাশ করে, মহামহোপাধ্যায় আচার্যের খুব গম্ভীরবদনে দীর্ঘশ্মশ্রুসঞ্চালনপুরঃসর ভয়াবহ তর্জনী-হেলনের মধ্যেও সে অনুভূতি বা বাণীর প্রকাশ মেলে না। আমি অবশ্য এক্ষেত্রে ভক্ত বা ঈশ্বর-প্রেমিকের কথা বলছিনে। তাঁদের কাছে গানের মধ্যে মুক্তি, জীবনের নশ্বরতা, হরিনামামৃত প্রভৃতির উপাদান একটু অশ্রুজলের ও হাহুতাশের মশলার সঙ্গে সঙ্গে থাকলেই যথেষ্ট। উচ্ছ্বসিত হতে তারা আর কিছুর অপেক্ষা রাখেন না। যেমন কথামৃতে দেখতে পাই পরমহংসদেব, দাশু রায়ের

পাপী বলে, ক্রমে এল সাঙ্গ জীবনে জীবন
কেমনে হয় মা রক্ষে
আছি তোর অপেক্ষে দে মা মুক্তি ভিক্ষে
কটাক্ষেতে কর পার

গান শুনে অশ্রু বর্ষণ করতেন। কিন্তু আমরা—অর্থাৎ অভক্তজন—সম্ভবত এ গানের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতায় রোমাঞ্চিত-কলেবর হয়ে উঠব না। এর কারণ এইমাত্র যে পরমহংসদেব গানের মধ্যে খুঁজতেন কেবল ঈশ্বরের নাম-গান, ঐহিক অনিত্যতা, বৈরাগ্যের গুণগান ইত্যাদি ও আমরা খুঁজি মনোজ্ঞ কবিত্ব, সহৃদয় ভাব ও মনোহর প্রকাশভঙ্গী। তাই আমরা

ড্যাং ড্যাং ড্যাং দাদুরা ডিঙে চলায় আবাদ
সে কোনজন
পর্বত বলে শোন শোন শোন ভাব গুরুর শ্রীচরণ

গানটি শুনলে শ্রীগুরুর শ্রীচরণ ধ্যান করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সহসা খুব সচেতন হয়ে উঠতে পারিনে। কিন্তু যখন শিল্পী চণ্ডীদাসের অনুপম আত্মসমর্পণের কবিত্বময় বাণী পড়ি যে

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সবলোকে তাহাতে নাহিক দুখ
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ

তখন চির বিরহীর অন্তর্গূঢ় ব্যথার মধ্যেও আত্মদানের সার্থকতার করুণ মধুর রসে আপ্লুত না হয়েই পারিনে। অথবা যখন স্বভাবকবি রামপ্রসাদের কল-কণ্ঠে শুনি, 'মন তুমি কৃষি কাজ জানো না, এমন মানব-জমি রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা', তখন মানব-জীবনের কত রঙিন কামনার অপূর্ণতা,

গোপন আশাভঙ্গের বেদনা বা নিহিত আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতাই না আমাদের হৃদয়কে বিষাদাশ্রুতে প্লাবিত করে দিয়ে যায়।

তবে আর্টের বা কবিত্বের প্রকাশভঙ্গী বড় বড় কথা সাজিয়ে বলা মাত্র নয়। তাই এই বস্তুটি না থাকলে শিল্পের শিল্পত্বই লোপ পায়, থাকে শুধু শুষ্ক ধর্মোপদেশ বা বিজ্ঞম্মন্য অহমিকা যা যেতে পারে এক কানের মধ্যে, কিন্তু মরমে পশিতে একান্তই অক্ষম হয়ে ওঠে। বর্তমান য়ুরোপের একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক সত্যই বলেছেন, Art is a vision (*Essence of Æsthetics of Croce.*) উদাহরণত রবীন্দ্রনাথের

> ওহে জীবনবল্লভ, ওহে সাধনদুর্লভ
> আমি মর্মের কথা, অন্তরব্যথা কিছুই নাহি কব

গানটি নেওয়া যেতে পারে। এ-গানটির ভাব যে আমাদের মনে পুলক জাগায় তার কারণ এ নয় যে রবীন্দ্রনাথ এ-গানটিতে আমাদের অকাট্য যুক্তিবলে ঈশ্বরে ভক্তিমত্তার ঔচিত্য-সম্বন্ধে নিঃসংশয় করেছেন, তার কারণ এই যে তিনি তাঁর হৃদয়ের গভীর অনুভূতিটিকে তাঁর অনুপম কবিত্বশক্তির জাদুতে জাগিয়ে তুলেছেন। অতুলপ্রসাদের গানের কবিত্ব সম্বন্ধেও তাই। অর্থাৎ তাঁর ভক্তিরসাত্মক গান যে এত সহজে আমাদের আর্দ্র করে তোলে তার কারণ এ নয় যে তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার ভীষণ তিরস্কার বা নরক যন্ত্রণার ভয় প্রদর্শন ফুটে উঠেছে ; তার কারণ তিনি তাঁর আন্তরিক মনোভাবকে তাঁর স্বাভাবিক কবিত্বের সাহায্যে বড় সুন্দরভাবে মূর্ত করে তুলেছেন। আগেকার অনেক তথাকথিত আধ্যাত্মিক গানের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের ভক্তিরসাত্মক গানের এইখানে কত বড় একটা তফাৎ আছে সেটা অনুধাবনীয় মনে করেই এ সম্পর্কে এত কথা বলা দরকার মনে করলাম। একথা অবশ্য বর্তমান বাংলার অন্য দুজন গীতিকবি অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের গান সম্পর্কেও খাটে।

অতুলপ্রসাদের দ্বিতীয় বিশেষত্বটির কথা আমি ইতিপূর্বে একাধিকবার উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ তাঁর কাব্যের কথা-চিত্র (word-portaiture) ও হিন্দুস্থানী সুরের আবেদনের সামঞ্জস্য সাধন করার ক্ষমতা। ওখানে তাঁর কৃতিত্ব খুবই বেশি বলে মনে হয়। তাই এ-সম্বন্ধে দু-চারটি কথা একটু বিস্তারিতভাবে বলা দরকার মনে করছি।

আমার সৌভাগ্যক্রমে আমি য়ুরোপে অবস্থানকালে জগতের নানা জাতির সংগীত একটু ভালো করেই শোনবার অবসর পেয়েছিলেম।[১] তবে আজ অবধি যতরকম সংগীত শুনেছি, তার মধ্যে হিন্দুস্থানী সংগীতের বিকাশের ধারা ও আবেদনই আমার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে হয়, একথা আমি বহুবার বলেছি।

য়ুরোপের উচ্চতম Symphony, Choral singing, কীর্তন, ভক্তিরসাত্মক গান সবেরই স্থান আমার কাছে হিন্দুস্থানী সংগীতের নীচে। আমি মনে করি জগতে দুটি সভ্যতা আছে যারা সংগীতরাজ্যে মহত্তম সৃষ্টি করেছে—(১) য়ুরোপীয় সভ্যতা, harmony-তে প্রধানত জার্মানদেশে ও (২) ভারতবর্ষ, melody-তে প্রধানত হিন্দুস্থানী সংগীতে।

অতুলপ্রসাদের গানের ভক্ত আমি প্রধানত এইজন্য যে তিনি হিন্দুস্থানী ঢঙ তাঁর অনেক বাংলা গানেই আমদানি করেছেন। একথা বোধ হয় অত্যুক্তি নয় যে, বর্তমান বাংলা কবিদের মধ্যে এ ঢঙকে বাংলা গানের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন অতুলপ্রসাদ। দ্বিজুবাবুই প্রথমে ওদিকে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বর্তমান সময়ে বাংলা গানে হিন্দুস্থানী সংগীতের শুধু সুর নয়, সূক্ষ্ম ঢঙের সঙ্গে বাংলার কবিত্বের সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্য হয়েছে বোধ হয় অতুলপ্রসাদের এই হিন্দুস্থানী চালের গানে, যদিও শুধু কবিত্বের দিক দিয়ে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কবি বা গীতিকবি বাংলাদেশে জন্মেছেন। তবে যেহেতু মনের উপর গানের কবিত্ব ও কবিতার কবিত্বের effect (কার্য) ভিন্ন রকমের, সেহেতু অতুলপ্রসাদের রচনাকে ছোট করে দেখা চলে না। কারণ তাঁর বাণী হচ্ছে প্রধানত গীতিকাব্য, কবিতা নয়। তাই তার অনেক গানের অপেক্ষাকৃত সহজ সরল ভাবও সুরের মধ্য দিয়ে যেভাবে ফুটে উঠেছে সেটা তাঁর নিছক কবিত্বের সাহায্যে সেভাবে ফুটে উঠতে পারত না। অতুলপ্রসাদ হিন্দুস্থানী সংগীতের ভূতপূর্ব কেন্দ্র লখনৌয়ে বহুকাল বাস করে শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর হিন্দুস্থানী গানের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন—বিশেষত ঠুংরির ঢঙে। তাকে যারাই ব্যক্তিগতভাবে

---

১ এখানে বলে রাখা ভালো যে আমার ভাগ্যে জর্মন, রুশ, ইটালিয়, ফরাসি, চেক, হাঙ্গেরিয়ান, স্কান্ডিনেভিয়ান, ডাচ, সুইস, ইংরেজি, জাপানী ও চীনা সংগীত শোনবার নানা সুযোগ য়ুরোপে উপস্থিত হয়েছিল।

জানেন তাঁরাই জানেন যে হিন্দুস্থানী গানকে তিনি কিরকম মনেপ্রাণে ভালবাসেন। বাঙালির মধ্যে হিন্দুস্থানী গানের—বিশেষত টপ্পা-ঠুংরি তালের গানের এরূপ বিশেষজ্ঞ ও ভক্ত যে খুবই কম মেলে একথা তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কারোর কাছেই অবিদিত থাকতে পারে না।

শিল্পী তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিতে নিজের গভীর উপলব্ধিই প্রকাশ করে থাকেন কেননা এইটেই হচ্ছে জীবনের ধর্ম গীতিকবি অতুলপ্রসাদের শিল্পের দিকে শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি বোধহয় তাঁর হিন্দুস্থানী সংগীতের প্রতি অনুরাগ। সুতরাং তাঁর চরম সৃষ্টিতে তিনি এ উপলব্ধিকে মূর্তিমতী না করেই পারেন না। তাই তার গানে হিন্দুস্থানী সংগীতানুরাগীর এতটা তৃপ্তি মেলা সম্ভবপর হয়ে ওঠে।

আমরা তার 'বঁধুয়া, নিদ নাহি আঁখিপাতে' নামক বেহাগ গানটিতে যে-রসটির পরিচয় পাই তা এত কান-মধুর হয়ে উঠেছে প্রধানত এইজন্য যে তার মধ্যে বাংলার কবিত্ব ও বৈষ্ণব কবির চিরন্তন প্রিয়তম বিরহ গানের সুরের সঙ্গে খাঁটি হিন্দুস্থানী বেহাগের এক অপরূপ মিলন সাধন করা হয়েছে।

অতুলপ্রসাদের আরো অনেক গানে এ সামঞ্জস্যের বা মিলন সাধনের হৃদয়স্পর্শী পরিচয় মেলে, যেমন তার 'বাদল ঝুমঝুম বোলে' গানটিতে। এ-গানটি ঠুংরি খাম্বাজে রচিত। হিন্দুস্থানী সংগীতে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের বিকাশে টপ্পা ও বিশেষত ঠুংরির স্থান অতি উচ্চ বলে আমি মনে করি।[১] যে-সভ্যতা সৌন্দর্যের রাজ্যে এ অপূর্ব সৃষ্টি করতে পারে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যদি শিল্পী বা শিল্পানুরাগী সম্প্রদায় একটু বেশিই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন তবে আশা করি সেটা অমার্জনীয়, জাতীয় আত্মাভিমান বলে গণ্য হবে না। বস্তুত আমি হিন্দুস্থানী সংগীতের বিকাশধারাকে শুধু হিন্দুর কীর্তি বলে মনে করিনে, এজন্য আমরা মুসলমান সভ্যতার কাছে গভীরভাবে ঋণী। তাই আমি এ-সৃষ্টিকে মানুষের কীর্তি মনে করেই গর্ববোধ করি। এই বিরোধবহুল জগতে হিন্দুস্থানী সংগীতের অনুপম বিকাশ ও সৌন্দর্য সৃষ্টির কথা মনে করে আমার কবির সঙ্গে বলতে ইচ্ছে হয়—

---

[১] ধ্রুপদী ও খেয়ালীরা এ কথা heresy শুনলে হাত মুখ নাড়বেন কিন্তু তবুও আমি সত্যের খাতিরে বলতে বাধ্য যে সংগীতের উচ্চ শ্রেণীতে ঠুংরির দাম অন্য কোন শ্রেণীর হিন্দুস্থানী সংগীতের চেয়ে কম নয়। তার একটি প্রধান কারণ এই যে ঠুংরিতে গায়কের expression দেবার ও মৌলিকতা দেখাবার স্বাধীনতা ও অন্যান্য শ্রেণীর চেয়ে বেশি। তবে এ সম্বন্ধে আলাদা প্রবন্ধে আলোচনা করাই যুক্তিসংগত।

Marvellous art thou ! O spirit of Man ! In the midst of thine thraldom thou hast created the beautiful ![1] আমি আমাদের অপূর্ব হিন্দুস্থানী সংগীতের মহিমময় বিকাশের কথা বলতে গিয়ে যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি তা সত্যিই এই কথা ভেবে যে আমরা এত দুঃখ-দৈন্যের মাঝখানেও এমন সৌন্দর্যের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছি। দুঃখের বিষয় সাধারণ বাঙালি—বিশেষতঃ শিক্ষিত বাঙালি এ সৌন্দর্যের খবর বড় একটা রাখেন না। এটা সবচেয়ে বড় আক্ষেপের কথা এইজন্য যে যথার্থ শিক্ষা ও culture-এর সংস্পর্শে এলে এ বিকাশ আরো কত মহনীয় হয়ে উঠতে পারত। অশিক্ষিত অনুদার ওস্তাদদের হাতেই যখন এ-ধারার এতটা সৌন্দর্য বজায় আছে তখন শিক্ষার সঙ্গে প্রতিভার যোগাযোগে যে এ-সৌন্দর্য শতগুণে বরেণ্য হয়ে উঠত এটা বোধ হয় অত্যধিক আশা নয়। তবে এ বিকাশ সম্ভবপর হতে হলে আমাদের উচ্চশিক্ষিতদের হিন্দুস্থানী সংগীতের চর্চা করা একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং আমি অতুলপ্রসাদের গানকে আরও অভিনন্দিত করি ও সেটা এই ভেবে যে, এই গীতিকবির রচনার মধ্য দিয়ে বাঙালি এ রসের সম্পূর্ণ না হলেও অনেকটা পরিচয় পাবে ও আদর করতে শিখবে। অতুলপ্রসাদ অনেক গান লিখেছেন ও তার মধ্যে এ-শ্রেণীর হিন্দুস্থানী ঢঙের গান বড় কম নেই। উদাহরণত তাঁর কাফি-সিন্ধুতে রচিত 'মধুকালে এল হোলি' অথবা 'বাদল ঝুম্ ঝুম্ বোলে' গানটি নেওয়া যেতে পারে। এ গান দুটির মধ্যে যথাক্রমে হিন্দুস্থানী কাফির ও খাম্বাজের ঢঙে বড় সুন্দর খাপ খেয়েছে বলে মনে হয়।

অতুলপ্রসাদ গজল সুরে গুটিকতক বাংলা গান বড় সুন্দর রচনা করেছেন, যেমন, 'কত গান তো হল গাওয়া' অথবা 'ঝরিছে ঝর ঝর' অথবা 'কে গো তুমি বিরহিণী'। অতুলপ্রসাদ ঠুংরির চালে অনেকগুলি গান রচনা করেছেন, একথা পূর্বেই বলেছি। তার মধ্যে 'শ্রাবণ-ঝুলাতে বাদল-রাতে তোরা আয় গো, কে ঝুলিবি আয়' গানটির মধ্যে পিলু সাওয়ন বড় সুন্দর ফুটে উঠেছে।

শেষে অতুলপ্রসাদের কীর্তনের দু-একটি দৃষ্টান্ত না দিয়ে বর্তমান আসরের সমাপন করা চলে না। পূর্বেই বলেছি এই গীতিকবি তাঁর কীর্তনের মধ্যেও একটু নূতনত্বের হাওয়া এনেছেন। এ-নূতনত্ব কখনও বা কোনো মেঠো সুরকেই সুন্দর

---

১. Johan Bojer, *The Great Hunger.*

কথার সঙ্গে সাজিয়ে একটা উদাস ভাবের প্রবাহ আনে, যেমন তাঁর বাউলের সঙ্গে মেশানো কীর্তনে, যেমন 'যদি তোর হৃদ্-যমুনা' অথবা 'আর কতকাল থাকব বসে' গানটির মধ্যে। কখনও-বা এ অভিনবত্বের আমদানি হয় পুরনো আসল কীর্তনের মধ্যে দিয়ে ও আধুনিক ভাবকে ফুটিয়ে তোলার মধ্যে, যেমন তাঁর 'কত কাল রবে নিজ যশ-বিভব অন্বেষণে' গানটিতে।

১৩৫১। রামমোহন লাইব্রেরিতে পঠিত

গীতশিল্পী অতুলপ্রসাদ

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

অতুলপ্রসাদের সমগ্র গীতের সংখ্যা তিন শতেরও কম। এই সংখ্যা সামান্য। এর কারণ তিনি অবসরকালে বা নিতান্ত প্রেরণার বশেই সংগীত রচনা করেছেন। আর কোনো উদ্দেশ্য তার ছিল না। এ সংখ্যা সামান্য হলেও সাংগীতিক মূল্যের দিক থেকে অসামান্য। এই পরিধির মধ্যেই তিনি ভারতীয় সংগীতের বিভিন্ন রীতিনীতি ও কারুকলায় অপূর্ব পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন। লোকসংগীতের ধারায় তাঁর রচনাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। সবচেয়ে প্রধান কথা এরই মধ্যে তিনি তাঁর স্বকীয়তাকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন যাতে বাংলার সংগীতে তিনি একজন অবিস্মরণীয় সুরস্রষ্টা বলে পরিগণিত। তিনি শুধু জনপ্রিয় গীতিকারই নন, বুদ্ধি দিয়ে যাঁরা সংগীতকে উপভোগ করেন বা তার অনুশীলন করেন তাঁরাও তাঁকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা প্রদান করেন। অর্থাৎ, বাংলার সংগীতে তিনি একজন ঐতিহাসিক সুরস্রষ্টা।

অতুলপ্রসাদের সংগীতমানস কিরকম ছিল এ-প্রশ্ন স্বভাবতই আমাদের মনে আসে এবং এটা বিশেষ করেই আসে কেননা তিনি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক, অপরপক্ষে গ্রামোফোনের সমধিক প্রচারে সাধারণ্যে প্রচলিত সংগীতের তাঁর জীবিতকালে বহু নবপ্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রচলিত ধারার সঙ্গে তাঁর সংযোগ কতটা ছিল সেটাও আলোচ্য বিষয়, তার বেশ কয়েকটি গানও গ্রামোফোন রেকর্ডে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং এইগুলি লৌকিক রীতিতেই রচিত।

অতুলপ্রসাদের উপর রবীন্দ্রপ্রভাব সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। অনেকের মতে এই প্রভাব যথেষ্ট। অবশ্য কাব্য অর্থাৎ লিরিকের দিক দিয়ে যদি

বিচার করা যায় তাহলে অতুলপ্রসাদের উপর রবীন্দ্রপ্রভাব যে অসামান্য সেকথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। উদাহরণস্বরূপ অতুলপ্রসাদের একটি গানের কয়েকটি কলি উদ্‌ধৃত করি—

রাতারাতি করলে কে রে ভরা বাগান ফাঁকা?
রাঙা পায়ের চিহ্ন শুধু আঙিনাতে আঁকা;
তোলা ফুলের খালি বোঁটায় ছোঁয়াচ গন্ধ মাখা।
ভেবেছিলাম ভোরে উঠে ভরব ফুলডালা,
কারও পায়ে দিব অর্ঘ্য, কারও গলায় মালা।
কোথা হতে এল রে চোর সকল চোখের আলা।

● ● ●

চাইত যদি চোরে এসে আমার কুসুমগুলি,
উজাড় করে দিতাম তারে আপন হাতে তুলি।
পারত কি সে চলে যেতে—আমায় যেতে ভুলি?

এই রচনায় রবীন্দ্রপ্রভাব সুস্পষ্ট, কিন্তু গানে এটি প্রকাশ পেয়েছে গজল ঢঙে। এইভাবে বহু ক্ষেত্রেই গানের বেলায় অতুলপ্রসাদ যে-রীতি অনুসরণ করেছেন তা রবীন্দ্রনাথ অনুসরণ করতেন না।

অতুলপ্রসাদ চিরাচরিত লৌকিক প্রথায় গান রচনা করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। দু-একটি এই ধরনের গানের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

পিলু খাম্বাজ

বাদল ঝুম্ ঝুম্ বোলে
না জানি কি বলে।
বুঝিতে পারি না কথা
তবু নয়ন উছলে।

কাহার নূপুরধ্বনি
শুনি ইহে আগমনী?
বিরহী পবন তারে যাচে;
আশা-ময়ূর পুচ্ছ মেলি নাচে—
রাখিব পরানখানি তার চরণতলে

গানটি তিনি পবিণত বয়সেই বচনা কবেন। সুবসাগব হিমাংশুকুমাব দত্ত এই গানেব স্ববলিপি কবেন। কবিব কাছে এই গানটি শুনে তাব মাধুর্যে তিনি মুগ্ধ হযেছিলেন, স্ববলিপিব সঙ্গে একথাও তিনি বলেছেন। তাঁব উক্তিই উদ্‌ধৃত কবি—

"এই গানখানি কবি গত পৌষ মাসে বচনা কবেছেন। তাঁব কাছ থেকে শিখে আমি গানটিব স্ববলিপি কবেছি। সাধাবণত কানে শুনে তাডাতাডি শিখলে যে-কোনো গানই শিক্ষার্থীব নিজেব ব্যক্তিগত সুবপ্রকাশেব ভঙ্গীতে পড়ে কিছু বদলে যায়, সেজন্যই আমি কবিব কাছে গানখানি শেখবাব সময প্রত্যেক লাইনেব সুব তাঁব মুখে বাব বাব শুনে স্ববলিপি কবেছি। কবি যে-সুবে নিজে গানখানি গান কবেন, আমি হুবহু সেই সুবেবই স্ববলিপি এখানে দিলাম, নিজেব ব্যক্তিগত বিশেষত্ব দেখাবাব কোন চেষ্টা এতে আমাব নেই। ভাল হিন্দি গান যাঁবা শুনেছেন তাঁবা গানখানিব সুবেব সৌন্দয উপলব্ধি কবতে পাববেন।"[1]

এই ধবনেব গানেব বিশেষত্ব হল এই যে সব শ্রেণীব শ্রোতাই এইসব গানে আকৃষ্ট হবেন, কিন্তু তাঁবা [illegible] যেব পিতা একজন অসাধাবণ প্রতিভাবান সুবস্রষ্টা [illegible] তিনি একত্র হয়ে [illegible] অসাধাবণত্ব তিনি বজায় বেখেছেন।

তাঁব যেসব গান [illegible] ভঙ্গিতে বাঁধা মনে হয় সেগুলিতেও এমন একটি স্বকীযতা আছে যাতে গানগুলোতে [illegible] ব্যক্তিত্বও কম পবিস্ফুট নয়। প্রায় ববীন্দ্রসংগীতের মতো লাগে এমন গান হযত 'আমাবে কে আবাবে' বা 'আমাব কাজ অচল [illegible]'—এইবকম দু একটিই আছে। 'ওবে মন তোব বিজনে সংগোপনে কোন উদাসী থাকে'—এ গানটিব প্রথম লাইন শুনলে হয়তো ববীন্দ্র-বচনাব মতো মনে হবে। কিন্তু

[illegible]
[illegible]
[illegible]

এই অংশটুকু শুনলেই দ্বিধা থাকে না যে এ ধবন ববীন্দ্রনাথেব নয়, অতুলপ্রসাদেব আব-একটি উদাহবণ ধবা যাক—'বঁধু এমন বাদলে তুমি কোথা' এই গানটি

---

১. ভাবতবর্ষ, ১৭ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা

প্রত্যেকটি গান শুনলেই বোঝা যায় আবেদন, প্রয়োগ, সুরগ্রন্থনা, স্বরসামঞ্জস্য —এসব বিষয়ে অতুলপ্রসাদের একটি নিজস্ব ভঙ্গিমা ছিল যা তাঁকে সুরস্রষ্টা হিসাবে একটি স্বাতন্ত্র্য প্রদান করেছে।

অতুলপ্রসাদের ধ্রুপদাঙ্গ গান খুব কম। ইমনকল্যাণে 'নমো বাণী বীণাপাণি' একটি খাঁটি ধ্রুপদ। রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ ধ্রুপদ বহু রচনা করেছেন। এ ছাড়া জয়শ্রী রাগে রচিত 'ক্ষমিয়ো হে শিব' গানটির আঙ্গিকও ধ্রুপদের। বোধ করি তিলক-কামোদে 'জানি জানি তোমারে গো রঙ্গরানী' গানটিও ধ্রুপদের ঠাটে গাওয়া যেত কিন্তু সঞ্চারীতে কীর্তনাঙ্গ যুক্ত হওয়ায় এ গানটির চাল পাল্টে গেছে। বস্তুত ধ্রুপদাঙ্গের সঙ্গে কীর্তনাঙ্গের এমন চমকপ্রদ মিশ্রণ বাংলা গানে কদাচিৎ হয়েছে। কম্পোজার হিসাবে অতুলপ্রসাদ যে কত বড় তা এই ধরনের দুটি বিভিন্ন জাতীয় মিশ্রণ থেকে বোঝা যায়।

প্রচলিত লৌকিক রীতির সঙ্গে অতুলপ্রসাদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথেরও মধ্যবয়স পর্যন্ত এই সম্পর্ক খানিকটা ঘনিষ্ঠই ছিল কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি যে স্টাইল গড়ে তোলেন তা তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব। এইটি হচ্ছে বিশিষ্ট রাবীন্দ্রিক রীতি। কিন্তু অতুলপ্রসাদ বরাবরই চলমান সংগীতধারার সঙ্গে নিজেকে যেন যুক্ত রেখে গেছেন। বরঞ্চ এই ধারাকে তিনি আরও প্রসাবিত করেছিলেন উত্তরভারতীয় পূর্বি ঢঙের বহু লোকরীতির বৈশিষ্ট্য সংযোগ করে। উত্তরভারতীয় কতকগুলি লৌকিক রীতির বৈশিষ্ট্য এই যে এগুলিতে বহুলাংশে রাগসংগীতের স্পর্শ আছে। এমনকি রাগসংগীতের আঙ্গিকেও এর অনেক গান গাওয়া যায়; যেমন কাজরী, লাউনী, পিলু বারোয়াঁ, সাওয়ানী প্রভৃতি। এইসব পযায়েব গানগুলিকে অনেকটা ধুনের মতোই মনে হয়। অতুলপ্রসাদ এইসব নানা ধরন-ধারণই তাঁর বিভিন্ন গানে প্রয়োগ করেছিলেন কিন্তু তাতে তাঁর রচনার মান এতটুকু ক্ষুন্ন হয় নি বরঞ্চ আরও অনেক মানবিক ও মর্মস্পর্শী হয়েছে। অতুলপ্রসাদ যে এত জনপ্রিয় এইটি তার একটি প্রধান কারণ। এইসব রীতিতে তিনি যেসব গান রচনা করেন তার কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখ করি: যথা—কাজরী ঢঙে 'জল চলে চল মোর সাথে চল', লাউনীতে 'কেন এলে মোর ঘরে', 'কে গো :গাহিলে পথে', সাওয়ানে "ঝরিছে ঝর ঝর', 'শ্রাবণ ঝুলাতে' পিলুবারোয়াঁয় 'কে আবার বাজায় বাঁশি', 'ওগো আমার নবীন সাথী',—এই ধরনের আরও গান যাঁরা বিশেষজ্ঞ

তাঁরা খুঁজে পাবেন। গ্রামোফোন রেকর্ডে এর কয়েকটি গান আমাদের শোনা এবং অতি পরিচিত। একসময় এসব গানের অসামান্য জনপ্রিয়তা ছিল। বিশেষ করে—লাউনী (লগ্নী) ধারার দুটি গান খুবই মর্মস্পর্শী। 'ঝরিছে ঝর ঝর' গানটি যেন বর্ষার একটা রিমঝিম ভাব বহন করে আসে। গানটির ধরন এবং চলন উভয়ই ভারি মিষ্টি। এ ছাড়া 'চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে' এই সুপরিচিত গানটিতে কাফি, খাম্বাজ এবং পিলুবাগের মিশ্রণ অতি মধুর। 'মোর আজি গাঁথা হল না মালা' এবং 'ওগো দুখী কাঁদিছ কি সুখ লাগি' —পিলুবারোয়াঁ ধরনের এই দুটি গানের বৈচিত্র্যও অসাধারণ। প্রথমটিতে চমৎকার লচক ফুটে উঠেছে, দ্বিতীয়টিতে ফুটে উঠেছে ঠুংরীর অনুপম মাধুয। তথাকথিত নটমল্লারে অতুলপ্রসাদের দুটি গান আছে—'যাবনা যাবনা ঘরে', 'জয়তু জয়তু জয়তু কবি', দুটি গানের সুরই একরকম। গীতগুঞ্জে সুর হিসাবে 'নটমল্লার' উল্লেখ থাকলেও এই ধরনের গানকে যেন খাম্বাজ অঙ্গের বলেই মনে হয়। জানি না কবি কোনও হিন্দী গানের আদর্শে এই রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন কিনা, সম্ভবত তাই, কিন্তু সে গানটির উল্লেখ না পাওয়া গেলে এর সুর সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারা যায় না। তবে এ সুরটি যে খাম্বাজেরই একটি প্রকারভেদ সে বিশ্বাসটিই এর আকৃতি-প্রকৃতি দেখে দৃঢ় হয়। আরও একটি গান—'মোরা নাচি ফুলে ফুলে দুলে দুলে'—এটিকেও নটমল্লার বলা হয়েছে; কিন্তু এর ঢঙটিও উক্ত সুরের অনুরূপ নয়, প্রধানত খাম্বাজেরই রকমফের। 'জয়তু জয়তু জয়তু কবি' গানটি রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে লেখা, কিন্তু কোন সময়ে গানটি রচনা করা হয় সেটি সংগ্রহ করতে পারিনি। এ সম্বন্ধে কেউ আলোকপাত করতে পারলে ভাল হয়। শুনেছি 'প্রভা'তে যারে নন্দে পাখি' গানটিও লখনৌয়ে রবীন্দ্রনাথের আগমন উপলক্ষে রচিত। অতুলপ্রসাদ বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে যেসব গান রচনা করেন সেগুলির উল্লেখও তাঁর ভবিষ্যৎ গীতসংগ্রহে থাকলে ভাল হয়।

এই যে ধরনগুলির উল্লেখ করা হল—এই জাতীয় রচনায় অতুলপ্রসাদ সম্পূর্ণ নিজস্ব ধারা খুঁজে পেয়েছেন। এই সমস্ত রীতির প্রভাবেই বাংলায় "রাগপ্রধান" নামে একটি ধারার উদ্ভব হয়েছে। কলকাতা বেতারকেন্দ্রের পরলোকগত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাকে বলেছিলেন যে উক্ত পর্যায় উদ্ভাবন করবার সময় অতুলপ্রসাদের গানগুলির কথাই তাঁর বিশেষভাবে মনে ছিল। বোধ করি সম্পূর্ণ স্বীয় ব্যক্তিত্ব আরোপ করে একটি স্বতন্ত্র স্টাইল তৈরি করা অতুলপ্রসাদের

উদ্দেশ্য ছিল না। যেসব ধারা চলে এসেছে এবং পারিপার্শ্বিক সংগীতে যেসব ধারা অনুসৃত হয়ে চলেছে এই উভয়কেই তিনি সাদরে গ্রহণ করেছেন এবং নিজেকে সেইসব ট্র্যাডিশনের সঙ্গে খুব স্বাভাবিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক শীলবত্তা এই ঐতিহ্যবাহী সংগীতেও তাঁর নিজস্ব একটি নমনীয় স্নিগ্ধ, সুকোমল এবং বিদগ্ধ মনোভাবকে পরিস্ফুট রেখেছে।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি গানের উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। গানটি 'সঙ্গীতবিজ্ঞান-প্রবেশিকা'য় (পৌষ ১৩৩৫) বেরিয়েছিল, স্বরলিপিকারের নাম হরিহর রায়।

[illegible]

[illegible] যমুনার জল আনিতে
বিজন [illegible]।
[illegible]
কেলেসোনা [illegible]

গানটির সঙ্গে অতুলপ্রসাদের নাম যুক্ত থাকলেও অনেকে বোধ করি সন্দেহ পোষণ করেন গানটি সত্যিই তাঁর রচনা কি না। এর কারণ গানের শেষ চরণে "কেলেসোনা" শব্দটির প্রয়োগ। অতুলপ্রসাদের পক্ষে এরকম গ্রাম্য শব্দের প্রয়োগ সম্ভব নয় বলেই তাদের ধারণা। এই কারণেই বোধ করি গানটি একেবারেই গাওয়া হয় না। কিন্তু এটাও উল্লেখযোগ্য যে সুরের দিক থেকে এই গানে অতুলপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য এবং ভঙ্গীর পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। লেখকের বিশ্বাস এটি অতুলপ্রসাদেরই রচনা। প্রচলিত লৌকিক শব্দাদির প্রতি অতুলপ্রসাদের বিলক্ষণ আকর্ষণ ছিল। কোনো মুহূর্তে তিনি এই শব্দটি গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেননি।

রাগভঙ্গিম যত গান অতুলপ্রসাদ রচনা করেছেন তার মধ্যে খাম্বাজে রচিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। খাম্বাজ, মিশ্র খাম্বাজ, গুজরাটি খাম্বাজ, সিন্ধু খাম্বাজ, বেহাগ খাম্বাজ, ঝিঁঝিট খাম্বাজ, পিলু খাম্বাজ প্রভৃতি খাম্বাজ অঙ্গের বিভিন্ন ধরনই তাঁর কাছে প্রিয় ছিল। এই শতাব্দের গোড়ার দিকেও খাম্বাজ ছিল বিশেষ জনপ্রিয় রাগ। তা ছাড়া ঠুংরী, টপ্পা বা বিভিন্ন দেশী গীতে খাম্বাজের প্রভাবই বোধকরি সবচেয়ে বেশি। এরপরেই তাঁর প্রিয় রাগ ছিল ভৈরবী। এতেও তাঁর
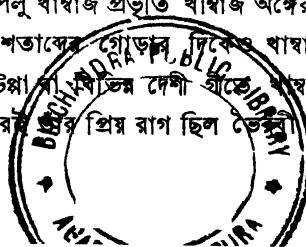
অনেক বিখ্যাত গান আছে যার উল্লেখ পূর্বেই করেছি। তাঁর ভৈরবী বড় করুণ এবং মধুর। প্রয়োগে, মীড়ে, ছোট ছোট কাজে এবং সংগঠনে এই রাগের রচনাগুলিতে এমন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে যা একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব। অবশ্য একথা তাঁর আরও প্রিয় রাগ, যথা—বেহাগ, সিন্ধু, কাফি, পিলু, দেশ সম্পর্কেও বলা যায়। প্রত্যেকটি রাগেই তাঁর বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় গান রয়েছে। কয়েকটি স্বল্পপ্রচলিত রাগেও তাঁর গান আছে, যথা—মেঘ, পঞ্চম, নটনারায়ণ, নায়কী কানাড়া, কর্ণাটী, খট্—এই সব। 'তব পারে যাব কেমনে'—গানটি রাগভঙ্গীম কাব্যসংগীতে একটি অপূর্ব সৃষ্টি। এর সুর নায়কী কানাড়া বলা হয়েছে। উত্তব ভারতে প্রচলিত নায়কী কানাড়ার সঙ্গে এই সুরের তেমন মিল নেই বরঞ্চ রবীন্দ্রনাথ এই রাগের যে-রীতি অনুসরণ করেছেন (যেমন,—'সুধা-সাগর তীরে') তার সঙ্গে এর কিছুটা মিল পাওয়া যায়। এতে কোমল ধৈবতের প্রয়োগ আছে, শুদ্ধ নি এবং শুদ্ধ রে প্রবল। এ ছাড়া কোমল গান্ধারের প্রয়োগ এবং কানাড়া অঙ্গের কয়েকটি বিশিষ্ট আন্দোলনও এই গানে পরিলক্ষিত হয়। এই গানটি বচনাব দিক দিয়ে বেশ ভারী। অতুলপ্রসাদ সাধারণত খুব ভারী ধরনের গান রচনা করেননি কিন্তু তাঁর গানে স্বতঃসম্পৃক্ত করুণ মধুর ভাবটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশ গাম্ভীর্যের সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ গানটি তারই একটি উদাহরণ।

অতুলপ্রসাদের রচনাপ্রসঙ্গে তাঁর মরমী গজলগুলির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যদিও কাজী নজরুল ইসলাম বাংলায় গজলকে বহু বৈচিত্র্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তথাপি অতুলপ্রসাদের প্রচেষ্টাও এ-বিষয়ে কম নয়। লখনৌবাসী হিসাবে তাঁর পক্ষে এটি সহজ ছিল কেননা লখনৌ ছিল তৎকালে উর্দুচর্চার পীঠস্থান এবং ভাল ভাল গজল তিনি শুনেছেন—এটা স্বাভাবিক। শুনেছি দিলীপকুমারের লেখা 'যদি দিন না দেবে তবে এত ব্যথা কেন সওয়াও'—এই গজলটি শুনে তিনি 'কত গান তো হল গাওয়া' এই বিখ্যাত গজলটি রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। দিলীপকুমারের উক্ত গানটির স্বরলিপি ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকা, পৌষ ১৩৩০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এটি কলকাতায় যে সময়ে শুনেছি সে সময়ে নজরুলের খ্যাতি বিস্তৃত হয়নি। তাঁর অপর একটি সুমধুর গজল হচ্ছে—'কে গো তুমি বিরহিণী আমারে সম্ভাষিলে।' গীতিগুঞ্জ গ্রন্থে 'ভাঙা দেউলে মোর কে আইলে আলো হাতে', 'ওগো ক্রন্দসী পথচারিণী' এ গান দুটিকেও গজল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'রাতারাতি করলে কে রে

ভরা বাগান ফাঁকা' গানটির কথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু এ ছাড়াও তাঁর কয়েকটি গানের ধরন গজলের মত এবং সেগুলিকে এই পর্যায়েও ফেলা যায়। উদাহরণ-স্বরূপ—'কে তুমি ঘুম ভাঙায়ে', 'তব অন্তর এত মন্থর', 'এ বনেতে বনমালী' এই গানগুলির উল্লেখ করা যায়। গজল তো সুর নয়, কবিতারই একটা ধারা—সুরে-তালে সেই কবিতার রূপ দেওয়া হয়। নজরুল গজলে সুর করে কাব্য আবৃত্তির (শের) ধরনটিও দেখিয়ে গেছেন। অতুলপ্রসাদ এইরকম কোনো প্রচেষ্টা করেননি।

লোকসংগীতে কীর্তন ও বাউল অতুলপ্রসাদের খুবই প্রিয় ছিল। তাঁর কীর্তনাঙ্গ রচনার মধ্যে 'আমার চোখ বেঁধে ভবের খেলায়', 'ওগো সাথী মম সাথী', 'কতকাল রবে যশ-বিভব অন্বেষণে', 'যদি তোর হৃদ্‌যমুনা' প্রভৃতি বিশেষ বিখ্যাত। তাঁর উদার হৃদয়ের সমগ্র মাধুর্য এবং কারুণ্য যেন তিনি এইসব গানে ঢেলে দিয়েছেন। বাউল ধরনের রচনার মধ্যে 'মনরে আমার শুধু তুই বেয়ে যা দাঁড়', 'আর কতকাল থাকব বসে', 'মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন দেশে', 'প্রকৃতির ঘোমটাখানি খোল', 'মোদের গরব মোদের আশা' প্রভৃতি গান সুপরিচিত। এইসব গানে লোকসংগীতের মধ্যে অপরূপ মেলডির স্পর্শ রয়েছে এবং এগুলিতে যে আকুতির প্রকাশ ঘটেছে তা একান্তভাবে অনুভূতির বস্তু। এই গানগুলি যখন শুনি তখন অভিভূত হই রচনার প্রাণস্পর্শী আন্তরিকতায় এবং মরমিকতায়। বাউল রচনায় অতুলপ্রসাদ অতিমাত্রায় রোমান্টিক। 'প্রকৃতির ঘোমটাখানি খোল'—গানটির শেষাংশ :—

'আজি নিখিল-কুঞ্জবনে
মিলন পরম বঁধুর সনে,
বড়ো সাধ মনে বঁধু
এ মোহন রাতে আমার সাথে
বিশ্বদোলায় দোল্ লো বধূ,
বিশ্বদোলায় দোল্!'

এই অংশটি যখন শুনি তখন আমাদের সমগ্র সত্তা যেন এক অপূর্ব মিলনের মাধুর্যে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, আমাদের চিত্তও যেন এক পরম পুলকের দোলনে দুলতে থাকে।

অতুলপ্রসাদের সমগ্র রচনা পরিক্রমা করে উপলব্ধি করা যায় যে তিনি এমন

একটি স্তরে এসেছিলেন যেখানে শিল্পী একটি সার্থক চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। তখন একটা বোধ মনকে জাগ্রত করে যার ইঙ্গিতে শিল্পীর সমগ্র সৃষ্টি সৌন্দর্যে, মাধুর্যে, গভীরতায়, মানবিকতায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। খুব কম সংগীতশিল্পীই এই স্তরে উন্নীত হতে পারেন। আমাদের সংগীতজগতে যে স্বল্প কয়েকজন এই দিব্য অনুভূতির স্পর্শলাভ করে পুণ্যশ্লোক বলে পরিগণিত হয়েছিলেন অতুলপ্রসাদ তাঁদেরই একজন।

সুরে-ভরা দিনগুলি

শ্রীসাহানা দেবী

অতুলপ্রসাদ সেন-এর কথা মনে হলেই মনে পড়ে তাঁর গানের কথা, মনে পড়ে সেইসব সুরে-ভরা সংস্পর্শের আনন্দমুখর দিনগুলির কথা। অতুলদা আমার আত্মীয়, আমার আপন পিসতুতো ভাই হলেও তাঁর সঙ্গে আমার যে-সম্বন্ধের মূল্য আমার কাছে ছিল আত্মীয়তার চাইতেও বেশি, তা হচ্ছে সংগীত নিয়ে সম্বন্ধ। অতুলদা ছিলেন গানপাগল, আমিও পড়ি সেই পর্যায়েই। গান পেলে হয়ে যেতাম যেন অন্য মানুষ। রবীন্দ্রনাথের কাছে গান গেয়ে যেমন মন ভরে উঠত, অতুলদার কাছেও হত সেইরকম। গান শুনে অত খুশি হয়ে উঠতে আমি কমই দেখেছি। কি যে করবেন যেন ভেবে পেতেন না। কত দীর্ঘ সময় ধরে এঁদের কাছে বসে আমি গান গেয়েছি। কখনও শিখেছি, কখনও একটানা একটার পর একটা গেয়েই চলেছি। গান শুনে কখনও এঁদের ক্লান্ত হতে দেখিনি। বরং মনে হয়েছে গান শোনার আনন্দে এঁরা ভুলে যেতেন আর সব। বড় ভালো শ্রোতা ছিলেন। অতুলদা শুধু সংগীত-অনুরাগীই ছিলেন না, সংগীত ছিল তাঁর প্রাণ, সত্তার নিত্য সহচর। গাইতেনও সুন্দর। আওয়াজ খুব জোর না হলেও ভারি অন্তরস্পর্শী, মিষ্টি-মধুর আর দরদে-ভরা ছিল কণ্ঠস্বরটি। যখনই গাইতেন, যে-গানই গাইতেন, প্রাণে লেগে থাকত তার স্পর্শ, মধুরতার একটা রেশ। অতুলদার রচিত সব গানগুলিতে আমরা পাই একটা বিশেষ মধুরতার আস্বাদ। তাঁর নিজের গান তাঁর মুখে যা শুনেছি, আর এখন যা সচরাচর শুনতে পাই তা এতই তফাৎ যে, তা যেন আর অতুলদার গান বলে চেনা যায় না।

মৃদু মধুর সুরের নানা কাজের আলো-ছায়ার ভিতর ছোট্ট এক-একটি খোঁচ ও এক-একটি মোচড়ের ভিতর তাঁর সংগীতে ধরা পড়ে সূক্ষ্মতার স্পর্শ, রস, কমনীয়তা

ও লালিত্য। সব জড়িয়ে তাঁর গান হয়ে ওঠে অদ্ভুত একটা 'ডেলিকেসি'। অতুলদার গানের বিশেষত্ব এইখানেই। নিজস্বতার ছাপ, স্বকীয়তার ধরন। তারই মাঝে আমরা শুনতে পাই অতুল-গীতির মর্মের সুর। এ গানের মাধুর্য এমন যে শুনলেই মন স্বতঃই বলে ওঠে, 'আহা'। এই 'এমন' জিনিসটিই দেয় অতুলদার গানের আসল পরিচয়। তাঁর সংগীতে, সুরচিত্রণে নেই জাঁকজমকের ঘটা, নেই চমক লাগাবার চেষ্টা, আছে পেলব মাধুর্যের স্নিগ্ধতায় ভরা মনোহরা স্পর্শ; স্বরলিপিতে এসব কিছুই পাওয়া যায় না। এসবের স্বরলিপি করা যায় না, করা সম্ভবও নয়। শুধু যে অতুলদার গানের বিষয় বলছি তা নয়, এই জাতীয় বিশিষ্ট শ্রেণীর বাংলা গানের সম্বন্ধেই বলছি, যে-জাতীয় গানে কথার মূল্য বিশেষভাবে ধরা হয়ে থাকে। বাংলা গানে কথার ভাব বাদ দেওয়া যায় না কেননা তার কথার সঙ্গে সুরের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। বিশিষ্ট শ্রেণী বলছি এই কারণে যে, গান রচনা হয়ত অনেকেই করে থাকেন কিন্তু যেসব গীতকারের গান তাঁদের বৈশিষ্ট্যের গুণে বিশেষ আসন পায়, একটা বিশেষ পর্যায়ে পড়ে, আমি বলতে চাইছি সেইসব গুণীদের গানের কথা। স্বরলিপিতে গানের সুরের কাঠামোটুকুই কেবল দেওয়া যায়। বাকি সব দিতে হয় গায়ককেই। সেইজন্যে যাঁরা শুধু স্বরলিপি থেকে গান তোলেন, রচয়িতার গান-সম্বন্ধে গানের ধরনধারণ বা ধারা সম্বন্ধে যাঁদের সেরকম কোনো জ্ঞান নেই, অভিজ্ঞতা নেই, ধারণাও বিশেষ নেই, তাঁদের তোলা গানের সঙ্গে রচয়িতার গানের এত বেশি পার্থক্য থেকে যায় যে, সে গানের মধ্যে রচয়িতার গানকে খুঁজে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় না তার আসল জিনিসের স্পর্শ; ফোটে না তার যথার্থ রূপ; আর বাদও পড়ে অনেক কিছুই। সুরের কাঠামোই তো গান নয়। তাই শুধু স্বরলিপি থেকে গান তোলা সম্পূর্ণ হয় না, সফলও হতে পারে না: যদি-না গায়কের রচয়িতার রচনার সঙ্গে নিকট পরিচয় ও বিশেষ অন্তরঙ্গতা থাকে, যদি-না কোনটি রচয়িতার নিজস্ব ছাপ ও বিশেষত্ব সেটিকে তিনি হৃদয়ঙ্গম করে থাকেন, যদি-না অন্তরে তাঁর গানের অতলস্পর্শী ভাব উপলব্ধি করে থাকেন। নইলে হাজার বিশুদ্ধভাবে স্বরলিপির সুরকে অনুসরণ বা অবিকল অনুকরণ করে গেলেও রচয়িতার গানের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে না, ধরা যায় না তাঁর দেয় বস্তুটিকে আর পাওয়া যায় না তাঁর রচিত গানকে বা গানের প্রকৃত পরিচয়। যথার্থ শিল্পীমাত্রেরই থাকে তাঁর প্রতিভার নিজস্ব ছাপ, যা দিয়ে তাঁকে চেনা যায়, যেটি দেয় তাঁর পরিচয়। আমি শুধু আমাদের গীতকারদের কথাই বলছি না। কাব্য, সাহিত্য, চিত্র, সংগীত,

নৃত্য, নাট্য প্রভৃতি শিল্পকলা-জগতের সব শিল্পিবৃন্দের কথাই আমি বলছি। তাঁদের প্রত্যেককে আমরা চিনতে পারি তাঁদের নিজস্ব ছাপটি দিয়ে। এই ছাপ দিয়েই আমরা চিনতে পারি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে, চিনতে পারি অতুলপ্রসাদকে। এমনি করেই দ্বিজেন্দ্রলাল, শরৎচন্দ্র, কাজী নজরুলকে চিনেছি, চিনেছি আবদুল করিম, ফৈয়াজ খাঁ, বড়ে গোলাম আলী, কেশরবাঈ, ভীষ্মদেব আর আলাউদ্দীন, হাফেজ আলী, এনায়েত খাঁ, আলী আকবর, তিমিরবরণ, পণ্ডিত রবিশঙ্কর প্রভৃতি সংগীতমুকুটমণিদের।

ছোটবেলায় অতুলদার সঙ্গে যে আমাদের খুব একটা দেখা-সাক্ষাৎ হত তা নয়। তার কারণ তিনি থাকতেন পশ্চিমে লখনৌ শহরে, আমরা কলকাতায় আমাদের মামার বাড়িতে। এই বাড়িই পরে 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন'-এ রূপান্তরিত হয়। আমাদের পিতামহের (ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত) সব নাতি-নাতনীদের মধ্যে অতুলদাই ছিলেন সকলের বড়। আমরা, গুপ্ত-পরিবারের ভাই-বোনেরা, তাঁকে ডাকতাম 'ভাইদা' বলে। অতুলদা যখন লখনৌ আদালতে যোগ দেন আমরা তখন ছোটো। আমি জন্মাবার দুতিন বছর আগেই তিনি বিলেত থেকে ফিরে আসেন আইনজীবী হয়ে। পারিবারিক কোন অনুষ্ঠানে কখনও কলকাতায় এলে দেখা হত। সে সময় প্রায়ই দেখতাম আত্মীয়-স্বজনেরা অনেকেই ভাইদাকে ঘিরে বসেছেন গান শোনার আগ্রহে। বিশেষ করে তাঁর স্বরচিত গান সম্বন্ধে সকলেরই খুব উৎসাহ ছিল। মনে আছে ছোটবেলায় আত্মীয়-স্বজনের কারও নামকরণ হলে তাঁর রচিত এই গানটি আমরা প্রায়ই গাইতাম

তোমারি উদ্যানে তোমারি যতনে উঠিল
কুসুম ফুটিয়া।

গানটি আমার জ্যাঠামশায় সার কে. জি. গুপ্তের কনিষ্ঠা কন্যা আমাদের তপ্‌সীদির (ইলা সেন—পাটনার গুরুপ্রসাদ সেনের পুত্রবধূ, সারদাপ্রসাদ সেনের পত্নী) নামকরণ উপলক্ষে ভাইদা রচনা করেন। শুনেছি তাঁর নিজের বয়স তখন খুবই কম ছিল। চোদ্দ পনেরোর বেশি নয়।

অতুলদার কাছে আমার প্রথম শেখা গান হল—'তব পারে যাব কেমনে হরি'। গানটি শিখি দার্জিলিঙে ম্যাকেন্‌জি রোডের উপর ডাক্তার পি. কে. রায়ের (আমাদের বড় মেসোমশায়) 'রুবি হল্‌' নামক বাড়িতে বসে। সেই

একই দিনে—'বঁধু, ধর ধর মালা, পর গলে' গানটিও শিখি। অতুলদা এসে সেবারে ওই বাড়িতে ছিলেন। আমি ছিলাম আমার বাল্যবন্ধু বুবুদের বাড়ি।

অকল্যাণ্ড রোডের উপর 'হ্যাভলক ভিলা' নামের বাড়িটির পাশ দিয়ে যে সরু রাস্তা নেমে গেছে, তার ঠিক অপর পারেই ছিল যে-বাড়ি সেই বাড়িতে বুবুরা ছিল। ওদেরই সঙ্গে সেবার মা আমায় পাঠিয়েছিলেন। বুবুর মা জ্ঞানদা মাসিমা আমাদের মায়ের খুবই অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আমার মামা সুধীরঞ্জন দাশের (সুপ্রিম কোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি ও বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব উপাচার্য) সঙ্গে পরে বুবুর বিয়ে হয়। অতুলদার কাছে গান শেখার ইচ্ছে অনেক দিন থেকেই কিন্তু এ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠেনি। এইবার দার্জিলিং পাহাড়ে প্রথম সেই সুযোগ ও সুবিধা পাওয়া গেল। এত আনন্দ হল তাঁর কাছে গান শিখতে পেরে। যে ক-টা গান পারলাম শিখে নিলাম। অতুলদার গান শেখানোর ধরন আর পদ্ধতিটি এমন ছিল যে, গান শেখার আনন্দ ও আগ্রহ দুই-ই যেন দ্বিগুণ বেড়ে যেত। তিনি নিজেও গান শেখাতে উৎসাহিত বোধ করতেন। দেখতাম তাঁর সংগীতপিপাসু মন কিরকম রসঘন হয়ে উঠত। গান শুধু শুনতেই ভালবাসতেন না, শেখাতেও ভালবাসতেন সমানই। সেবার দার্জিলিঙে যখন যাই তখন কৈশোরের সীমা ছাড়িয়ে চলে এসেছি। খানিকটা ছাড়া পেয়ে বেশ নিজের ইচ্ছেমত চলাফেরা করার নিত্য নতুন আনন্দের রসাস্বাদন করছি। কিন্তু হলে হবে কি! তার সঙ্গে আরও দেখেছি, চারিদিকের অজস্র অফুরন্ত রাশি রাশি অপূর্ব সৌন্দর্যের মাঝে কিসের হাতছানি যেন আমার মনে কেবলই ছায়া ফেলত, কেবলই যেন কোথায় কোনদিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইত। হিমালয়ের ওই স্তব্ধতা, ওই অটলতা, ওই অকল্পিত বিরাটত্ব অন্তরের গভীরে কোথায় যেন নাড়া দিত, ধ্বনিত করে তুলত কি এক সুর তার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে—আমার চিত্ত হয়ে উঠত 'অকারণে চঞ্চল'। হিমালয় পর্বতকে দেখে শুধু পর্বত মনে হত না। কেন জানি না মনে হত ধ্যান-নিশ্চল কোন এক বিরাট সত্তা। এইসব অনুভূতি একদিকের, আবার আরেক দিকের আরেকটি জিনিস আমাকে টানত যা ছেলেমানুষি, না হয় পাগলামিই বলা চলে। বাড়ি থেকে বের হলে আর সঙ্গে কেউ না থাকলে, পাকা সড়ক ছেড়ে দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে যেখানে পথ নেই সেইসব জায়গার ভিতর দিয়ে চলতে, ওঠানামা করতে খুব ভালো লাগত। মনে আছে তখন আরও

ছোটো, ওইভাবে পাহাড়ের গায়ে পথ-না-থাকা পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম। এক-এক সময় এমন দিকে চলে যেতাম যে, আশেপাশে জনমনিষ্যির বসতি দেখতে পাওয়া যেত না আর তা আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্ক যে না হত তা নয়। তবু দমবার পাত্রী ছিলাম না। কখনও এমন হয়েছে, পা হড়কে পড়বার মুখে ছোট ছোট গাছের ঝোপের খানিকটা আঁকড়ে ধরে কোনোরকমে সামলে গেছি। এইসব ঝোপঝাড়ের মাঝে ভারি সুন্দর ছোট ছোট হলদে একরকম অম্লমধুর ফল পাওয়া যেত, তার প্রতিও লোভ কম ছিল না। কখনও ফিরবার পথ হারিয়ে ফেলতাম। তা সত্ত্বেও এইসব অজানা অচিন পথে যাবার একটা প্রবল নেশা কেমন আমায় পেয়ে বসত। রোখ চেপে যেত। বোঝা যাচ্ছে তখন থেকেই অ্যাডভেঞ্চার-জাতীয় জিনিস বেশ পছন্দ ছিল। দার্জিলিং যাওয়া-আসা আমাদের ছোটবেলা থেকেই, তবু দার্জিলিঙের আকর্ষণ কখনও কমেনি। দার্জিলিঙে যাবার কথা উঠলেই ভীষণ উৎফুল্ল হয়ে উঠতাম।

সেবার 'গ্লেন ইডেন' দু নম্বরের বাড়িতে ছিলেন সার নীলরতন। তাঁর মেয়েরা, অতুলদা ও আমি, আমরা সবাই একসঙ্গে প্রায়ই বেড়াতে যেতাম। অতুলদা নানা গল্প বলে আমাদের খুব হাসাতেন, নিজেও হাসতেন, হাসিটি ছিল ভারি প্রাণখোলা। এমনিতে তিনি ছিলেন ভারি শান্ত, ধীর-স্থির। খানিকটা লাজুক, মিষ্টভাষী ও মোলায়েম প্রকৃতির। কিন্তু অন্তরঙ্গ-মহলে মানুষটি ছিলেন বেশ মজলিসী-মেজাজের। সবাইকে নিয়ে যখন গল্পের আসরে বসতেন তখন কি যে জমাতেন! একদিন একটি মজার গল্প করছিলেন: ব্রিটিশ সরকার বোধ হয় টাকাকড়ির ব্যাপারে কড়াক্কড়ি কিছু একটা করেছিলেন, হয় আইন নয় তো অন্য কিছু। সে সব আমার অত মনে নেই। তারই বিরুদ্ধে কোনো বক্তৃতামঞ্চে নানান লোকের বক্তৃতা হচ্ছিল। বক্তাদের মধ্যে একটি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে উঠে 'The Government says' বলে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করে ক্রমে এতই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন যে, বক্তৃতার মাঝে অবিকল হিন্দী সুরেই বলে ওঠেন—'আরে, Whose money? Your father's money?' অতুলদার ঠিক সেই সুরটি অবিকল নকল করে বলার ধরন দেখে আমরা হাসতে আরম্ভ করে আর থামতে পারি না। কত গল্পের পুঁজিই যে ওঁর ছিল।

একবার আমরা অনেকে 'ক্যালকাটা রোড' বলে রাস্তাটি দিয়ে চলেছিলাম। অতুলদাও ছিলেন। এই রাস্তাটি ধরে সোজা গেলে দার্জিলিঙের আগের স্টেশন

'ঘুম'-এ পৌঁছনো যায়। 'ঘুম' দার্জিলিঙের চাইতে আরও বেশ উঁচুতে অবস্থিত। সর্বদাই কুয়াশার মত মেঘে ঢাকা থাকতে দেখা যায়। চলতে চলতে হঠাৎ কানে ভেসে এল মৃদুস্বরে গান। চেয়ে দেখি সামনে পাহাড়ের দিকে উদাস নয়নে তাকিয়ে অতুলদা গুনগুন করে গাইছেন নিজেরই একটি গান—'কে হে তুমি সুন্দর, অতি সুন্দর।' মন যেন তাঁর কোথায় ভেসে গেছে। স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগলাম। আমার মনও ডানা মেলল। কিছুক্ষণ পরে আমার দিকে এক-একবার তাকিয়ে বলছিলেন—'গা না ঝুনু, গা না রে একটা গান।' খানিক দূরে গিয়ে পাকা রাস্তা ছেড়ে দিয়ে পাকদণ্ডী দিয়ে একটু উপরে উঠে সুন্দর একটি জায়গা দেখে সবাই বসলাম। জায়গাটিতে এক-একটি আলগা পাথর এমনভাবে রয়েছে যে, দেখে মনে হচ্ছিল যেন ওইভাবেই রাখা হয়েছে, বুঝি ওইভাবে তৈরি করা হয়েছে বসবার জন্যেই। পাথরগুলি বেশ ছড়ানো ছিল। যে যেটার উপর পারলাম গিয়ে বসে পড়লাম। সকলের মধ্যে একটা স্তব্ধ ভাব যেন জমাট বেঁধে উঠেছে। সেই সময় অতুলদা ধীরে ধীরে গান ধরলেন—'পাগলা, মনটারে তুই বাঁধ্।' প্রাণ ঢেলেই তিনি তন্ময় হয়ে গাইছিলেন। অদ্ভুত একটা পরিবেশের সৃষ্টি হল। এই গানটি রেণুকা দাশগুপ্তের গাওয়া গ্রামোফোন রেকর্ডে যখনই শুনি মনে পড়ে যায় অতুলদার সেদিনের গাওয়া এই গানটির কথা। পরে অতুলদা আমাকে গাইতে বলেন। আমি গাইলাম তাঁর কাছে শেখা তাঁরই গান—'কি আর চাহিব বল, হে মোর প্রিয়।' শুনে অতুলদা কি যে বলবেন ভেবে না পেয়ে থেকে থেকে সমানে কেবল বলে যেতে লাগলেন—'বাঃ, বেশ গেয়েছিস, বেশ গেয়েছিস।' চারিদিকের গগনচুম্বী সব ছন্দের দৃশ্য তার ওপর অতুলদার গাওয়া ওই গান মনকে বেঁধে দিয়েছিল এমন সুন্দর সুরে যে, গান গাইতে গিয়ে দেখি গান আমার আসছে যেন অন্য কোন জগৎ থেকে। সে অভিজ্ঞতা কোনোদিন ভুলবার নয়।

হঠাৎ একদিন শুনলাম রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিং এসেছেন। আছেন 'আসানটুলি' নামক বাড়িতে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথদের অতিথি হয়ে। সঙ্গে এসেছেন রথীবাবু ও প্রতিমাদি। তাঁরা উঠেছেন হোটেলে। দেখা করতে যাবার জন্য মন বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। খুব আনন্দ হচ্ছে কবি এসেছেন শুনে। গেলাম কবির সঙ্গে দেখা করতে। বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে দেখি, সামনে বসবার ঘরে একা বসে গগনেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা হাসি পিয়ানো বাজিয়ে গাইছেন রবীন্দ্রনাথের গান:

'চলি গো চলি গো যাই গো চলে।' ভারি মিষ্টি গাইছিলেন। পরে খবর পেয়ে সকলে এলেন। অতুলদাও গিয়েছিলেন। তাঁকে দেখে কবি খুবই খুশি হলেন। ভারি স্নেহ করতেন অতুলদাকে। হাসির সঙ্গে তখন আমার তেমন আলাপ ছিল না। পরে খুব ভাব হয় ও সে ভাব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। সেদিন কবি বেশির ভাগ তাঁর বিদেশ ভ্রমণের কাহিনীই সবিস্তারে অনেকক্ষণ ধরে বলছিলেন। ১৯১২ সালে যে তিনি বিলেত গিয়েছিলেন, বোধ হচ্ছে আমেরিকায়ও গিয়েছিলেন, সেই সব কথাই হচ্ছিল। সেই আসরে সেদিন গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, অতুলদা, অবনীন্দ্রনাথেব জামাতা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। অতুলদা আগ্রহ প্রকাশ করে জেনে নিচ্ছিলেন কবি নতুন কি কি গান বাঁধলেন, কি লিখলেন ইত্যাদি। এইসব নানা কথা-বার্তা হতে হতে হঠাৎ কবি কি মনে কবে চোখ ফিবিয়ে আমার দিকে একবার তাকিয়ে আমায় একটু দেখলেন, পবে বেশ একটা ভঙ্গিতে অতুলদার দিকে চেয়ে গলাব স্বরটি নামিয়ে, অর্থপূর্ণ চাপা হাসি হেসে, চোখের ইশাবায় একবার আমাকে দেখিয়ে অতুলদাকে রঙ্গ কবে জিজ্ঞেস কবলেন: 'গানে অনুরাগ কি বলে? গাইছে আজকাল?' অতুলদা হেসে বললেন: 'গানে অনুরাগ তো খুবই দেখছি—উৎসাহেব শেষ নেই। এবই মধ্যে আমার কাছে এসে ক-টা গান শিখে নিয়েছে।' অতুলদাব কথা শেষ হতে-না-হতে চোখে মুখে এমন এক ভাবের ছটা ফুটিয়ে রহস্যের সুবে আবও বস ঢেলে বেশ টেনে টেনে কবি বলতে লাগলেন: 'ওহে বোস, বোস, এখনও ত বিয়ে হয়নি।' ওঁর সেই বলাব ভঙ্গিতে ঘবসুদ্ধ লোক সজোবে হেসে উঠলেন। কবিব কাছে আমি পরেও শুনেছি আমায় বলেছেন: 'তোমাদের মেয়েদের হয় বিয়ে নয় গান, দুটোর মাঝামাঝি কিছু নেই।'

এবার স্থির হল 'ঘুম বক্' বলে যে পাহাড়ের চূড়া আছে সেইখানে বনভোজন করতে যাওয়া হবে। সার নীলরতনের মেয়েরাও যাবে আমাদের সঙ্গে। বড় মেয়ে বেবুদি, মেজ মেয়ে আকশিদি, সেজ মেয়ে টুলী, ন'মেয়ে আমার বন্ধু বুলী। ছোট মেয়ে টুনি এই দলে ছিলেন কিনা তা ঠিক মনে করতে পারছি না। প্রতিমাদি, রথীবাবু, অতুলদা, ডাক্তার দ্বিজেন মৈত্র (আমার এক পিসতুতো ভগ্নিপতি) ও আমি। আমরা ছিলাম একদল। ট্রেনে ঘুম পর্যন্ত গিয়ে পায়ে হাঁটা পথ। শুনেছি এখন এসব পথে মোটর ইত্যাদি সবই চলাচল করে। গাড়ি থেকে নেমে আমরা সব হাঁটতে আরম্ভ করলাম। প্রতিমাদির জন্য 'ডাণ্ডীর'

ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সুন্দর চওড়া রাস্তা, মনোরম সব দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা অগ্রসর হতে লাগলাম। বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে সেই পাহাড়ের চূড়ায় পথে উঠতে আরম্ভ করা গেল। চূড়ায় ওঠার পথটি কিন্তু অত প্রশস্ত নয়। সকলেই দেখি জোঁকের ভয়ে অস্থির ও তটস্থ, কার জুতোয় কখন জোঁক ঢোকে। এই রাস্তাটিতে নাকি অসম্ভব জোঁক। যথাস্থানে যখন উপস্থিত হলাম, দেখা গেল দ্বিজেনবাবু হঠাৎ লাফাচ্ছেন। কি ব্যাপার? ভাইদা হেসে বললেন: 'ওহে লাফিয়ে আর কি হবে, ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও; রক্ত খেয়ে আপনিই পড়ে যাবে।' তখন বোঝা গেল ব্যাপারটা। সকলে হেসে উঠলেও প্রত্যেকেরই যথেষ্ট ভয় ও অস্বস্তি প্রকাশ পাচ্ছিল। উপরে গোল মতন জায়গা আছে সেখানে খাবার-দাবার জিনিসপত্র রেখে আমবা ঘুরে ঘুরে চারিদিকের অবর্ণনীয় শোভা উপভোগ করছিলাম। সকলের মনই কানায় কানায় ভরে আছে। মুগ্ধচিত্তে সবাই ঘুরছি, ফিরছি, দেখছি। দেখে দেখে কারোরই যেন আশা আর মিটছে না। খানিক বাদে ফিরে এসে সেই গোল জায়গাটিতে বসে বেবুদিদের নিয়ে-আসা খাবারের ভাণ্ডার খুলে বসা গেল। কতরকম খাবারই যে ওঁরা এনেছিলেন। তার মধ্যে মনে আছে দার্জিলিঙের বিখ্যাত 'Vado'র দোকানের ক্রিম দেওয়া কেক কি উপাদেয়ই লেগেছিল। তারপর চলল গান গাইবার জন্যে অনুরোধ-উপরোধ কত কিছু। অতুলদা গাইলেন—'মিছে তুই ভাবিস মন।' আকশিদি গাইলেন, আমিও গাইলাম। কিন্তু কে যে কি গেয়েছিলাম তা মনে পড়ছে না। তবে মনে আছে অনেক সাধ্য-সাধনার পর রথীবাবু গাইলেন রবীন্দ্রনাথের 'তোমাব কাছে শান্তি চাব না' গানটি। দার্জিলিঙে সেবার রবীন্দ্রনাথ ও অতুলদাকে একসঙ্গে পেয়ে যে আনন্দ করব বলে অনেক আশা করেছিলাম তা আর হল না। আমাকে হঠাৎ নেমে আসতে হল।

দিলীপকুমার রায়ের নিমন্ত্রণে একবার মধুপুরে বেড়াতে যাই। অতুলদাও গিয়েছিলেন। আমরা দিলীপের মেজ মামা খগেন্দ্রনাথ মজুমদার (সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথি ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের দ্বিতীয় পুত্র) ও তাঁর পত্নী মন্দা দেবীর অতিথি হয়ে তাঁদের বাড়িতে ছিলাম। এই পরিবারের সঙ্গে তখন আমার সবে নতুন আলাপ। সংগীতের সূত্রেই হয় এই পরিচয়। তখন কলকাতায় নানা জায়গায় দিলীপকুমার রায়ের গানের জলসা চলেছে পুরোদমে। তাঁর সংগীতের অনেক আসরে আমাকেও সঙ্গে নিতেন গাইবার জন্যে।

বাংলাদেশ তখন দিলীপ রায়ের অতুলনীয় কণ্ঠস্বরে, তাঁর গানের ঢঙে মুগ্ধ, পাগল, কলকাতা শহরবাসী সব মেতে আছে। বাংলা গানে তিনি এনে দিয়েছেন এক নতুন ধারা নতুন প্রেরণা; খুলে দিয়েছেন নতুন একটা দিক। অতুলদা মধুপুরে আসছেন শুনে দিলীপ আমাকে যাবার জন্যে বিশেষ করে লেখেন। গানের লোভ তো আমার যথেষ্টই,—তার উপর অমন সকলের সঙ্গ সাহচর্যের লোভও দেখলাম বড় কম নেই। আগে থেকেই দেওঘর যাওয়া আমার একরকম ঠিক ছিল। দেওঘরে শ্বশুরের বাড়ি রয়েছে, সেইখানে দেওর জা আছেন, তাঁদের কাছেই যাবার কথা। কিছুদিন তাঁদের কাছে থেকে মধুপুর যাব স্থির করলাম। মনে আছে মধুপুর স্টেশনে যখন নামছি তখন চেয়ে দেখি আমার কম্পার্টমেণ্ট থেকে একটু দূরেই অতুলদাও নামছেন ওই ট্রেন থেকেই। হঠাৎ ওইভাবে ওঁকে দেখে এত আনন্দ হল, অবাকও হয়েছিলাম খুব। কেননা ওই গাড়িতে যে অতুলদা আসতে পারেন তা আমার ধারণায়ই আসেনি। দিলীপরা স্টেশনে এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে তাঁদের বাড়ি অভিমুখে রওনা হওয়া গেল। গিয়ে দেখি বাড়িভরা লোক, ওঁদের আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব অনেকেই রয়েছেন। আমি রইলাম মন্দা দেবীদের সকলের সঙ্গে তাদের 'প্রসাদ ভবন' নামক বাড়িতে। অতুলদা রইলেন দিলীপের বড় মামা বিখ্যাত ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাড়িতে—সে বাড়ি তখন খালি। পর পর পাশাপাশি তিনটি বাড়ি মজুমদারদের তিন ভাইয়ের, একটির ভিতর দিয়ে আরেকটিতে আসা-যাওয়া করা যায়। 'প্রসাদ ভবনে'র একতলায়, পিছনদিকের প্রশস্ত বারান্দায় বেশ লম্বা একটি সারি করে সব খেতে বসা হত। সে সময় চলত উপভোগ্য গল্প ও রসিকতা, আর চলত হাসাহাসির পালা। তকুমামা, দিলীপের মেজ মামা, প্রতি কথাতেই সবাইকে হাসাতেন। তার একটি নমুনা দেবার লোভ আমি কিছুতেই সংবরণ করতে পারলাম না। নিজে বেশ গম্ভীর হয়ে বলতেন। সেদিনও দেখি গম্ভীর হয়ে বলছেন—'ফুলশয্যার সেই দারুণ শীতের রাতে লেপটি উনি টেনে নিলেন—সেই যে আমি কাঁপতে শুরু করলাম, আজও কাঁপছি।' হাসি আর থামেই না। অতুলদা তাঁর পুঁজি খুলে বসতেন, বার করতেন রকম রকম হাসির খোরাক, ঘর ভরে যেত হাসির উচ্চরোলে। দিলীপের জ্যাঠতুত ভাই শচীন্দ্রলালও এতে কম যেতেন না। তিনি ছিলেন আরেকজন, যাঁর রসিকতা করার ক্ষমতাও ছিল যেমন, ঢঙও ছিল তেমনই অদ্ভুত। চারবার খাবার সময়ই এই ব্যাপার চলত। তাছাড়া অন্যান্য সময়েও সুবিধা বা সুযোগ পেলে কেউই আর তা বৃথায় যেতে

দিতেন না। সেবার মধুপুরে যা হাসিটা হাসতাম, মনে হয় আর কখনও এমন হাসি হাসিনি। তবে তারও উপর পাল্লা দিয়ে চলত আমাদের গান। কি গানই ক'দিন গাওয়া হয়েছিল। অতুলদা যে-বাড়িতে উঠেছিলেন সেখানেই হত গান। তিনি শেখাতেন তাঁর নিজের গান আর আমরা কখনও সব গোল হয়ে বসে সকলে একসঙ্গে শিখতাম। কখনও বা শুধু দিলীপ আর আমি। সকালে চা খেয়ে বসতাম, শুধু হত গান। চলত যত বেলা অবধি চলে। বিকেলে সব একজোট হয়ে একসঙ্গে বেড়াতে যেতাম। সে সময়ও হই-হুল্লোড় হাসি গল্প কিছু কম হত না। ফিরে এসে সন্ধ্যাবেলা আবার আরম্ভ করা যেত গান, শেষ হত রাত্রির খাবারের ঠিক আগে। প্রাণ ভরে প্রাণ খুলে মনের আনন্দে আমরা গান করতাম। কি অফুরন্ত আনন্দেই যে কাটত সে-সময়টি! অতুলদাও হয়ে থাকতেন তৃপ্তিতে আনন্দে ভরপুর। গান থামাবার দরকার না হলে হয়ত আমরা আরও চালিয়ে যেতাম। অতুলদা কিংবা আমরা কেউই যে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়েছি এমন বোধ হত না। সে সময় অতুলদার কাছে আমরা এই গানগুলি সব শিখেছিলাম—(১) যদি তোর হৃদ্‌যমুনা, (২) থাকিসনে বসে তোরা (৩) বিফল সুখ আশে, (৪) ওগো দুঃখসুখের সাথী, (৫) ঝরিছে ঝরঝর, (৬) কেগো তুমি বিরহিণী (৭) শ্রাবণ ঝুলাতে (৮) চাঁদিনী রাতে কেগো আসিলে, (৯) ওগো সাথী মম সাথী (১০) মধুকালে এল হোলি, (১১) আমার আঙিনায় আজি পাখি, (১২) ঝমক ঝমক রুমঝুম (১৩) আমার পরান কোথা যায় (১৪) জানি জানি তোমারে গো রঙ্গরানী (১৫) এ বনেতে বনমালী, (১৬) কতকাল রবে নিজ যশ-বিভব অন্বেষণে, আর বোধ হয় 'ভারতভানু কোথা লুকালে' গানটিও শিখেছিলাম ওই সময়ই। এই সবগুলির মধ্যে দু-একটি গান হয়ত ভুল করেও লিখে থাকতে পারি। দু'একটি হয়ত বা ফেলেও দিয়ে থাকতে পারি, অসম্ভব নয় কিছু। মধুপুরে ছিলাম ছয় কি সাত দিন, ফিরে এসেছিলাম গানের ঝুলি বোঝাই করে।

অতুলদার কাছে গেলেই গান, শুধু গান আর গান। সব সময় সুরে সুরে ভেসে বেড়াতাম। সুর চিরদিনই আমার প্রিয়, আমায় আকর্ষণ করেছে, আজও করে সমভাবেই। যখন যেখানে যেভাবে থেকেছি সুর শুনলেই সব ভুলে মন ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার উপর। অতি শিশুকালে খেলতে খেলতে সুর যদি শুনেছি কোথাও অমনি কান চলে গেছে সেইদিকে, খেলা ভুলে গেছি। সুর আমার গৃহকাজে করেছে আনমনা, সংসারের মন কেড়ে নিয়েছে। সুর আমার

ভগবানের প্রসাদ, আমার জীবনকে করেছে ভগবদ্‌মুখী। সুরে পেয়েছি আলো, পেয়েছি ভগবানের নিবিড় স্পর্শ, অনুভব করেছি তাঁকে কতভাবে। সুর নিযে পৃথিবীর জীবন সুরু কবেছিলাম, আজও কণ্ঠে সুব নিয়ে চলেছি বিদায়েব পথে। রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ—যাবা সুরেব মানুষ আমার সুরের জীবন তাঁদের সুরে অনেকখানি আশ্রয় পেয়েছে, তাঁদের আমি যেটুকু চিনেছি, জেনেছি তা তাঁদের গানেব ভিতব দিয়েই বেশি। অতুলদার কথা লিখতে গেলে তাই গানেব কথাই আগে মনে আসে, আব সে গানের মধ্যে আমার গানও এসে পড়েই। অতুলদার জীবনী লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমাব জীবনে তাঁর সংস্পর্শের কথা, তাঁরই সংস্পর্শভবা আমাদের সেইসব গীতমুখর দিনগুলির কথাই আমি বলতে চেয়েছি। কিভাবে তাঁকে দেখেছি. পেয়েছি তাঁব স্পর্শ, কিভাবে তিনি সাড়া দিয়েছেন, আমি লিখবাব প্রয়াস পেয়েছি বেশিব ভাগ সেইসব কথাই।

নিখিল-ভারত সংগীত-সম্মিলনেব সময় একবার আমি অতুলদার কাছে লখনৌতে ছিলাম। তাব বাড়িভরা লোক সে সময়। অতুলদাব ছোট বোন চুটকিদি (বাঙ্গালোরেব শেষাদ্রি আয়েঙ্গারের পত্নী) তাঁর ছেলেমেয়েদেব নিয়ে ছিলেন, হেমিদি (অতুলদাব স্ত্রী) ছিলেন তাঁদেব পুত্র দিলীপ সহ, তাব মাঝে আমি গিয়ে উপস্থিত হলাম আমাব শিশুপুত্র-সহ। সেই প্রথম সংগীত-সম্মিলনে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়। সবক্ষণ সে যে কী অসহ্য পুলক। আগ্রহেব আতিশয্যে খাবার পাট কোনোবকমে চুকিয়ে, মনে একটা অসম্ভব তাড়ার ভাব নিয়ে চলে যেতাম অতুলদাব সঙ্গে সেই সংগীত-আসরে। সাবা দিনরাত্রি যতক্ষণ গানবাজনা চলত—কিভাবে তন্ময় হয়ে বসে বসে যে শুনতাম, মনে হত যেন অন্য রাজ্যে প্রবেশ কবেছি। দিলীপ সে সময় এসেছিলেন, তাঁর বিশেব বন্ধু ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে ছিলেন। সংগীত-পাগল আমরা সব একদল জুটেছিলাম। সবসময়ই মেতে রয়েছি গানবাজনা নিয়ে। এক-একটি পব সারা হলেই উন্মুখ হয়ে উঠতাম আর-একটি পবের শুরুর জন্যে। অতুলদা, ধূর্জটিদা, দিলীপ রায় এঁদের মত উচ্চাঙ্গের সংগীত-বোদ্ধাদের সঙ্গে একত্রে বসে সব বড় গুণীদের সংগীত শোনার গভীর আনন্দ পেয়েছিলাম। সংগীত-সমঝদারদের সঙ্গে বসে সংগীত যে আরও বেশি উপভোগ করা যায়, শেখা যায় তাঁদের সাহচর্যের গুণে। পণ্ডিত ভাতখণ্ডেকে দেখতাম, থাকতেন মণ্ডপের মাঝে বসে। সুন্দর ধ্যানী মূর্তি, বসতেন সংগীত-সভা আলো করে। অতুলদার বাড়িতে একদিন

তিনি এসেছিলেন। অতুলদা তাঁকে আমার গান না শুনিয়ে ছাড়েননি। গান শোনানোর সে আগ্রহ অতুলদার দেখার মত। কনফারেন্স শেষ হয়ে যাবার পরে ওখানকার কোনো এক বিরাট হলে একদিন গানের এক আসর হয়। সেই আসরে মথুরার বিখ্যাত ওস্তাদ চন্দন চৌবে, ভাতখণ্ডের প্রিয় শিষ্য শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকরের মত অত বড় বড় গায়কেরা গাইবার জন্য এসেছেন; সেই আসরে আমার মত একজনের—যার ভগবদ্দত্ত ক্ষমতা ছাড়া গানে সেরকম শিক্ষাদীক্ষা কিছুই নেই তার সেই আসরে বসে গাওয়া যে কত বড় ধৃষ্টতা, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু দেখলাম অতুলদার তার জন্যে কোনও তাপ-উত্তাপ নেই, বরং মহা উৎসাহে এবং বেশ গৌরবের সঙ্গেই সকলের কাছে আমাকে তাঁর বোন বলে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। আমার একটু কি-রকম কি-রকম বোধ হলেও ভিতরে ভিতরে খুশি হয়ে উঠেছিলাম অতুলদার ভগিনী পরিচয়ের সম্মান লাভে এবং আমাকে যে এতটা প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে তার জন্যে। অহংকার যাবে কোথায়! এই অনুষ্ঠানে দিলীপের শেখানো একটি হিন্দী গান গাইবার কথা। দিলীপ আরও একটি গান, মীরাবাঈ-এর ভজন, তালিম দিয়ে তৈরি করে রাখলেন; দরকার হলে যেন গাইতে পারি। মনে আছে সে-দুটি গান তো গাইলামই, শ্রোতাদের পুনঃপুন অনুরোধে আরও দুটি গান আমাকে গাইতে হল।

একবার দিলীপ মথুরার চন্দন চৌবের কাছ থেকে কাফি-সিন্ধু রাগের একটি হোলির গান শিখে এসে আমায় শেখান। গানটি হচ্ছে—'মো'হিয়া সামালিয়াকি দেখ্।' অতুলদার একান্ত ইচ্ছায় আমাকে দিয়ে সেই গান সেদিন চন্দন চৌবের সামনে গাওয়ানো হল। দিলীপের মুখও সেদিন কম উজ্জ্বল দেখিনি। তারপর দেখি সেই আসরে এসে গাইতে বসলেন চন্দন চৌবেজী। আমরা একেবারে ওঁর পাশেই, মঞ্চের ঠিক নীচেই বসেছিলাম। কী অপূর্ব সব মীড়ের কাজ করতে লাগলেন। শুনেছিলাম উনি মীড়ের কাজে বিখ্যাত। একটি একটি অদ্ভুত মীড়ের কাজ করছেন আর পাশে ফিরে ফিরে কেবল আমার দিকে দেখছেন। অতুলদা খুশির সুরে বললেন, 'দেখলি তো তুই যে বড় গাইতে আপত্তি করছিলি? তোর গান শুনে বুঝতে পেরেছেন তুই একজন সমঝদার।' সেবার লখনৌ সংগীত সম্মিলনে মোরাদ খাঁর বীণায় (যতদূর মনে পড়ছে নাম মোরাদ খাঁ-ই শুনেছিলাম) যে দরবারী কানাড়া শুনেছিলাম, আজও তাঁর স্মৃতি আমার মনকে নাড়া দেয়। ওস্তাদ এনায়েত খাঁর সেতার, বীরু মিশ্রের তবলা, আলাউদ্দীনের 'মাইহার ব্যাণ্ড', তাঁর সরোদ, ফিদা হোসেন, হাফেজ আলি—এঁদের সরোদ

সব আমাদের কোন রসলোকে নিয়ে গিয়েছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছে সে বোধ কারোরই নেই। শুধু চোখে চোখে খেলে যাচ্ছে সকলের মন—খুশির হিল্লোল। হাফেজ আলী খাঁর সরোদ বাজনা—সে সত্যি এক অতি অদ্ভুত অপূর্ব ব্যাপার, তার তুলনা নেই। প্রতিটি সুরের পর্দা থেকে নিঙড়ে নিঙড়ে কী রসই যে বার করেছেন আর সে রসও কি রস! যা শুনেছিলাম, সে জিনিসই অন্য জিনিস, ওরকম আর শুনিনি। তাঁর সঙ্গে কলকাতায় আরেকবার দেখা হয় অতুলদার উপস্থিতিতে আমাদেরই এক গানের আসরে। অতুলদার জন্যই সে দুর্লভ সুযোগ আবার পেলাম। সেদিন আবার হাফেজ আলীর অমন বাজনা প্রাণ ভরে শুনেছিলাম। তাঁকেও অতুলদা আমাদের গান শুনিয়েছিলেন। আলাউদ্দীন খাঁব বাজনা দ্বিতীয়বার শুনতে পাই আমাদেরই এই পণ্ডিচেরীর আশ্রমে। ভক্ত মানুষ ওস্তাদ আলাউদ্দীন এসেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীমাকে দর্শন করতে, বাজনা শোনাতে। শ্রীমা তাঁর বাজনা শুনে খুবই ভালো বলেছিলেন। সংগীত-সম্মিলন হয়ে যাবার পর অতুলদা ধরে বসলেন ক'দিন আমাদের গানের আসর হোক। আমি মনে মনে ভাবলাম, এমন সব গানবাজনার পরে আমাদের গান কি আর জমবে? ধূর্জটিদা ও আরও অনেকেই অতুলদার প্রস্তাবে সায় দিলেন বিশেষ জোরের সঙ্গে। অতুলদা তাঁর বিশেষ বন্ধু বিচারপতি শ্রীমিশ্রের বাড়ি আমাদেব নিয়ে গেলেন। দিলীপের গান হল, আমিও গেয়েছিলাম। তারপর শুরু হল বাড়ি বাড়ি আমাদের গানের আসর। দিলীপ ও আমার গানই প্রধানত। অতুলদা, শিল্পী অসিত হালদার, অধ্যাপক বিনয় দাশ গুপ্ত, রাধাকুমুদ ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিদের কারো না কারো বাড়িতে প্রতিদিনই হত গান। প্রতিদিনই কী যে জমত। গান যত জমে উঠতে লাগল, অতুলদার উৎসাহও তত বেড়ে যেতে লাগল আর আমার ফিরে যাওয়া ততই পিছিয়ে যেতে লাগল। অতুলদা এসে বসতেন পাশে, তাঁর উদ্ভাসিত মুখচোখের নানা ভাবে প্রকাশ পেত তাঁর অন্তরের দোলা, তাঁর তৃপ্তি, আনন্দ। অতুলদা, ধূর্জটিদা এঁদের মত শ্রোতা পেয়ে আমাদেরও গলা খুলে গিয়েছিল, আমরাও গানের মাঝে নিজেদের ঢেলে দিয়েছিলাম উজাড় করে। অতুলদা ছিলেন আমাদের প্রধান আকর্ষণ, আমাদের আনন্দের মধ্যমণি। তাঁর জন্যেই গানের সভা এমন জমে উঠত। তার উপর দিলীপ ছিলেন, আসর আরও জমজমাট হয়ে উঠত।

লখনৌ-প্রবাসী আইনজীবী অতুলপ্রসাদ সেন ছিলেন উত্তরপ্রদেশ অঞ্চলে

সুপরিচিত। শীর্ষস্থানীয় ব্যবহারজীবীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তাঁর স্বভাবের গুণে, ব্যবহারে বাঙালি-অবাঙালি সকলেই তাঁকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা-ভক্তি করত, সম্মান করত, নিজেদের প্রিয়-পরিজনের মতই মনে করত। প্রবাসী বাঙালিদের শুধু যে তিনি একটা আশ্রয়স্বরূপ বা অবলম্বন ছিলেন তাই নয়, সর্ববিষয়েই ছিলেন তাদের একজন মস্তবড় পৃষ্ঠপোষক। তাদের মধ্যে বাংলা ভাষার চর্চা যাতে থাকে তার জন্য তিনি কম ভাবেননি, কম করেননি। তাঁরই প্রয়াসে, সহায়তায় এবং সম্পাদনায় 'উত্তরা' মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। 'প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন' তাঁরই উদ্ভাবিত। তিনি প্রথম তার চালনা করেন। অতুলপ্রসাদের গৃহ ছিল বাঙালিদের, সাহিত্যিকদের সকলের আনন্দনিকেতন, মিলনকেন্দ্র।

অতুলদা ছিলেন উদারচেতা, আত্মভোলা, দিলদরিয়া মানুষ। হৃদয়টি ছিল যেন দরদ দিয়ে গড়া। তাঁর কাছে গেলে বোঝা যেত মানুষটি কত নরম, কত নত নম্র আব মধুর প্রকৃতির ছিলেন। এই স্নিগ্ধ নরম স্বভাবের জন্যে তাঁর সান্নিধ্য, সাহায্য, সংস্রব সবই আমাদের এত মধুর মনে হত। তাই ভাবি তাঁর গানে আর স্বভাবে কি আশ্চর্য মিলই ছিল। কতভাবেই তাঁকে দেখেছি, তাঁর নিকট সংস্পর্শে এসেছি কিন্তু 'আমি আমি' এই ভাবের কোনো প্রকাশ তাঁর মধ্যে কখনও দেখিনি। সেইজন্য কোনো কিছু নিয়ে অহংকার করতেও কোনো দিন দেখা যায়নি। দেবার দিকে যেমন সহজ প্রবণতা ছিল, লাভ-লোকসানের দিকে তেমন হিসেবজ্ঞান মোটেই ছিল না। তাঁর দানে পুষ্ট হত অনেকেই। আমিও ছিলাম তাদের মধ্যে একজন। শুধু অসময়েই নয়, সুসময়েও বহু পেয়েছি। আমার জীবনের দুঃখ-বিপদের দিনে, সংগ্রাম-সংকটের সময় রবীন্দ্র-নাথের মত তাঁকেও পেয়েছিলাম পাশে, পেয়েছিলাম তাঁর গভীর স্নেহভরা সহানুভূতি, শুভকামনার নিবিড় স্পর্শ। তিনিও সযতনে দিয়েছিলেন আমার চোখের জল মুছে, বিপন্ন জীবনের হয়েছিলেন সহায়। মানুষের জন্য কিছু করাই ছিল অতুলদার স্বভাব। তাঁর উন্মুক্ত দুয়ার থেকে শূন্য হাতে কোনো প্রার্থীকেই কখনও ফিরতে হয়নি। যেভাবেই যে এসেছে, সকলকেই কাছে টেনে নিতে বাড়িয়ে দিয়েছেন হাত

> যে আসে মনেব দুখে যে আসে ফুল্ল মুখে—
> টেনে নে সবায় বুকে,
> তোর থাক না চোখে জল বে ভোলা

এই লাইনগুলির মাঝে মনে হয় যেন অতুলদাকেই দেখেছি। তাঁর রচিত অনেক গানে দেখা যায় তাঁর জীবনকেও।

যেসব গুণ থাকলে সচরাচর মানুষ 'অসাধারণ'-এর পর্যায়ে পড়ে অতুলদা সেসব গুণেরই অধিকারী ছিলেন। কিন্তু কারও সম্বন্ধে শুধু ওইটুকু বললেই সব বলা হয় না। পরিচয় অন্য জিনিস, নির্ভর করে অনেক কিছুর উপর। অসাধারণ বা গুণীজনের প্রত্যেকেরই চরিত্রের একটা বিশেষ প্রভাব থাকে। কারও প্রভাব মানুষকে কাছে আনে, আপন করে নেয় সহজেই। কারও প্রভাব দূরে রাখে—দূর থেকেই তাঁকে করে সম্ভ্রম, করে শ্রদ্ধা, ভালোবাসে, ভক্তি করে। অতুলদার সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছেন, তাঁদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি অতুলদা তাঁদেরই একজন, তাঁদের ঘরেরই লোক, যেন কত কাছের মানুষ। তাঁর সংস্পর্শের প্রভাবে দূরত্ব ঘুচে গেছে, দূরের মানুষের কাছের মানুষ হতে সময় লাগেনি। তাই অতুলদা ছিলেন এবং হতে পেরেছিলেন সকলেরই আপন। সকলকে নিয়ে জড়িয়ে থাকতে ভালোবাসতেন নিজেকে সকলের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে

সবারে বাস রে ভালো,
　　নইলে মনের কালো ঘুচবে না রে।
আছে তোর যাহা ভালো
　　ফুলের মত দে সবারে।
করি তুই আপন আপন
হারালি যা ছিল আপন;
এবার তোর ভরা আপন
　　বিলিয়ে দে তুই যারে তারে।
সবারে কর রে আপন
হবে তুই সবার আপন

অতুলদারই স্বভাবের প্রতিচ্ছবি যেন।

অতুলদার কথা লিখছি আর মনে পড়ছে তাঁর সেই ধীর স্থির শান্ত উদাসী চেহারাটি। গভীর চোখ-দুটি দেখলে মনে হত না-বলা কোন বাণীর নীরব ভাষা। দুঃখ-আঘাত তিনি অনেকই পেয়েছেন, তাতে ভেঙে পড়েননি। একদিকে তিনি অত স্নেহপ্রবণ ছিলেন, কিন্তু আরেকদিকে ছিলেন অন্তরে

বৈরাগী, ছিলেন ভক্ত। তাই জীবনের সকল শূন্যতাকে পূর্ণতার পথে পরিচালিত করতে চেয়েছেন ভগবানের চরণে শরণ নিয়ে, উৎসর্গ করে সব কিছু—

কিনব যাহা ভবের হাটে
আনব তোমার চরণ-ঘাটে ;
তোমার কাছে হে মহাজন,
সবই বাঁধা রবে—কবে ?

তাঁর গানের এই অপূর্ব লাইনগুলি থেকে বোঝা যায় ভগবান তাঁর নির্ভর, তাঁর বিশ্বাস আর ভক্তিতে বোঝা যায় তিনি কোন পথ ধরেছিলেন ; কোন পথের পথিক—

লিব না রেখো সুখে, চাও যদি রেখো দুখে,
তুমি যাহা ভালো বোঝ তাই করিয়ো,
শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।
যে পথে চালাবে নিজে, চলিব, চাব না পিছে ;
আমার ভাবনা প্রিয়, তুমি ভাবিয়ো
শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।

কী সুন্দর আত্মসমর্পণের সুর! এ-পথে এসে আরও বুঝতে পারি এর মূল্য।

স্মৃতিকথা

শ্রীঅমল হোম

অতুলপ্রসাদকে ঠিক কবে প্রথম দেখেছিলাম মনে নেই, কিন্তু তাঁকে আমি আমার বাল্যকালেই দেখে থাকব। যখন স্কুলে পড়ি তখন আমি অতুলপ্রসাদের কোনো বিশেষ আত্মীয়ের বাড়িতে একটি পারিবাবিক উৎসবে তাঁর গান প্রথম শুনেছিলাম। এ-ঘটনাটি আমার স্পষ্ট মনে আছে। তারপরে যখন কলেজে পড়ি, কলকাতায় এখানে-ওখানে তাঁকে কয়েকবার দেখেছি, লখনৌয়ে তিনি বড় ব্যারিস্টার একথা জেনেছি, তাঁর গান আরো শুনেছি ও গেয়েছিও বন্ধুমণ্ডলীর সঙ্গে—'কাঙাল বলিয়া করিও না হেলা, আমি পথের ভিখারী নহি গো' কিংবা 'তুমি মধুর অঙ্গে নাচ গো রঙ্গে, নূপুরভঙ্গে হৃদয়ে'। তখন আমাদের যুবকমহলে তাঁর এইসব গানের চলতি ছিল।

১৯১৪ সালে তখনকার ক্যানিং কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বল মহাশয়ের বিবাহে আমি লখনৌ যাই। সেখানেই আমার অতুলপ্রসাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। একদিন বিকেলবেলা উপেনবাবু বললেন—'চল, তোমায় মিস্টার এ. পি. সেনের কাছে নিয়ে যাই।' আমার সহর্ষ সম্মতি জ্ঞাপনের অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা তার ব্যাঙ্কস্ রোডের বাড়িতে পৌছলাম।

পাঁচ রাস্তার মোড়ের উপর প্রকাণ্ড 'হাতা'ওয়ালা বাড়ি। শৌখিন ফুলবাগান পার হয়ে বারান্দায় উঠতেই 'সেন-সাহেব' নিজে বেরিয়ে এলেন। উপেনবাবুর কাছে আমার পিতৃ-পরিচয় শুনেই পরম স্নেহে ও সমাদরে আমাকে গ্রহণ করলেন। সবেমাত্র তিনি কোর্ট থেকে ফিরেছেন, পোশাক ছাড়েননি। আমাদের সোজা 'খানা-কামরা'য় নিয়ে গেলেন। তখন সেখানে বৈকালিক চা-পান চলছিল। টেবিলে আরও কয়েকজন বসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। তাঁদের মধ্যে দু'জন মুসলমান ভদ্রলোককে এখনও আমার

বেশ মনে আছে। তাঁদের একজন মির্জা সামিউল্লা বেগ, পরে তিনি হায়দ্রাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন। অন্য ভদ্রলোকটি অধ্যাপক আবদার রহিম। ইনি কলকাতার পলিটিক্যাল মহলে বিশেষ পরিচিত। তখন মহম্মদ আলি সাহেবের অত্যুগ্র 'প্যান ইসলামিজম্' বরদাস্ত না করতে পেরে রহিম সাহেব 'কমরেড্' কাগজের সাব্-এডিটরি কাজে ইস্তফা দিয়ে দিল্লি ছেড়ে লখনৌ এসেছেন শিয়া-স্কুলের হেডমাস্টারি নিয়ে। অল্পক্ষণ পবে সামিউল্লা সাহেব ও আরও দু'একজন যাঁরা ছিলেন বিদায় নিলেন; রইলাম শুধু বল মহাশয়, রহিম সাহেব আর আমি। রহিম সাহেব বাঙালি, মৌলবী আবদুল করিমের ছেলে। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই ভাগ্যদোষে আলিগড়ের আওতায় মানুষ হয়ে বাংলা 'জবান' 'টুটি-ফুটি' বলতে পারেন মাত্র। তিনি আমাব সঙ্গে বাংলায় কথাবার্তা বলার বৃথা চেষ্টা করে অব.শষে ইংরেজি ধরলেন। কিন্তু একটু পরেই আমার অনুরোধে অতুলপ্রসাদ যখন গান শুরু করলেন তখন তাঁর সঙ্গে রহিম সাহেবকেও যোগ দিতে দেখে বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। গান জমে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে রহিম সাহেবের উৎসাহ বেড়ে চলল। অতুলবাবু থামলেন, রহিম সাহেবের তখনও চলছে—'বিশ্বসাথে যোগে যেথা বেহারো'। কথায়-বার্তায় বুঝতে দেরি হল না যে অতুলপ্রসাদ বহিম সাহেবকে রবীন্দ্রনাথের সংগীতে দীক্ষা দিচ্ছেন এবং অতুলপ্রসাদের প্রভাবে রহিম সাহেবও ভুলে যাওয়া মাতৃভাযা রবীন্দ্র-সাহিত্যের সাহায্যে পুনরায়ত্ত কববাব চেষ্টায় আছেন। যাহোক, সে-রাত্রে আহারাদি সেখানেই হল। সেন মহাশয়ের সরল অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ ও তাঁর ভক্ত হয়ে বাড়ি ফিরলাম।

তারপর একদিন তিনি আমায় নিয়ে বেড়াতে বের হলেন। তখন তাঁর ছিল একটা 'ভিক্টোরিয়া' ফিটন আর একটা সাদা বঙের বনেদী ওয়েলার ঘোড়া। সেদিন তিনি খাটি লখনৌয়ের পোশাক—সাদা মসলিনের শেরওয়ানী 'চুড়িদার পায়জামা', 'চিকণ' কাজের বাঁকা টুপি প'রে লালবাগে বল মহাশয়ের বাড়ি থেকে আমায় তুলে নিয়ে গোমতীর দিকে গেলেন। গ্রীষ্মের শীর্ণকায়া গোমতীর ধারে আমরা যেখানে বসেছিলাম তারই অনতিদূরে 'বাট্‌লারগঞ্জ' তখন নতুন গড়ে উঠছে। সেদিন সন্ধ্যায় সেখানে অতুলপ্রসাদের সংগীত ও তাঁর দরদী কবি-প্রাণের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটল। বিশেষ করে ফুটে উঠল তাঁর বেদনাক্ষুব্ধ প্রাণের সকরুণ ছবি—তাঁর যে-পরিচয় অটল অচল

গাম্ভীর্যের আবরণে ঢাকা পড়ে যেত। একটার পর একটা স্বরচিত সংগীতের মধ্যে দিয়ে তাঁর প্রাণস্পর্শী বেদনার ফল্গুধারা আমার সমস্ত মন সিক্ত করে দিল। তারপর বহুদিন, বহুবার, সজনে ও নির্জনে অতুলপ্রসাদের গান শুনেছি কিন্তু সেদিনকার গানের রেশ এখনো যেন মনে বাজে—

মনোদুখ চাপি মনে হেসে নে সবার সনে,
যখন ব্যথার ব্যথীর পাবি দেখা
জানাস প্রাণের বেদন।

কলকাতায় ফিরে এসে বন্ধুমহলে অতুলপ্রসাদের গানের ও অতুলপ্রসাদ মানুষটির কথা অনেক গল্প করলাম। তাঁর কোনো গানের বই তখনও বের হয়নি। আমি কয়েকটি গান তাঁর কাছ থেকে লিখে নিয়ে এসেছিলাম। তখনকার সুকিয়া স্ট্রিটের 'ভারতী' অপিসে প্রতিদিন আমাদের বৈঠক বসত। মণিলাল আর সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন সে বন্ধুসভার মধ্যমণি, আর ছিলেন চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই। আরো অনেকে আসতেন। এইখানে একটা বেসুরো হারমোনিয়ামের সঙ্গে আমরা ততোধিক বেসুরো গলা মিলিয়ে গাইতাম—

বঁধুয়া, নিদ নাহি আঁখিপাতে
আমিও একাকী, তুমিও একাকী,
আজি এ বাদল রাতে।

সত্যেন্দ্রনাথ যোগ দিতেন তার সঙ্গে। বর্ষার সন্ধ্যাগুলি মূর্ত হয়ে উঠত গানের কলিতে—

গগনে বাদল, নয়নে বাদল,
জীবনে বাদল ছাইয়া;
এসো হে আমার বাদলের বঁধু
চাতকিনী আছে চাহিয়া।

অতুলপ্রসাদের গানের ভক্ত হয়ে উঠলেন সত্যেন্দ্রনাথ। তাঁরই তাগিদে আমি অতুলপ্রসাদকে লিখলাম—'আপনার নতুন গান যা হচ্ছে আমাকে পাঠিয়ে দিন'। চিঠি লেখবামাত্রই তাঁর জবাব পেলাম—স্নেহপূর্ণ পত্র। তাঁর গান সত্যেন্দ্রনাথের ভাল লাগাতে পরম আনন্দ ও গৌরব বোধ করেছেন, কিন্তু কোন গানই পাঠাননি। লিখছেন—"সুর-ছাড়া আমার গানগুলি বড়ই ছন্দহীন,

ছন্দের রাজার কাছে তা কি করিয়া পাঠাইব ? এবার যখন কলিকাতায় আসিব তখন একদিন সত্যেন্দ্রবাবুকে ও আপনার (তখনো অতুলপ্রসাদ আমাকে 'আপনি' বলা বা লেখা ছাড়েন নি) বন্ধুদের গান গাহিয়া শুনাইব ; আমাকে ক্ষমা করিবেন ।"

কিন্তু অতুলপ্রসাদের নতুন গান শোনবার ও আমার সাধ্যমত শেখবার সুযোগ ঘটে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে। আমার পরম আত্মীয় ও বন্ধু পরলোকগত সুকুমার রায়ের পত্নী, অতুলপ্রসাদের মাসতুতো বোন শ্রীমতী সুপ্রভা রায়ের কাছে একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করলাম একখানি সুরম্য মরক্কো চামড়া-বাঁধানো ছোট খাতা—আগাগোড়া অতুলবাবুর স্বহস্তে লেখা স্বরচিত সংগীতে ঠাসা। সুপ্রভা দেবী তাঁর স্বাভাবিক স্বর-মাধুর্যে ও সিদ্ধ সুর-তাল-লয়ে গানগুলি পরম রমণীয় করে তুলতেন ; তাঁরই কাছে গুটি কয়েক নতুন গান শেখা গেল। তারপর যখন সেগুলি সত্যেন্দ্রনাথ সমীপে পৌঁছে দিলাম তখন তিনি বড়ই আনন্দ প্রকাশ করলেন।

কিছুদিন পরে অতুলপ্রসাদের চিঠি পেলাম কলকাতায় আসছেন। তাঁর মেসোমশাই শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য মহাশয়ের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা হল। সকালবেলা প্রাণকৃষ্ণবাবুর কন্যাকে গান শোনাচ্ছেন, শেখাচ্ছেন। সে মন্দ্রমধুর কণ্ঠস্বর হ্যারিসন রোডের ট্রামের ও মোটরের ঘর্ঘরধ্বনি ছাপিয়ে তার সুর-লহরীতে মুগ্ধ করে দিল। অনেক বেলায় বাড়ি ফিরে এলাম। কথা হল, পরদিন সন্ধ্যায় তিনি 'ভারতী' অপিসের বৈঠকে আসবেন—সত্যেন্দ্রনাথের থাকা চাই-ই ; তাঁর সঙ্গে পরিচয় লাভের জন্য অতুলপ্রসাদ উৎসুক। দুই কবির পরস্পরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হল। দুজনেই স্বল্পভাষী, মধুর স্বভাব, অমায়িক। সত্যেন্দ্রনাথ আবার বিশেষ লাজুক প্রকৃতির। তাঁর কবিতা সম্বন্ধে অতুলপ্রসাদের প্রশংসাবাণীতে তাঁর সেদিনকার কাতর ভাব আমার স্পষ্ট মনে আছে। অক্লান্তকণ্ঠ অতুলপ্রসাদ গানের পর গান শোনালেন ; সত্যেন্দ্রনাথ তৃপ্ত ও পুলকিত হলেন।

এরপর অতুলবাবুর সঙ্গে চিঠিপত্র চলত মাঝে মাঝে। তিনি কলকাতার সাহিত্যিক মহলের খোঁজখবর নিতেন আমার কাছ থেকে। আর তাঁর কাছ থেকে আমি পেতাম—লখনৌয়ে সমাজসেবার কাজে সেখানকার রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মীরা কিরকম মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছেন ; 'Gokhale Brotherhood' নাম

দিয়ে অধ্যাপক বল মহাশয় ও তিনি যে একটি প্রতিষ্ঠান গড়েছেন তার কাজকর্ম কেমন চলছে ; ছাত্রদের মধ্যে সে কাজে কিরকম উৎসাহ দেখা যাচ্ছে ইত্যাদি সব খবর। আমি তখন বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর সহকারী সম্পাদক। এসব চিঠিতে কিন্তু নিজের কাজের কথা—কতভাবে অর্থ ও সামর্থ্য দিয়ে তিনি এইসব প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করছেন, তা কোনো কিছুই ঘুণাক্ষরেও জানতে দিতেন না। তিনি বল মহাশয়ের কাজের কথাই বিশেষ করে লিখতেন, সমস্ত প্রশংসা তাঁকেই দিতেন।

১৯১৫ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে অতুলপ্রসাদের এক পরম স্নেহাস্পদ আত্মীয়ার বিবাহসভায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে তাঁর সঙ্গে হঠাৎ দেখা। দেখে বিস্মিত হলাম তাঁর পরনে ইংরেজি পোশাক, গলায় মাফ্‌লার জড়ানো। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করবার আগেই জানালেন—সেই রাত্রেই বোম্বাই যাচ্ছেন কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য এবং বিবাহসভা থেকে সোজা যাবেন হাওড়া স্টেশনে। বললেন—'চল (ততদিনে 'তুমি' ধরেছেন) আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দেবে।' তাড়াতাড়ি সেবে নেবার জন্য আমরা পংক্তিতে না বসে আলাদা খেয়ে নিলাম। বর-কন্যাকে সস্নেহে সম্ভাষণ জানিয়ে অতুলপ্রসাদ আমাকে নিয়ে মোটরে উঠলেন। পথে যেতে যেতে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় যে ভারতবর্ষের দাবি ভাল করেই জানাবেন সেকথা বারবার বললেন এবং অল্পদিন আগেই গোপালকৃষ্ণ গোখেলের মৃত্যুতে যে দেশের কি ক্ষতি হয়েছে একথা জানালেন। আমি তখন নতুন একসট্রিমিস্ট, বয়সও কম তাই গোঁড়ামির এবং মডারেটদের প্রতি অবজ্ঞার অন্ত ছিল না। ধৃষ্টের মত তাঁর সঙ্গে বিষম তর্ক জুড়ে দিলাম। বেশ মনে আছে তিনি একটুও অসহিষ্ণু হননি। কেবল পুনাতে প্রথম প্লেগ মহামারীর সময়ে জঙ্গী গোরাদের অত্যাচার সম্বন্ধে গোখেল বিলেতে অভিযোগ করে পরে দেশে ফিরে এসে সে অভিযোগ প্রত্যাহার ও বোম্বাইর লাট স্যাণ্ডহার্স্টের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা সম্বন্ধে আমি একটু কটু মন্তব্য করাতে বললেন—'He did no more than what every gentleman should''। কথার সুরে এমন গাম্ভীর্য ছিল যে আমার মুখরতা স্তব্ধ হল। তিনিও বুঝলেন আমি অপ্রস্তুত হয়েছি। তখন আমাকে ঐ ঘটনার আনুপর্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত—যা তিনি গোখেলের নিজমুখে শুনেছিলেন—জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন বল তুমি গোখেল কি রাণাডেকে compromise করতে পারতেন? আর রাণাডেকে

compromise না করে তাঁর apologise করা ছাড়া আর কি উপায় ছিল। যে charges তিনি রাণাডের সাহায্য ছাড়া প্রমাণ করতে পারবেন না, এবং প্রমাণ করতে না পারলে যে charges কোনোমতেই দাঁড়ায় না, তা withdraw না করা কি ভদ্রতার কাজ হত? বিশেষত তাঁকে যখন Bombay Governm:nt challeng: করল either to substantiate the charges or to withdraw them?'

আমি নীরব, বাক্যহীন। পরে জেনেছিলাম অতুলপ্রসাদেরই কাছে যে গোখেলকে তিনি গুরুর মত ভক্তি করতেন এবং তিনিও তাঁর কাছে শিষ্যের মত স্নেহলাভ করেছিলেন।

১৯১৬-র গোড়ায় অতুলপ্রসাদ পারিবারিক কারণে লখনৌয়ে তাঁর মস্ত প্র্যাকটিস ছেড়ে কলকাতা হাইকোর্টে এসে ব্যারিস্টারি সুরু করলেন। ফ্ল্যাট নিলেন পার্ক স্ট্রিট ও ওয়েলেস্‌লি স্ট্রিটের মোড়ের কাছাকাছি 'ওয়েলেস্‌লি ম্যানসনস্‌'-এ।

অতুলপ্রসাদ কলকাতায় আসবার কিছুদিন আগে আমরা কয়েকজন মিলে 'সোমবার' বা 'মনডে ক্লাব' নাম দিয়ে একটি ছোট বন্ধুগোষ্ঠী রচনা করেছি। বয়স ও পদমর্যাদা নির্বিচারে আমাদের এই ক্লাবের প্রথম সদস্য ছিলেন—পরলোকগত অজিতকুমার চক্রবর্তী, পরলোকগত সুকুমার রায়, গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পরে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ), ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, অধ্যাপক কালিদাস নাগ, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র সেন (পরে লখনৌ শিয়া কলেজের অধ্যক্ষ), সুবিনয় রায়, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, জীবনময় রায়, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও হিরণকুমার সান্যাল; ক্লাবের সম্পাদক ছিলেন অতুলপ্রসাদের মাসতুতো ভাই শিশিরকুমার দত্ত। পরে এই ক্লাবে যোগদান করেন পরলোকগত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরলোকগত গিরিশচন্দ্র শর্মা, অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত (পরে লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)। প্রত্যেক সোমবারে 'মনডে ক্লাবের' অধিবেশন হত কোন-একজন সদস্যের বাড়িতে। সদস্যদের মধ্যেই কেউ একজন নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ বা আলোচনা উত্থাপন করতেন। আলাপ আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, গান, গল্প, প্রচুর জলযোগ ও গোলযোগ সমাপনান্তে সভা ভঙ্গ হত অনেক রাত্রে। প্রত্যেক অধিবেশনেই সদস্যমণ্ডলীর বাইরে নিমন্ত্রণ

করা হত একাধিক ব্যক্তিকে। ছোট-বড় কেউই বাদ যেতেন না। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এসেছেন, রবীন্দ্রনাথও একাধিকবার আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করে আমাদের সম্মানিত করেছেন। কবি যেদিন প্রথম আসেন সেদিন আমাদের জন্য 'পয়লা নম্বর' গল্পটি লিখে এনে পড়ে শুনিয়েছিলেন। তাতে 'দ্বৈত-সভার' যে-বর্ণনা ছিল তার খানিকটার সঙ্গে আমাদের ক্লাবের অনেকটা মিল ছিল।

অতুলপ্রসাদ কলকাতায় আসতেই আমাদের ক্লাবে যোগ দিলেন। আমরা এমন একজনকে পেলাম যিনি গানে-গল্পে, হাস্যে-পরিহাসে, সমবয়সী-অল্পবয়সী সকলকে একান্তভাবে আপনার করে নিলেন। তাঁর ফ্ল্যাটের ড্রয়িংরুমে আমাদের ক্লাবের অধিবেশনের জন্য মস্ত বড় একজোড়া তক্তপোশ পড়ল, তার উপর পাতা হল পুরু গালিচা। তারপর দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার যে-রকম বিরাট আকার গ্রহণ করল তাতে ক্লাবের অধিবেশন আর অন্য কোথাও হওয়া সুকঠিন হয়ে পড়ল। প্রত্যেক অধিবেশনেই সুনিবিড় সংগীত-চর্চা চলত; কাব্যালোচনা ত ছিলই। অতুলপ্রসাদ সুন্দর কবিতা পড়তেন, Readings দেওয়ার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। হাস্যরসের অবতারণায় তিনি যে কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের বিশেষ বন্ধু ছিলেন, তার সবিশেষ প্রমাণ পাওয়া যেত। অথচ তিনি 'রাশভারী' লোক ছিলেন। চটুলতাকে তিনি কোনোদিনই প্রশ্রয় দেননি।

শুধু যে তার নিজের ফ্ল্যাটেই যখন আমাদের ক্লাবের অধিবেশন হত তখনই অতুলপ্রসাদ থাকতেন তা নয়। অন্য সদস্যদের বাড়ির অধিবেশনেও তিনি পারতপক্ষে কখনও অনুপস্থিত থাকতেন না। ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র মশায়ের গঙ্গার উপরে মেয়ো হাসপাতাল ভবনের বিরাট ছাদে; প্রথমে নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ার এবং পরে সুকিয়া স্ট্রিট আমার স্বল্প-পরিসর বৈঠকখানায়; গড়পারে পরলোকগত সুকুমার রায়ের ড্রয়িংরুমে; সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সুকিয়া রো-র পৈতৃক বাসভবনে; কালিদাস নাগের মাতুল, আলিপুর চিড়িয়াখানার তখনকার সুপারিনটেনডেন্ট্ রায় বাহাদুর বিজয়কৃষ্ণ বসু মহাশয়ের 'কোয়ার্টার্সে' সর্বত্রই আমরা অতুলপ্রসাদকে পেতাম। মনে পড়ে আলিপুরের বাগানে, কালিদাসের আহ্বানে, আমরা একবার সারাদিন কাটিয়েছিলাম। সেদিন অতুলপ্রসাদকে ঘিরে যে আনন্দের প্রস্রবণ বয়েছিল তার স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে এখনো আনন্দ বহন করে আনে। সে আনন্দের উৎস ছিলেন বন্ধুবর সুকুমার।

যাঁরা 'আবোল-তাবোলের' কবিকে জানতেন তাঁরা জানেন কী অনাবিল রসিকতার ভাণ্ডার, কী বিদগ্ধবাক্ ছিলেন আমাদের এই বন্ধুটি!

আর একবার আমরা 'মন্‌ডে ক্লাব'-এর সবাই মিলে স্টিমারে কোলাঘাটে বেড়াতে যাই। অতুলপ্রসাদও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সমস্ত নদীপথ তাঁর গা.ন আর গল্পে মুখরিত হয়েছিল। সন্ধ্যার পর কোলায় পৌঁছলাম। রূপ-নারায়ণেব উপব একটি সবকারি বাংলোয় আমাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট ছিল। সে রাত্রে আমাদেব দলেব কেউ শোয়নি; চন্দ্রালোকিত বিনিদ্র রজনী নদীতটে কেটেছিল অতুলপ্রসাদের সাহচর্যে।

ক্লাবের আলাপ-আলোচনাতেও তিনি যথারীতি যোগ দিতেন। সাহিত্য, সমাজ, দর্শন, বিজ্ঞান, বাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য কিছুই আমাদের আলোচ্য বিষয় থেকে বাদ যেত না। তিনি খুব সহিষ্ণু শ্রোতা ছিলেন একথাও আজ মনে পডছে। 'Oscar Wilde—The Man and his work,' এই নাম দিয়ে আমি একবার একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ কবে বন্ধুদেব প্রায় ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছিলাম। বাত্রি অধিক হয়েছিল। আলিপুব থেকে ফিবে আসবাব ট্রাম প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তখন মোটব-বাস ছিল না—সকলেই উসখুস কবছেন; শুধু অতুলপ্রসাদ স্মিত হাস্যমুখে শুনে যাচ্ছেন—সেই ছবিটি আমার মনে পড়ে। যাহোক, আমার প্রবন্ধ পাঠ শেষ হল; অতুলবাবু জানালেন যে পরের অধিবেশনে তিনি অস্কার ওয়াইলড সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবেন। সেদিনও আলিপুরেব বাগানে, কালিদাসের ওখানে আমাদের সভা বসল। অতুলপ্রসাদ আমাদেব অস্কার ওয়াইলডের বিচারের বৃত্তান্ত শোনালেন। সে সময়ে তিনি ও সি. আব. দাস মহাশয় বিলাতে ব্যারিস্টা ব পড়ছেন। ওল্ড বেইলিতে তাঁরা দু'জন সে বিচার দেখতে গিয়েছিলেন। সার এডওয়ার্ড কারসোনের জেরার জবাবে ওয়াইলডের মুখে কিবকম তুবড়ি ফুটেছিলো সেইসব গল্প অতুলপ্রসাদ করলেন। তারপর ওয়াইলডের 'Ballard of the Reading Goal' থেকে কিছু পড়ে শোনালেন।

শুধু যে আমরাই অতুলপ্রসাদের 'ওয়েলেসলি ম্যানসনস্'-এর ফ্ল্যাটে জমায়েত হতাম এমন নয়। তখনকাব হাইকোর্টের বার লাইব্রেরির অনেককেই দেখা যেত। পরলোকগত জে. এন. রায় মশায়কে প্রায়ই দেখতাম। তাঁর কিঞ্চিৎ সাহিত্য-চর্চার শখ ছিল। আমি তখন খবরের কাগজের কাজে একটু একটু হাত পাকাচ্ছি। সময়ে অসময়ে অতুলপ্রসাদের ওখানে গিয়ে জুটতাম। একদিন

বিকেলবেলা তাঁর ফ্ল্যাটের দরজায় 'নক্' করতেই দরজা খুলে দিলেন সার (তখনও লর্ড হননি) সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়। আমি থতমত খেয়ে গেলাম। তিনি আমাকে সামান্য চিনতেন, কেননা বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর তিনি ছিলেন প্রেসিডেন্ট এবং আমি ছিলাম সহকারী সম্পাদক ; সে-কাজে তাঁর কাছে মধ্যে মধ্যে আমাকে যেতে হত। আমার থতমত ভাব দেখে সার সত্যেন্দ্র বললেন—'ভিতরে এসো। অতুল কাপড় ছাড়তে গিয়েছেন, এখনই আসবেন।' আশ্বস্ত হয়ে ঢুকলাম ঘরে। একটু পরে অতুলবাবু এলেন। তারপর চা এল। সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের কথা যাঁরা লর্ড সিংহ, আনডার সেক্রেটারি অব স্টেট্ ফর ইণ্ডিয়া, বিহারের গভর্নর এই প্রসঙ্গে শুনেছেন তাঁরা হয়ত জানেন না তিনি কত সহজ ও সাদাসিধে লোক ছিলেন। আমিও তা জানতে পারতাম না সেদিন যদি তাঁকে অতুলপ্রসাদের ঘরে না দেখতাম। বললেন—'সারাদিন কাজের চাপে ফাইলের মধ্যে'—তিনি তখন বাংলার গভর্নরের খাস পরিষদের অন্যতম সদস্য——'প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে। আজ একটু ছাড়া পেয়ে অতুলকে হাইকোর্ট থেকে ধরে এনেছি একটু গান শুনব বলে ; অনেকদিন ওর গান শুনিনি।' অতুলপ্রসাদ একটার পর একটা অনেকগুলি গান করলেন। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সবচেয়ে খুশি হলেন—তার কয়েকদিন পূর্বে লখ্নৌ কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য রচিত 'বল বল বল সবে, শত বীণাবেণুরবে, ভারত আবার জগত-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে' গানটি শুনে। শুনতে শুনতে সিংহ সাহেবের মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল ; চোখ বুজে মাথা নাড়তে লাগলেন, চেয়ারের হাতায় তাল দিতে শুরু করলেন, দু'বার দু'বার অতুলবাবুকে গানটি গাওয়ালেন। সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের সেই ভাবাবিষ্ট মূর্তিটি এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে।

'ওয়েলেসলি ম্যানসনস্'-এর ফ্ল্যাটে অন্য প্রদেশের ও প্রবাসী বাঙালি অতিথি সমাগমও কম হত না। একবার দেখা হল 'লীডার' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সি. ওয়াই. চিন্তামণির সঙ্গে। আর-একবার দেখি এসেছেন বোম্বাই থেকে সরোজিনী নাইডুর ভাই হরীন্দ্রনাথ ও তাঁর ভগ্নী 'শাম্-আ' সম্পাদিকা মৃণালিনী। হরীন্দ্রের কবিখ্যাতি তখনও প্রচারিত হয় নি। তাঁর কোনো বইও ছাপা হয় নি। তিনি একদিন আমাদের তাঁর কতকগুলি কবিতা পড়ে শোনালেন।

অতুলপ্রসাদ মুগ্ধ। বারবার বল্লেন—"চমৎকার হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে। দেখো তুমি একদিন তোমার দিদিকে ছাড়িয়ে যাবে।" তাঁর সে ভবিষ্যৎ বাণী সফল হয়েছে।

অতুলপ্রসাদ সেন

অতুলপ্রসাদের কলকাতা বাসের কথা বলতে গেলে আর-একজনের কথা খুব মনে পড়ে। সেটি হচ্ছে নবাব আলি নামে তাঁর বৃদ্ধ খিদ্‌মৎগার। এমন প্রভুভক্ত ভৃত্য ও এমন স্নেহ-পরায়ণ মনিব আমি আর দেখিনি। অতুলবাবু মফঃস্বলে একটা মামলা চালাতে গিয়েছেন, তাঁর ফিরে আসবার কথা সকালবেলা, কিন্তু এসে পৌঁছননি। আমি তা জানি না। বিকেলের দিকে তাঁর ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখি শ্বেতশ্মশ্রু নবাব আলি টেবিলে খাবার সাজিয়ে অপেক্ষা করছে, সারাদিন অভুক্ত। আর সাহেব যথাসময়ে এসে পৌঁছননি, সে তাঁর চিন্তায় কাতর। তাকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করলুম, বললাম, 'সাহেব নিশ্চয়ই কাজে আটকে পড়েছেন, তুমি খেয়ে দেয়ে নাও।' সে-কথা বৃদ্ধ কানে তুললে না।

১৯১৬-র ডিসেম্বরে লখনৌয়ে কংগ্রেসের অধিবেশন হল। কংগ্রেস বসবার তিন সপ্তাহ আগে লখনৌ থেকে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষদের তরফ হতে একজন এসে অতুলবাবুকে পাকড়াও করে নিয়ে গেলেন। যাবার সময় আমাকে বললেন— 'তুমি তো আস্‌চ। লখনৌ পৌঁছেই আমার সঙ্গে দেখা কোরো।' কংগ্রেস বসবার দিন তিনেক আগে লখনৌ পৌঁছলাম। পৌঁছেই অতুলপ্রসাদের বাড়িতে গেলাম। বাড়িতে তিনি নেই। অবগত হওয়া গেল যে, অতুলপ্রসাদ কংগ্রেস কম্পাউণ্ডে তাঁবুতে বাস করছেন, বাড়িতে আসেন না; ডেলিগেটদের মধ্যে হোমরা-চোমরা কয়েকজন তাঁর বাড়িতে এসে থাকবেন। কংগ্রেস ক্যাম্পে গেলাম। সেখানে দেখি অতুলপ্রসাদ ভলানটিয়ার বাহিনীর অধিনায়ক। যোধপুরী পায়জামার উপর খাকা রঙের ইউনিফর্ম কোট, মাথায় রাজপুত পাগড়ী। বুকে কর্ড দিয়ে বাঁধা হুইস্‌ল্‌, হাতে একটি ছড়ি। ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন। আমাকে দেখেই এগিয়ে এসে বললেন—'তুমি আমার বাড়িতে থাকবে, সেখানে সব ব্যবস্থা আছে, কোনো কষ্ট হবে না।' আমি হেসে বললাম —'তা আমি শুনেছি, কিন্তু ওসব হোমরা-চোমরার মধ্যে আমি থাকতে পারব না।' 'তুমিও ত একজন 'হোম' হে। আচ্ছা, তাহলে তুমি আমার কাছে এসে থাক।' আমি ধন্যবাদ দিয়ে জানালাম যে, 'আমি উপেন বল মশায়ের বাড়িতে উঠেছি; সেখানে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় আছেন। আমরা একসঙ্গে কলকাতা থেকে এসেছি।'

সেবার লখনৌ কংগ্রেসে গিয়ে বুঝলাম অতুলপ্রসাদ লখনৌ সহরবাসীর কত প্রিয়। সত্যই তিনি লখনৌর মুকুটহীন রাজা ছিলেন। ধনী-দরিদ্র, মডারেট একসট্রিমিস্ট, রাজা-নবাব, রইস-রায়ৎ, অধ্যাপক-স্কুলমাস্টার, উকিল-ব্যারিস্টার,

হিন্দু-মুসলমান—সকল শ্রেণীর সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর অদ্ভুত প্রভাব। দেখলাম সামান্য টাঙাওয়ালা পর্যন্ত সেন সাহেবকে জানে, শ্রদ্ধা করে। যুবক-মহলে তাঁর কী অসাধারণ প্রতিপত্তি। তাঁর তাঁবুতে বসে দেখতাম, কংগ্রেসের ভলানটিয়াররা তাঁর অঙ্গুলি-হেলনে নিঃশব্দে আদেশ পালন করছে; কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি পরলোকগত পণ্ডিত গোকরণনাথ মিশ্র—পরে যিনি আউধ চীফ কোর্টের জজ হয়েছিলেন, অন্যতম সেক্রেটারি পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর শ্রীবাস্তব যিনি এখন চীফ কোর্টের চীফ জজ, মোসলেম লীগের সৈয়দ ওয়াজির হোসেন সাহেব প্রত্যেকে এবং সকলেই 'ভাই সাহেবে'র সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনো কাজ করেন না। তিনি তাঁদের বন্ধু, মন্ত্রণাদাতা, নেতা অথচ তিনি কেবল মাত্র ভলানটিয়ার-বাহিনীর অধিনায়ক। বড় পদের লালসা তাঁর কখনও ছিল না। তাই লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যানসেলারের পদ তিনি অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও গ্রহণ করেননি।

সাম্প্রদায়িকতা হতে মুক্ত মানুষ আজকের দিনের পলিটিক্যাল ক্ষেত্রে দেখা পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পযন্ত অতুলপ্রসাদকে এই ভাব থেকে মুক্ত দেখেছি। মনে পড়ে যেদিন লখনৌয়ে প্রথম হিন্দু-মুসলমান প্যাকট নিষ্পত্তি হল সেদিন তাঁর কি আনন্দ! যখন শুনলেন তিলক বলেছেন যে, 'I dont care how many seats in the legislatures Mahomedans get' তখন তিনি বারবার বলতে লাগলেন—'that's exactly my view too'।

লখনৌ কংগ্রেস থেকে অতুলপ্রসাদের চরিত্রের আর-একটা দিক—তাঁর কর্মশক্তি, স্বদেশপ্রেম, লোক-হিতৈষণা, বন্ধু-বাৎসল্য দেখে মুগ্ধ হয়ে ফিরলাম। তিনি কিন্তু আর কলকাতায় ফিরে এলেন না। আবার লখনৌয়ে প্র্যাকটিস সুরু করলেন। তাঁকে কি আর লখনৌ ছাড়তে দেয় তার বন্ধুরা? ১৯১৭ সালের কলকাতায় বেসাণ্ট-কংগ্রেসে তিনি এসেছিলেন কিনা মনে পড়ছে না। তবে যত দূর মনে পড়ছে বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর পক্ষ থেকে সে সময় আমরা যে প্রথম অল ইণ্ডিয়া সোশ্যাল সার্ভিস কনফারেনস কলকাতায় করি তাতে গান্ধীজীকে সভাপতি করবার প্রস্তাব তিনিই আমাদের কাছে করেন। রাজনৈতিক মতান্তর সত্ত্বেও মহাত্মাজীর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

কলকাতায় কংগ্রেসের অল্প দিন পরেই আমি খবরের কাগজের কাজে

লাহোরে চলে গেলাম। লখনৌ হয়ে যাবার জন্য তাঁর কাছ থেকে অনুরোধ এল। তখন পানজাব মেল লখনৌ দিয়ে যেত না, সুতরাং তাঁর সে অনুরোধ রক্ষা করতে হলে আমাকে মোগলসরাইয়ে নেমে গাড়ি বদলিয়ে যেতে হত তাই যাওয়া ঘটে উঠল না। লাহোর পৌঁছে তাঁর একখানি টেলিগ্রাম পেয়ে মনটা বড়ই খুশি হল; নতুন কর্মক্ষেত্রে আমার সাফল্য কামনা করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে দিল্লিতে কংগ্রেস, মালবীয়জী সভাপতি। লাহোর থেকে কাগজের স্পেশাল রিপ্রেজেনটেটিভ হয়ে এসেছি; মডারেট আর হোমরুলাররা মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড স্কিম নিয়ে লড়াই করবার জন্য কোমর বাঁধছেন। মিসেস বেসাণ্ট বেঁকে বসেছেন, তাঁর দল দ্বিধা-বিভক্ত। বাংলার পলিটিসিয়ানরা বিপিনচন্দ্র, ব্যোমকেশ ও চিত্তরঞ্জনের পরিচালনায় ইমিডিয়েট প্রভিনসিয়াল অটোনমির দাবী জানিয়েছেন। মোসলেম লীগের দোমনা ভাব, জিন্নাসাহেব সংশয়-তরীতে দোল খাচ্ছেন; শ্রীনিবাস শাস্ত্রী 'মডারেশন' ও 'প্রুডেনস' এর দোহাই দিচ্ছেন। খবরের কাগজীদের খোরাকের অভাব নেই, তাই আমারও দিনে-রাত্রে বিশ্রাম নেই। হঠাৎ খবর পেলাম অতুলপ্রসাদ এসেছেন। বহুদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। খবর পেয়েই ছুটলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি উঠেছেন 'মেটকাফ হাউসে', কংগ্রেস ক্যাম্প থেকে তিন-চার মাইল দূরে। যখন পৌঁছলাম রাত্রি হয়ে গিয়েছে। ভলানটিয়ার একজন খবর দিলে যে সেদিনই বিকালে তিনি এসে পৌঁছেচেন, বড় ক্লান্ত, শুয়ে পড়েছেন। ব্বু তাকে বললাম—'কার্ড নিয়ে যাও।' কার্ড পাঠাবামাত্র অতুলবাবু বেরিয়ে এসে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গেলেন তাঁর ঘরে। দেখি দু'খানি ক্যাম্প খাট—একখানিতে লেপের উপর কম্বল মুড়ি দিয়ে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী শুয়ে, আর একখানি অতুলবাবুর। একটি মাত্র চেয়ার; আমাকে তাতে বসিয়ে নিজে খাটের উপর বসলেন। কত কথা, কত প্রশ্ন, কত গল্প। খাওয়া হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। হয়নি শুনে তখনি খাবার আনালেন, বসে খাওয়ালেন এবং বারবার সতর্ক করে দিলেন যেন অতিরিক্ত পরিশ্রমে আর দিল্লির হাড়ভাঙা শীতে অসুখ না করে বসি। ঘরের ভিতর ফায়ার প্লেসে আগুন জলছিল, তাই আমার ওভারকোট খুলে রেখেছিলাম। ঘর থেকে বের হবার আগে নিজে ওভারকোট পরিয়ে দিলেন এবং কোটের উপর হাত বুলিয়ে দেখলেন সেটি যথেষ্ট মোটা আর গরম কিনা।

১৯১৯-এ পানজাবের হাঙ্গামার সময় কালীনাথ রায় মহাশয়ের কারাদণ্ড হওয়াতে আমি যখন 'ট্রিবিউন' কাগজের অস্থায়ী সম্পাদকপদ লাভ করলাম অতুলপ্রসাদ টেলিগ্রাম করে আনন্দ-অভিনন্দন জানালেন। কিছুদিন বাদে এল এক ঝুড়ি লখনৌর বিখ্যাত 'সফেদা' আম। পানজাবে জঙ্গী আইনের অত্যাচারে তিনি বিষম মর্মাহত হয়েছিলেন। হাণ্টার কমিটির তদন্তের ফলে যখন সত্য ঘটনা, যা চাপা ছিল, বের হতে আরম্ভ করল, তখন তিনি আমাকে যে একখানি চিঠি লিখেছিলেন তাতে মডারেট মনোবৃত্তির এতটুকু পরিচয়ও ছিল না। সত্যিই তিনি মতামতে মডারেট হলেও স্বভাবত মডারেট ছিলেন না। আমার মনে হয় গোখেলের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা খুব বেশিরকম থাকাতে তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর অনুগামী ছিলেন।

১৯২০ সালে আমি 'ট্রিবিউন'-এর কাজে ইস্তফা দিয়ে লাহোর ছেড়ে এলাহাবাদে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' কাগজে যোগ দিলাম। 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' কাগজের নৌকা তখন একসট্রিমিজম-এর ভরা পাল চড়িয়ে ছুটছে। বিপিনবাবু সম্পাদক, রঙ্গ আয়ার আর আমি তাঁর দুই সহকারী; সাব-এডিটররা এক একটি অগ্নিশলাকা। মডারেটদের মুণ্ডপাত করা আমাদের নিত্যকর্ম, বিশেষত ইউ-পির মডারেট লীডারদের। তেজবাহাদুর কাশ্মীরী হয়েও পার পান না। জগৎনারায়ণ প্রায়ই খোঁচা খান। তবে চিন্তামণির উপর রাগটাই আমাদের বেশি, কেননা তিনি 'লীডার'-এর সম্পাদক। জহরলালজী তবু খুসী নন, প্রায়ই বলেন, 'বড় ফ্ল্যাট হয়ে যাচ্ছে যেন, আর একটু সুর চড়ালে ভাল হয়।' এহেন অবস্থায় একদিন দুপুরে অপিসে বসে কাজ করছি, জুন মাস, অসহ্য গরম, চতুর্দিকে খসখস্ টাঙানো— হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সেই অগ্নিকুণ্ডে একসট্রিমিস্টদের কেল্লায় প্রবেশ করলেন মডারেট লীডার মিস্টার এ. পি সেন, সদাহাস্যবিকশিত সস্মিতবদন। সাব-এডিটররা বিস্মিত, রঙ্গ আয়ার একটু অপ্রস্তুত, কোথাও যেন বাধছে— আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সংবর্ধনা করে বসালাম। সেইদিন সকালে এলাহাবাদ হাইকোর্টে একটা মোকদ্দমার কাজে তিনি এসেছেন, রাত্রেই ফিরে যাবেন; বললেন, 'আজ শনিবার, কাল তো তোমার ছুটি, আজ চল আমার সঙ্গে লখনৌ; মোটরে যাব রাত্রিতে।' তিনি ডক্টর (পরে সার) তেজবাহাদুর সাপ্রুর অতিথি। খাওয়া-দাওয়া সেরে সেখানে গেলাম। লাহোরে থাকতে সাপ্রুমহাশয়ের পরিচয়সৌভাগ্য ঘটেছিল। এলাহাবাদে

এসে একদিন মাত্র দেখা করতে গিয়েছিলাম। তাই নিয়ে অতুলপ্রসাদের কাছে ঠাট্টা করে বললেন, 'মডারেটদের বাড়িতে কি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট-দের আসতে আছে?' অতুলপ্রসাদ হেসে বললেন, 'তাইত আমি নিজেই গিয়েছিলাম।' একটু পরে দেখি শ্রীযুক্ত চিন্তামণি এসে উপস্থিত। তাঁকেও অতুলপ্রসাদ লখনৌ নিয়ে যাচ্ছেন। আমার তো চক্ষু স্থির। প্রতিদিন যাঁর সম্বন্ধে কটু-কাটব্য না করে আমরা জলগ্রহণ কবি না, তাঁর সঙ্গে একত্রে গমন ও বসবাস—সমস্যা বটে! চিন্তামণি মহাশয় স্বভাবত গম্ভীর। যে কারণেই হোক আরো একটু গম্ভীর হলেন, আমার অবস্থা সহজেই অনুমেয়। অতুলপ্রসাদ ব্যাপারটা বুঝলেন। গাড়িতে উঠে চিন্তামণি মশায়কে বসালেন আমাদের দুজনের মাঝখানে। তারপর আরম্ভ করলেন যত খোশগল্প আর চিন্তামণি মহাশয়ের মৃদু মৃদু 'লেগ-পুলিং'। গভীর নিশুতি রাত্রে মোটর চলছে, নীরব পথ মুখরিত হয়ে উঠছে হাস্যধ্বনিতে, চিন্তামণি না হেসে পারছেন না। এমনি করে সমস্তটা এমন সহজ করে দিলেন অতুলপ্রসাদ যে, যে দু-দিন তাঁর বাড়িতে আমবা দুজন ছিলাম, কেউই কোনো কুণ্ঠাবোধ করিনি। পরস্পরের সহজ মানব সম্বন্ধটাই ফুটে উঠল পলিটিকাল কোন্দলের উপরে। আর সে শুধু অতুলপ্রসাদের গুণেই।

তারপর এলাহাবাদ থেকে আরো দু'চারবার লখনৌয়ে অতুলপ্রসাদের ওখানে গিয়েছি। তাঁর বাড়িতে সর্বদলের সর্বজাতিব সম্মিলন দেখে বিস্মিত হয়েছি। ভারতবর্ষের বহু মনীষীর সাক্ষাৎব.র লাভ করে কৃতার্থ বোধ করেছি।

এলাহাবাদ ছেড়ে ১৯২১-এ কলকাতায় এসে 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ'-এ যোগ দিলাম। ন্যাশনালিস্ট কাগজের ঠাণ্ডা বাতাস বরদাস্ত করতে কিছুদিন কেটে গেল। ইতিমধ্যে অতুলপ্রসাদ যখনই কলকাতায় আসেন দেখা হয়। সুপরামর্শ দেন, তাঁর স্নেহ-ভালবাসার নিত্য নূতন পরিচয়ে মন ভরে ওঠে। ইতিমধ্যে বন্ধুবর ধূর্জটিপ্রসাদ লখনৌয়ে অধ্যাপক হয়ে গেলেন। তাঁর আগে গিয়েছিলেন অগ্রজতুল্য রাধাকুমুদ ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ভ্রাতৃযুগল, তারপর গেলেন সুহৃদ্বর নির্মলকুমার, তারপর বন্ধু অসিতকুমার। এঁদের সকলকে পেয়ে অতুলপ্রসাদ যে কী আনন্দ লাভ করেছিলেন তা আমি জানি। বিশেষত ধূর্জটিপ্রসাদের গানের সমজদারিতায় ও তাঁর মননশীল অনুসন্ধিৎসায় তিনি মুগ্ধ ছিলেন। বহুবার আমাকে সেকথা বলেছেন। এঁরাও সকল কর্মে অতুলপ্রসাদের চারিপার্শ্বে দাঁড়িয়ে তাঁকে ঘিরে বাংলার সংস্কৃতির যে বিশুদ্ধ পরিচয় উত্তর

ভারতে দিচ্ছিলেন, তা তাঁর মৃত্যুতে বাধা পেল। বাঙালি মাত্রেরই এই দুঃখ রাখবার জায়গা নেই।

১৯২৬ সালের ডিসেম্বরে দিল্লিতে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনে যোগদান করে লাহোর ঘুরে ফিরবার পথে লখনৌ এলাম অতুলপ্রসাদ ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে। অতুলপ্রসাদ সম্মিলনীতে আসেননি শুনেছিলাম তিনি শান্তিনিকেতনে পৌষ উৎসবে যোগদান করতে গিয়েছেন। আমি লখনৌ পৌঁছবার পরদিন ৩ জানুয়ারি ১৯১৭ তিনি বোলপুর থেকে ফিরে এলেন। বিকালবেলা বন্ধুবর নির্মলকুমার, ধূর্জটিপ্রসাদ, অধ্যাপক বিনয় দাশগুপ্ত আর আমি তাঁর চারবাগের নতুন বাড়িতে এলাম। এ বাড়ি আমি এর আগে দেখিনি। অতুলপ্রসাদের নিজের নামের রাস্তার উপর লখনৌয়ে নতুন স্টেশনের সামনে চমৎকার বাড়িটি দেখে এত ভালো লাগল। বাড়ির নাম দিয়েছেন নিজের স্বর্গগতা মায়ের নামে। নিজে সমস্ত বাড়িটি ঘুরে দেখালেন। দিল্লির সম্মিলনে পঠিত আমার 'অতি আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য' প্রবন্ধ যা ছাপিয়ে আমি আগেই তাঁকে ও আরও কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিককে পাঠিয়েছিলাম, পড়ে রবীন্দ্রনাথ খুশি হয়েছেন এবং তিনি নিজেও প্রবন্ধে ব্যক্ত মতামতের অনেকগুলিই সমর্থন করেন একথা জানালেন। তারপর তাঁর দুটি নবরচিত গান গেয়ে শোনালেন— 'ওগো সাথী, মম সাথী,—আমি সেই পথে যাব সাথে' ও 'জানি জানি তোমারে গো রঙ্গরানী'। নিজে গান দু'টি লিখে আমাকে দিলেন।

১৯২৭-এর ডিসেম্বরে আমার বিবাহ হয়। বিবাহের তিন-চারদিন আগে জোড়াসাঁকোয় কবি-ভবনে 'ঋতুরঙ্গ' অভিনয়ে হঠাৎ অতুলপ্রসাদের সঙ্গে দেখা। তিনি কলকাতায় এসেছেন আমি জানতাম না। বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র লখনৌ ছাড়বার আগেই পেয়েছেন। বার বার দুঃখ করতে লাগলেন যে বিশেষ জরুরী কাজে তাঁকে পরদিনই লখনৌ ফিরে যেতে হবে, বিবাহে উপস্থিত থাকতে পারবেন না। আমার ভাবী পত্নীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম। ছেলেবেলায় তাঁকে দেখেছেন বললেন এবং কত যে খুশি হয়েছেন তা নানাভাবে জানালেন।

বড়দিনের ছুটিতে শান্তিনিকেতনের সাংবাৎসরিক উৎসবে নববধূকে নিয়ে কবি-সদনে গেলাম। যেদিন সন্ধ্যায় আমরা পৌঁছলাম তার পরদিন অতি প্রত্যূষে কবির কণ্ঠস্বরে ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করে এসে দেখলাম, কবি আমাদের পাশের ঘরখানি ঠিকঠাক করে রাখবার জন্য ভৃত্যকে

নির্দেশ করছেন। আমাকে দেখেই বললেন—'কাল রাত্রে অতুলের টেলিগ্রাম এসেছে। সে আজ একটু পরেই এসে পৌঁছবে।' অতুলপ্রসাদের জন্য রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ঘর ঠিক করাচ্ছেন। দেখে এত আনন্দ হল। অল্পক্ষণ পরেই অতুলপ্রসাদ এলেন। তারপব চার-পাঁচটি দিন কবি-ভবনে আমাদের কী আনন্দেই কাটল। প্রতিদিন চারবার খাবার টেবিলে কবির অতিথি আমরা সকলে যখন সমবেত ·হতাম তখন কী রসের বন্যা ছুটত। কবির রসিকতা সর্বজনবিদিত, তাঁর পরিহাসপ্রিয়তা সুপ্রসিদ্ধ। তার সঙ্গে যেন মনিকাঞ্চন যোগ হল অতুলপ্রসাদের পরিচ্ছন্ন ও প্রচ্ছন্ন রহস্য-শক্তি। কবির সুতীক্ষ্ণ ও সুগভীর রহস্যালাপ ক্ষণে ক্ষণে হাসির লহর তুলত আর সে কী অম্বুদমন্দ্র হাসি অতুলপ্রসাদের। সমস্ত ঘরটি যেন গমগম করত।

কবির প্রতি অতুলপ্রসাদের যে কী অসীম অনুরাগ ছিল তার বহু পরিচয় বহুবার বহুভাবেই পেয়েছি। ১৯৩১-এর ১৬ মে রবীন্দ্রজয়ন্তীর উদ্বোধন সভার সকালে আমি জানতে পাবলাম অতুলপ্রসাদ কলকাতায় এসেছেন। বালিগঞ্জে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বলামাত্রই তিনি সভায় উপস্থিত থাকতে ও কিছু বলতে সানন্দে সম্মত হলেন। অথচ রক্তের চাপ হঠাৎ বেশি হওয়াতে তিনি সার নীলরতনকে দেখাবার জন্য সেবার কলকাতায় এসেছেন। আত্মীয়-স্বজনের নানা আপত্তি সত্ত্বেও তিনি যথাকালে সভায় যোগদান করলেন ও সুন্দর একটি বক্তৃতা দিলেন। তারপর রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবের আয়োজনে তাঁর কী আনন্দ। বারবার তিনি আমাকে চিঠি লিখে উৎসাহিত করেছেন। যখন বিরোধ বিরুদ্ধতা নিন্দা গ্লানির অন্ত নেই, বন্ধু-বান্ধবেরাও বিমুখ নিরুৎসাহ হয়ে প.ড়ছেন, তিনি আমাকে আশার বাণী শুনিয়েছেন। প্রবাসী বাঙালিরা যাতে উৎসবে যোগদান করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে আমি সাব লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সে বৎসর প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন স্থগিত রাখবাব জন্য অনুরোধ করেছিলাম। এ খবর পেয়ে অতুলপ্রসাদ নিজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে লালগোপালবাবুকে আমার অনুরোধে তাঁর একান্ত সম্মতি জানালেন। 'উত্তরা' সম্পাদককে টেলিগ্রাম করলেন প্রবাসী বাঙালিদের নাম-ঠিকানার তালিকা প্রস্তুত করে পাঠাবার জন্য।

রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব সন্নিকট। টাউন হলে অপিস খোলা হয়েছে। প্রদর্শনীর স্টল বাঁধা হচ্ছে, চিত্রশালা সাজানো হয়েছে—আমার ও সহকর্মীদের এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই। একদিন সন্ধ্যায় টেবিলে বসে কাজ করছি,

হঠাৎ মাথা তুলে দেখি সামনে বসে অতুলপ্রসাদ। কখন যে এসেছেন, নীরবে আসন গ্রহণ করেছেন কিছুই টের পাইনি।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'অতুলদা, একি অন্যায়। আপনি এসে এরকম বসে আছেন? বলুন কি করতে হবে।' বোম্বাই থেকে দুটি মারাঠি বন্ধু এসেছেন, তাঁদের জন্য 'নটীর পূজা' অভিনয়ের টিকিট সংগ্রহ করতে পারেননি জানালেন। তাঁদের একজনকে নিজের টিকিটখানি দিয়েছেন, আর-একখানি টিকিট প্রয়োজন। এর ব্যবস্থা করা আমার সাধ্যাতীত ছিল। বিব্রত হয়ে পড়লাম। মুহূর্ত মধ্যে আমার অবস্থা বুঝে নিয়ে তিনি আমাকে আশ্বস্ত করলেন এবং বারবার জানালেন তিনি কিছুই মনে করবেন না।

২৭ ডিসেম্বর ১৯৩১ রবীন্দ্রজয়ন্তীর কবি-সংবর্ধনা সভা। জনসমাগম শুরু হয়েছে, স্বেচ্ছাসেবকরা নির্দিষ্ট আসনে সদস্যদের বসাচ্ছেন, সহসা অতুলপ্রসাদ এসে বললেন, 'অমল আমি কি আমার সিট আর-একজনের সঙ্গে বদলিয়ে নিতে পারি?' আমি বললাম—'আপনার এত সামনে সিট তা ছেড়ে দূরে চলে যেতে চাচ্ছেন কেন?'' উত্তর হল—'আমার একটি বন্ধুর পাশে বসতে চাই।'

আমার বড় ইচ্ছে ছিল যে কবি-সংবর্ধনা সভায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে যে-অভিনন্দন দেওয়া হয়েছিল তা অতুলপ্রসাদের রচনা হয় এবং তিনি তা নিজে পাঠ করেন। প্রবাসী বাঙালি সাহিত্যিকের মধ্যে এ-কাজের জন্য তাঁর চেয়ে যোগ্যতর আর কে ছিলেন? কিন্তু তিনি আমাকে জানালেন যে, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সে-কাজের ভার দেওয়া উচিত। পরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের কর্তৃপক্ষেরা শ্রীমতী প্রতিভা দেবীকে সে সম্মান দান করলেন।

অতুলপ্রসাদ প্রায়ই চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্য কলকাতায় আসতেন। সব সময় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ ঘটত না। তিনি কলকাতা এলেই তাঁর আবাসস্থলে জলসা বসত। কখনো কখনো তাতে উপস্থিত থেকে দেখেছি সংগীতে তিনি তাঁর সমস্ত সত্তা কেমন করে ডুবিয়ে দিতে পারতেন।

স্মৃতিকথা মাত্রেই অসংলগ্ন ও অসম্পূর্ণ। অতুলপ্রসাদ সম্বন্ধে আমার স্মৃতি-ভাণ্ডার থেকে যা এখানে সংগ্রহ করলাম তার অসম্পূর্ণতার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

১৩৪১

অতুলপ্রসাদ

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

অতুলপ্রসাদ সম্বন্ধে এত শীঘ্র কিছু লিখতে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। এখনও পর্যন্ত নিষ্কামভাবে তাঁর জীবনের দান গ্রহণ করতে পারছি না। মনে হচ্ছে, তিনি এখনও জীবিত রয়েছেন এবং তাঁর সম্বন্ধে আমার উচ্ছ্বাস পড়ে হাসছেন। যিনি পরের সুখ্যাতি ছাড়া কখনও নিন্দা করেননি, তিনি কখনও নিজের সুখ্যাতি সহ্য করতে পারতেন না। ছেলেমানুষের মতন লজ্জিত ও ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তেন। ইতিপূর্বে একাধিক প্রবন্ধে তাঁর সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা করেছি, সেসব মন্তব্য যদি কখনও তাঁর চোখে পড়ত তাহলে বলতেন, তোমরা স্নেহের বশে আমাকে লোকের সামনে আনলে। আমি জানি লখনৌয়ের নির্মলচন্দ্র দে মহাশয় তাঁর ছেঁড়া খাতা থেকে কত যত্নে, তাঁর অজানিতে কবিতাগুলি উদ্ধার করেন; এ-ও জানি কত সাধ্য-সাধনা করে সেই পাণ্ডুলিপি ছাপাবার সম্মতি পাই। তাই আমার সদাই ভয় হয়, পাছে আমার কোনো ব্যবহারে, কোনো ভাষায় তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের প্রতি অমর্যাদা প্রকাশ পায়। এমন সুকুমার মনের বিশ্লেষণ করা মহাপাপ। অনুভূতিই এক্ষেত্রে শোভন।

সমগ্রতাকেই অনুভব করা চলে। তিনি ছিলেন সুসমন্বিত পুরুষ। তাঁর জীবনের বহুমুখীনতা কোনো দ্বন্দ্ব কিংবা বিভাগ সৃষ্টি করেনি। দ্বন্দ্ব ছিল না বলি না, কিন্তু সেই দ্বন্দ্বের শক্তিকে তিনি সুসমৃদ্ধ সংহতিতে পরিণত করেছিলেন। বিভাগ যে কত ছিল সকলেই জানেন, অতবড় ব্যারিস্টার, নেতা, সমাজসেবক, কর্মী, দাতা, কবি, সংগীত-রচয়িতা একাধারে দুর্লভ। কিন্তু প্রত্যেক কর্ম তাঁর স্বভাবে এত উত্তমরূপে ধৃত ছিল যে মনে হত সবই যেন অন্তরের জ্যোতিবিকিরণ, গোলাপ গাছের গোলাপ ফোটার মতই স্বাভাবিক, প্রতিবেশের

প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। প্রতিকূলকে অনুকূলে রূপান্তরিত করার জাদুবিদ্যা তাঁর ছিল করায়ত্ত। এমন প্রয়াসবিহীন সামঞ্জস্যের কৃপাতেই তিনি ছিলেন জনপ্রিয়। তাঁর জনপ্রিয়তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখলাম—সেদিনকার *শ্মশান-যাত্রায়। বিদগ্ধ নাগরিকের* শ্মশান-যাত্রা নয়, শহরের প্রত্যেক জাতির, ধনী-নির্ধনের প্রত্যেক অনুষ্ঠানের আত্মীয়ের শবানুগমন। শোকসভায় প্রত্যেকেই তাঁকে নিজের বলে দাবী করতে উদ্যত, কিন্তু কারোর মুখ ফুটে সে দাবী উচ্চারিত হল না—এই হল তাঁর শোকসভার বিশেষত্ব। এইপ্রকার মনোভাব একমাত্র সম্পূর্ণ ব্যক্তির প্রতিই সম্ভব।

কিন্তু বিশেষ কর্মেই তাঁর সমগ্রতা ধরা পড়ত। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন সর্বোচ্চ সমিতির সভ্য হিসেবে। কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অন্য ধরনের। আরো অনেকের মত আমি তাঁর কর্মান্তে বিরামের সঙ্গী ছিলাম। আমাদের পরিচয় হয় সংগীতের দৌত্যে, সংগীতের আসরে। আমার প্রিয় গানের রচয়িতা হিসেবে যুবা বয়স থেকে তাঁর নাম শুনে এসেছি। 'সবুজপত্রের' এক বৈঠকে তাঁর মুখে তাঁর গান শুনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরী নেবার পূর্বে একবার লখনৌয়ে বেড়াতে আসি। কৈসারবাগে তখন তিনি থাকতেন। অনেক রাত পর্যন্ত গান-বাজনা হয়। তারপর কত আসরে তাঁর পাশে বসে গান-বাজনা শুনেছি তার সংখ্যা নেই। ভাল গান-বাজনা শুনলে তিনি বালকের মত অধীর হয়ে উঠতেন; অস্ফুট চিৎকার করতেন, মুখ থেকে উর্দু জবান বেরোত, একস্থানে বসে থাকতে পারতেন না, আবার তৎক্ষণাৎ লজ্জিত হতেন। কতবার বলেছেন 'ত্থাখ, একটু ব্যাকুল ও বেসামাল হয়ে পড়লে আমার জামা ধরে টেন তোমাকেই বা কে সামলায় তার ঠিকানা নেই!' কিন্তু শারীরিক উত্তেজনা অল্পক্ষণের জন্যই তাঁকে অভিভূত করত। তারপর ধীরে ধীরে নামত তাঁর মুখে, সর্বাঙ্গে এক সস্মিত কমনীয়তা যার স্মৃতি আমার জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আমার কেন? সকলেরই। সন্ন্যাসের প্রথম আঘাতে, মাত্র এক ঘণ্টার জন্য সে হাসি চলে গিয়েছিল, তারপর বাহ্যজ্ঞান লোপ পাবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের প্রকৃতি বিকশিত হয়ে উঠল সেই হাসিতে। সকলের মনে পড়ল সেই ভাল গান শোনবার পর শান্ত সকরুণ হাসি। রস-উপভোগের সময় অন্যান্য ব্যক্তির ব্যবহারে বৈলক্ষণ্যটাই চোখে পড়ে, অস্বাভাবিকতাই প্রকাশ পায়, কিন্তু সুন্দরের পরিচয়ে তিনি অন্তরের অক্ষুন্ন পূর্ণতায়, অভিন্ন প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন

করতেন। তাঁর উপভোগ তাঁর অখণ্ডতারই বিকাশ। অমন শ্রোতা কোথায় কে পাবে? গান শুনে অবিমিশ্র আনন্দ উপভোগের দিন আমার চলে গেল।

তাঁর নিজের গান আসরে ভাল গাইতে পারতেন না। সভায় অতি সহজেই নিজের উপর বিশ্বাস হারাতেন, মূল সুর খুঁজে পেতেন না। ছোট আসরেই তাঁর গলা খুলত, সবচেয়ে ভাল শোনাত গুন-গুন করে গাইবার সময়। হাতে গোলাপ-কাটা কাঁচি নিয়ে, ড্রেসিং গাউন পরে বাগানে বেড়াচ্ছেন, গানের আধখানা চরণের গুঞ্জন-ধ্বনি হচ্ছে, এমন সময় গিয়ে পড়েছি। 'নতুন বুঝি?' 'এই যে! এস, কোথায় যে থাক?' 'নতুন বুঝি? কবে হল?' 'হয়নি এখনও,' 'শোনান,' 'শুনবে?' 'এখুনি।' তারপর গলার জড়তা ভেঙে আস্তে আস্তে গাওয়া। 'ভাল হয়েছে?' 'আরো আছে নাকি?' 'এই সেদিন একটা কেসে মফঃস্বলে গিয়েছিলাম—নদীর ধারে একটা বাংলোতে থাকতে দিলে, তাই থাকতে পারলাম না না-লিখে।' 'মক্কেলে টাকা দিলে?' 'দিলে,' 'নেই বুঝি?' তারপর ছোট ছেলের মত হাসতে হাসতে দোষ-স্বীকার। বাগান থেকে বৈঠকখানায় গিয়ে বসতাম, অফিস ঘর থেকে উাকলের ডায়রি নিয়ে আসতেন, তারই পাতা থেকে গানের খসড়া বেরোত। শুনতাম, চলে আসতে ইচ্ছে হত না, যখন আসতে হত, তখন মন আমার ভরে থাকত।

তাঁর গান গাওয়ার মধ্যে একটি কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে। সেটি হল, অবসর। আরম্ভ করবার পূর্বেই গানকে অবসব দিতেন, চোখ বুজে, নীরবে জমি তৈরি করতেন, কালো ভেলভেটের উপর কামদানীর কাজ; আগ্রহে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করতাম। গান গাইবার সময়ে প্রত্যেক কথাকে অবসর দিতেন, বাক্যের সঙ্গে তার সম্বন্ধটি উপলব্ধি করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হতাম। নীরবতার আশ্রয়ে গানটি মিলিয়ে যেত, যেন মায়েব কোলে ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে—আমরা নীরব হয়ে রস উপলব্ধি করতাম। তাঁর গান গাওয়া ছিল নিভৃতির কম্প্র রূপচ্ছটা, বাক্ হত সম্ভ্রমের সংযত কুশলতা। এই বিরাম কি তাঁর বিশ্রামবিহীন জীবনেরই ক্ষতিপূরণ? কে তাঁর জীবনের মর্মকথা বুঝে তাঁর গান গাইবে? করুণায় মৃদুল, অন্তরেরই ভাব-সম্পদে অন্তর্মুখী যে নয়, সে যেন তাঁর গান না গায়।

তাঁর সঙ্গে সাহিত্যের সূত্রেও বাঁধা পড়ি। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের মহাভক্ত। কবির কবিতা শুনতে পেলে আর কিছু চাইতেন না। বলতেন, 'লিখতে লজ্জা হয়, ইচ্ছে হয় কেবলই পড়ি, কিন্তু হঠাৎ কেমন হাত কিরকম করে ওঠে।' রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও অন্য কবির রচনা পড়তে তিনি খুবই

ভালবাসতেন। তাঁর রুচি ছিল নিতান্ত উদার। সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি না থাকলে ঐপ্রকার সার্বভৌমিকতা লাভ করা যায় না। তুলসীদাস ও কবীরের দোঁহা, মীরাবাঈ-এর ভজন তাঁর নিতান্তই প্রিয় ছিল। কিন্তু সাতরাজার ধন মানিক তাঁর নিজের ভাষা, বাংলা ভাষা। সংগীত ও কবিতা রচনা ছাড়া অন্য কি কি উপায়ে তিনি বাংলা ভাষাকে সাহায্য করেছেন এ-অঞ্চলের কোনো প্রবাসী বাঙালির অবিদিত নেই। 'উত্তরা'র জন্য, উত্তর ভারতের প্রবাসী বাঙালির সাহিত্য-অনুষ্ঠানের জন্য, এ-অঞ্চলের প্রত্যেক বাংলা বিদ্যালয়ের জন্য তিনি যে হাজার হাজার টাকা দান করেছিলেন সে কেবল সাহিত্যের প্রতি গভীর ভালবাসারই প্রেরণায়।

'উত্তরা' তাঁরই মানস-সন্তান। তিনিই প্রথমে বলেন কাগজ বার করতে হবে। রাধাকমলবাবু এবং প্রবাসী বাঙালি প্রত্যেকেই তাঁর প্রস্তাব সোৎসাহে গ্রহণ করে। প্রথম সংখ্যা বেরোল, তারপর সব উৎসাহেরই প্রকৃতি অনুসারে এ উৎসাহেও ভাঁটা পড়ল। অন্য শহর থেকে টাকা এল, কিন্তু তাঁর দুরাশা পূরণের উপযুক্ত নয়। 'লাগে টাকা দেবে অতুল সেন।' তিনি টাকা দিলেন; কত, আমি জানি। দেবার সময় রাগের ভান করে বললেন, 'টাকা আমি আর দিতে পারব না।' শুনে প্রত্যেকেই হেসেছিলাম। তাঁর রাগ দেখতে বড় ভাল লাগত। কতবার যে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই—'অমুক লোকটা আমাকে ঠকিয়েছে হে, ওকে আর এক পয়সা দেব না।' তখনি বুঝেছি আরো পাঁচশ টাকা গেল। যখনই রাগ দেখেছি তখনই আমরা বলাবলি করতাম, 'ইতিপূর্বেই মন নরম হয়েছে, তাই নিজের দুর্বলতা লুকোতে ব্যস্ত।' সে যাই হোক— উত্তরার জন্য প্রথমবার, দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার টাকা দিলেন। কিন্তু একটা কথা না বলে থাকতে পারছি না—উত্তরার প্রতি মমতার সঙ্গে সুরেশ চক্রবর্তীর উপর স্নেহ মিশে গিয়েছিল। তিনি সুরেশকে আন্তরিক স্নেহ করতেন।

অনেক সাহিত্যিকের মতে, উত্তরা একখানি ভাল কাগজ—দু-চারজন নামজাদা সাহিত্যিকের মুখে এ-ও শুনেছি যে উত্তরাই একমাত্র সাহিত্য-পত্রিকা। তাঁকে এই খবর শুনিয়েছি। শুনে তাঁর মুখে হাসি এসেছে আর একটু তোৎলামি করে, আধখানা ভাষায় আনন্দ প্রকাশ করেছেন…'বেশ বেশ বেশ, লেখ, লেখ…আচ্ছা করে লেখ দেখিনি,' 'অতুলদা, আপনি 'মুশেয়ারা'র মতন আর একটা প্রবন্ধ লিখুন,' 'তাই—তাইত। কখন লিখি বল? এরা যে ছাড়ে না। তোমরা সব লেখ।' 'অতুলদা—আমরা সকলেই লিখছি কিন্তু আমাদের

লেখাটাই উত্তরার সর্বস্ব নয়,' 'আমি ভাই কবিতা দিতে পারি—তাও সময় কই?' সময় পেলেই তিনি কবিতা ও গান লিখতেন, আর সেই কবিতা ও গান উত্তরার জন্যই প্রধানত লেখা হত। অন্যান্য পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হত বটে, কিন্তু তাঁর ইদানিংকার শ্রেষ্ঠ রচনা সব উত্তরারই জন্য। যখন টাকা দেবার দরকার হত না, যখন লেখা দিতে পারতেন না তখনও উত্তরার কল্যাণের জন্য চিন্তা করতেন। উত্তরার আজ যে প্রতিপত্তি হয়েছে সে কেবল তাঁরই কামনায়। সুরেশের বাহাদুরী আছে স্বীকার করি, কিন্তু তাঁর আন্তরিক শুভেচ্ছা না থাকলে সুরেশকে অন্য পত্রিকায় চাকরি নিতে হত।

প্রবাসী বাঙালিদের সাহিত্য-সভায় যোগ দেওয়া ছিল তাঁর নেশা। তাঁর সঙ্গে একাধিক সভায় যোগ দিয়েছি। তাঁর উপস্থিতিতে রসের ফোয়ারা খুলে যেত। গান আর গান, গান আর গান। কানপুরে রাত্রি দুটো পর্যন্ত গাইলেন—দিল্লিতে জয়ন্তী উৎসবে রাত বারটা পর্যন্ত, শেষকালে জোর করে গাড়ি পাঠালাম। গোরখপুর, নাগপুর, কাশী সর্বত্রই তিনি গিয়েছেন—সকলকে মুগ্ধ করে এসেছেন —কেবল সৌজন্যে নয়, সাহিত্য-প্রীতির সংক্রমণে।

অমন রসিক সুজন দুর্লভ। রসই তাঁকে সংহিত করেছিল। রসের মর্যাদা তিনি দিতে জানতেন। পর্ণকুটিরে ভৈরবীর ঠুংরী শুনতে গিয়েছি তাঁর সঙ্গে। বৃদ্ধ ওস্তাদ কেঁপে অস্থির—সেন সাহেবকে কোথায় বসাবে? সেই ছেঁড়া ভাঙা খাটিয়ার উপর বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান শুনলেন —বেলা বারোটা হল—ওস্তাদের ছেলের হাতে দু'খানা নোট গুঁজে দিলেন আর 'কিসি রোজ্ তস্‌রিফ' নিয়ে আসতে অনুরোধ করলেন। লখনৌয়ে একজন পাগলি আছে, রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, এককালে বিখ্যাত গায়িকা ছিল। এখনও অদ্ভুত টোড়ি আর ভৈরবী গায়। অতুলদা শুনেই সংবাদদাতাকে পাঁচ টাকা দিলেন, 'তাকে নিয়ে এস, নিয়ে এস'। সেদিন তাকে পাওয়া গেল না। টাকা ফেরৎ দিবার সময় তিনি বললেন, 'ওতো, তো···তোমার কাছেই থাক, যখন খুঁজে পাবে ধরে এন।' বুঝলাম, এটা হয় সুখবরের পুরস্কার, রাজকুমারের গজমোতির মালা দান, নাহয় সংবাদ-দাতাকে সাহায্য। যে খবর দিয়েছিল সে ছিল বিদেশী সংগীত-শিক্ষার্থী। ছোট মুন্নে ওয়াজিদ আলি শা-র দরবারের শেষ গায়ক। এসে জুটেছিল অতুল সেনের বৈঠকখানায়। তালিব হুসেন লখনৌয়ের শেষ বিখ্যাত শানাইয়া—কৈসারবাগে থাকতে ভোরবেলা ভৈরোঁ আর টোড়ি বাজাত দূর

থেকে, অতুল সেন ঘুম থেকে সুর শুনতে শুনতে উঠতেন। 'ইয়সুফের সেতারে মিঠে হাত, রাখলে হয় না?' তাকেই রাখলেন। বরকতের ছড়ির টান ভাল—'নিয়ে এস তাকে'। 'কদরদান্' বলতে লখনৌয়ের লোকে ঠিক কি বোঝে জানি না—তবে আমি অতুলপ্রসাদকেই বুঝতাম। বাংলাদেশ নবাব ওয়াজিদ আলি শা-র মারফৎ লখনৌয়ের কাছে চিরঋণী, কিন্তু অতুলপ্রসাদকে লখনৌয়ে প্রবাসী করে লখনৌ সে ঋণের প্রতিশোধ করেছে। অমন দরদী না হলে কেউ অমন দরদ দিতে পারে!

সোজা কথা এই, তাঁর কীর্তি অক্ষুণ্ণ রাখা যাবে না, কেননা আমরা উপযুক্ত নই। তাঁর কীর্তি থাকবে তাঁর গানে। সেইজন্যই যে গানই তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি এ বলতে আমি তৎপর নই। তাঁর কীর্তির অপেক্ষাও তিনি ছিলেন মহান—এই আমার ধারণা।

এই ধারণাটি ধারণ করে তার গানের আলোচনা করা উচিত। আমি এখন তাঁর সমগ্রতা অনুভব করছি। অতএব তাঁর সংগীত সম্বন্ধে বিচার করতে অপারগ

কবি ও কর্মী অতুলপ্রসাদ

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়ের ব্যক্তিত্ব উদার ও বিশাল ছিল। তিনি যেমন বাঙালির, তেমনি লখনৌবাসীরও নেতা ছিলেন। এদেশবাসীর সঙ্গে নিবিড় সামাজিক প্রীতির নিগড়ে তিনি যাবজ্জীবন আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহার রাজনীতিও বাঙালিব রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন। তিনি ছিলেন উদার, লিবারাল। মনোমোহন ঘোষের মত গোখেলও ছিলেন তাঁহার রাজনৈতিক গুরু। বাঙালিব প্রাদেশিকতা ভুলিয়া তিনি কি রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে, কি সামাজিক ক্ষেত্রে একটা সমগ্র আদর্শ অনুধাবন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি এদেশের জননায়কত্বের পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবন এদেশবাসীর কৃষ্টি, রাষ্ট্র ও সমাজনীতির সহিত একটা মিলন-গ্রন্থি ছিল। বাঙালিব ব্যাপকতর জীবনের এই প্রতিভূ অতুলপ্রসাদ সেনের সমগ্র জীবনের দান ও ত্যাগধর্ম ও তাঁহার পরিশীলনের প্রসারতা আমাদিগকে সংকীর্ণতা হইতে অনেকটা রক্ষা করিবে সন্দেহ নাই।

১৮৭১ সালে ঢাকা শহরে ডা॰ রামপ্রসাদ সেন মহাশয়ের পুত্র অতুলপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ডা॰ সেনের সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ ছিল। শিশু অতুলপ্রসাদ বাড়িতে অহরহ তাঁহার সুললিত সংস্কৃতকাব্য আবৃত্তি শুনিতেন। তখন হইতেই একটা ছন্দের নেশা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। এদিকে তাঁহার দাদামহাশয় কালীনারায়ণ গুপ্তের প্রভাব তাঁহার উপর কম হয় নাই। তিনি সে সময়কার একজন প্রসিদ্ধ বাউল গান রচয়িতা ছিলেন। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় যে নিজেকে বাংলা সাহিত্যে বাউল বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন সত্যই ইহাতে তাঁহার উত্তরাধিকার।

স্কুল ছাড়িয়া অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং আঠার বৎসর বয়সে তিনি বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়িতে যান। ইংলণ্ডে অরবিন্দ ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ, লোকেন পালিত, চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় প্রভৃতির সঙ্গে তাঁহার দেশী-বিলাতি কাব্যের রসাস্বাদনে দিন কাটিত। বিখ্যাত ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয় তখন বিলাতে কাব্য-রচনায় খ্যাতিলাভ করিতেছিলেন। সে সময় আরভিঙের শেক্সপীয়রের নাটকগুলির অভিনয় বিলাতে এক আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল। অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় বহুদিন ধরিয়া পাশ্চাত্ত্য নাট্যকলারও সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য উপভোগ করিতেছিলেন। বিলাতে চিত্রকলার চর্চাও তিনি কিছুদিন অধ্যবসায়েব সহিত করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ, রসাবিষ্ট প্রবন্ধ ইংলণ্ডে পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধে প্রথম তাঁহাব দেশীয় সংগীতের স্বতন্ত্র ধারা সম্বন্ধে মত পরিস্ফুট হইয়াছিল।

অথচ নেপলস বন্দরে যখন জাহাজ থামিয়াছে তখন গণ্ডোলা-বিহারী ভিখারিদিগের মুখে ফাউস্টের গান শুনিয়া তিনি ভাঙা ইটালিয় সুরে নূতন গান রচনা করিয়াছিলেন। যে-গানে বাংলার গান-রচনায় একরকম প্রথম দেশী বিদেশী সুরের মিশ্রণ ঘটিয়াছিল, সেই গানটি হইতেছে—

> উঠগো, ভাবতলক্ষ্মী, উঠ আদি জগত-জন-পূজ্যা,
> দুঃখ দৈন্য সব নাশি কব দূরিত ভাবত-লজ্জা।
> ছাড়ো গো ছাড়ো শোকশয্যা, কবো সজ্জা
> পুনঃ কমল-কনক-ধন-ধান্যে!

১৮৯৫ সালে তিনি দেশে ফিবেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি আরম্ভ করেন। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গগনেন্দ্র ঠাকুর, সুরেশ সমাজপতি, লোকেন্দ্র পালিত, নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি মিলিয়া একটা মধুচক্র রচনা করিয়াছিলেন। সে-বৈঠকটির নাম ছিল 'খামখেয়ালী সভা'। সেখানে অতুলপ্রসাদ সেন তাঁহার অনেক নূতন রচিত গান গাহিতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আযৌবন বন্ধুত্ব তাঁহার সাহিত্য-সাধনার কম সম্পদ ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান অতুলপ্রসাদ এতই ভালো গাহিতেন যে, রবীন্দ্রনাথ এই আসরে তাঁহার নামকরণ করিয়াছিলেন 'নন্দলাল', যে 'নন্দলাল একদা করিল একটা ভীষণ পণ।'

এই যুগে ক্রমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের প্রভাব এতই বেশি হইয়াছিল যে, অতুলপ্রসাদ সেনের অনেক সুললিত গান রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়াই লোকে গাহিত। অতুলপ্রসাদও সাত বৎসর পরে তখন প্রবাসী হইলেন। সুদূর প্রবাসে তাঁহার কাব্য ও গানে নিবিড় রসসঞ্চার হইতে লাগিল। উত্তর ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতা হইতে অনেক পরিমাণে স্বতন্ত্র। যে উদার প্রাণে অতুলপ্রসাদ সেন এদেশের সামাজিক মিষ্টালাপে আপনাকে ঢালিয়া দিয়া এদেশবাসীর সহিত নিবিড় আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার কবি-জীবনের রসপ্রেরণা হইয়াছিল। অতুলপ্রসাদ সেন যেমন তুলসীদাস ও কবীরের ভাব ও সাহিত্যে মাতিয়া গেলেন, তেমনই মুসলমানের গীতিকবিতাও তাঁহাকে বিশেষ মুগ্ধ করিয়াছিল। তাই বাঙালি কবির পদাবলী উত্তর ভারতে একটা নূতন ছাঁদ পাইয়াছে যাহা বাংলা সাহিত্যে একেবারে নূতন জিনিস। যে-দেশে তুলসীদাস কবি, সেখানে সাহিত্য সার্বজনীন। সাহিত্যিক বলিয়া নূতন কোনো জীব এদেশে দেখা দেয় নাই, কারণ সাহিত্যে সকলের সমান অধিকার, সাহিত্যের অনুভূতি সহজ সরল লৌকিক অনুভূতি। কবি অতুলপ্রসাদ সেন তাই কবি হইয়াও নিজের সঙ্গে অপরের কোনো ব্যবধান সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহার কবিতার সহজ লৌকিক আবেদন ও তাঁহার সরল ভাব-প্রকাশের মূল সূত্র এইখানে। যে-সমাজে তিনি কবি সে-সমাজে গায়ক, দোঁহা ও গজল রচয়িতার ভাব-প্রকাশ বাংলাদেশ অপেক্ষা উদারতর ও আভিজাত্যহীন বলিয়া তাঁহার গান ও ছন্দ বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে এমনকি নিরক্ষর, অশিক্ষিতকেও এত আকৃষ্ট করিয়াছে।

উর্দু ভাব ও সাহিত্য তাহার গান ও ছন্দকেও কম ভূষিত করে নাই। তাঁহার গানে ও ছন্দে আছে আরব মরুভূমির তৃষ্ণার জ্বালা, অপরদিকে আছে একটা কঠোর বৈরাগ্য। একদিকে আছে ওয়েসিসের ভোগের চঞ্চল-চরণ-ভঙ্গ, অপরদিকে মায়া-মরীচিকার পরপারে চিরশান্তি। প্রকৃতি ও জীবন তাঁহাকে যত দান করিয়াছিল তাহাদের সম্পদ, তাহা অপেক্ষা তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছিল অধিক—মরুজীবনের বিফলতা আনিয়া দিয়া, তৃষ্ণার জলের পরিবর্তে গরলের পেয়ালা বারবার তাঁহার শুষ্ক ওষ্ঠপুটে ধরিয়া

পেমনীরে ভরি আশার কলস

কত-না যতনে সেচিনু প্রাণ।

ফুলদল আসি কহে পরিহাসি
'কোথায়, তব বঁধু কোথায় ?'

কিন্তু জীবনের এই নিদারুণ পরিহাস তাঁহার অন্তরকে তিক্ত না করিয়া বরং মধুর স্নিগ্ধ ও কোমল করিয়াছিল। কবি স্বল্পভাষী ছিলেন। উর্দু-মার্শিয়া ও গজল গানের মর্মন্তুদ দুঃখের আড়ালে একটা সহজ বিশ্বাস যেমন তাঁহাকে মুগ্ধ করিত তেমনিই তাহাদের সহজ প্রকাশভঙ্গিও তিনি আপনার রচনায় আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। গীতিকবিতার এ-ছাঁদ বাংলায় আর নাই। এমন ছন্দেরও বৈচিত্র্য নাই। শুধু ছন্দের দিক হইতে

বাদল ঝুম ঝুম বোলে
না জানি কি বলে।
বুঝিতে পারি না কথা,
তবু নয়ন উছলে।
কাহার নূপুর ধ্বনি
শুনাইছে আগমনী ?
বিরহী পরান তারে যাচে ;
আশা-ময়ূর পুছ মেলি নাচে ;
রাখিব পরানখানি তার চরণতলে।

অথবা

ঝরিছে ঝর-ঝর গরজে গর গর
স্বনিছে সর সর শ্রাবণ মাঃ।

এই গানগুলির সুর বাঙালির প্রাণকে কাড়িয়া লইয়াছে তাহাদের গতির চঞ্চলতা ও কমনীয়তার জন্য। কিন্তু বাংলার গ্রামে ও শহরে এই গানগুলি গাহিতে গাহিতে দূর ভবিষ্যতে কবে কোন বাঙালি মনে করিবে টেরাইয়ের সেই নিঝুম, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির রাত্রি, উদাস কবি যখন বারেইচের ডাক-বাংলার বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বর্ষাপ্রকৃতির বিরহবেদন ভোগ করিতেন, অন্তর-বাহির দুই ভরিয়া একটা ঘন অন্ধকার দামিনীর গুরু ভাষে যখন তাঁহাকে অসীমের প্রেম-সম্ভাষণ জানাইত ? তেমনই

চাঁদনীরাতে কে গো আসিলে···

বাংলা অপেক্ষা উত্তর ভারতের তীব্রতর জ্যোৎস্নারাত্রির রূপালি ছটা এই গানে নূতন ছন্দের সমাবেশ আনিয়াছিল। বাস্তবিক উত্তর ভারতের লৌকিক হোলি,

কাজরী, চৈতী, সাওয়নী, লাউনী, ভজন, রামায়ণী ও গজলের সুর তাঁহার অন্তরে নিগূঢ়ভাবে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল। ইহাদের ছন্দ ও তাল অতুলপ্রসাদের গীতিকবিতায় ললিত নূতন রূপ পাইয়াছে। এই সংযোজনাতেই তাঁহার প্রতিভার কৃতিত্ব। বলা বাহুল্য, দিলীপকুমার রায়, সাহানা দেবী ও কনক দাস তাঁহার নিকট হইতে গান লইয়া বাংলাদেশকে তাঁহার সুর ও তালের সহিত নিবিড় পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু বাংলাদেশে তাঁহার গান অনেক সময়ই পরিবর্তিত, এমনকি বিকৃত হইয়াও গীত হয়।

কিন্তু সুর ও তালের আবেদন অপেক্ষা তাঁহার গীতিকবিতার আকর্ষণ হইতেছে তাঁহার নিদারুণ ব্যথা, শেলীর সেই নির্দেশ Our Sweetest Songs are those that tell of Saddest thoughts। জীবনমরুতে তাঁহার গানগুলি যেন বসরার গোলাপ, কাকটাস-বনের রক্তকুসুম। কাঁটার বনে বৈরাগী একতারা লইয়া যখন ব্যথাভরা গান গায়

সুরভি পবন মোরে ঘুরাইছে মিছে ঘোরে—
শুধু কি ফুটাও কাঁটা, ফুটাও না কি মুকুল?

তখন যিনি ব্যথার ব্যথী তিনি চরণের ব্যথা দূর করিয়া অন্তর কুসুমের গন্ধে ভরপূর করিয়া দেন। এই যে আমাদের বাউল, অতুলপ্রসাদ, যাঁহার 'অন্তরে মোর বৈরাগী গায় তাইরে নাইরে নাইরে না', তিনি কিন্তু বাংলা দেশের মতো বাউল নহেন। তিনি যেন উত্তর ভারতের পল্লীবাটের দরবেশ। উত্তর ভারতের মাঠে মাঠে শিমূল-পলাশের রক্তিম শোভা তাঁহার হৃদয়কে রাঙিয়া দিয়াছে। রাজপুতানার মার্তণ্ড-পীড়িত ধূসর মাঠ তাঁহার হৃদয়কে বিদগ্ধ করিয়াছে। যমুনার দুকূল প্লাবন কত প্রেমে কত গানে এই দরবেশকে টানিয়াছে। গঙ্গা-সরযূর উদার শ্যামল অঙ্গে চৈত, কাজরী, ঝুলন ও হোলি উৎসব ঋতুপর্যায়ে তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে। বিন্ধ্যগিরির পর্বতগাত্রে ও রামগড়ের উপত্যকায় যে বীর্য ও স্বাধীনতা প্রতিধ্বনিত হইতেছে তাহাও তিনি শুনিয়াছেন। সেই স্বাধীনতার দুঃসাহসের গান আজ কলিকাতার হাজার করপোরেশন স্কুলে, ছাত্রদের মুখে প্রতিধ্বনিত 'বলো, বলো, বলো সবে, শত-বীণা-বেণু-রবে, ভারত আবার জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।' কিন্তু এই দরবেশের গানের উন্মাদনা একটানা দুঃখ হইলেও তিনি গানগুলি বাজাইয়াছেন ভাষার সূক্ষ্ম চুমকির কাজে, সুর ও ছন্দের লীলাবৈচিত্র্যে। এদেশের ঘরে ঘরেই যে সুন্দর কারুশিল্প। উত্তর ভারতের পল্লীবধূর কেশবিন্যাসে

ও নানা বর্ণবিভূষণে, তাহার চিকণের শোভন বয়নে যে-সুষমা তাহার অন্তরের আনন্দকে প্রকাশ করিতেছে তাহাই এই দরবেশ আপনার গানে ধরিয়াছেন। তাই তাঁহার এক-একটি গান যেন গেরুয়া জমিনের উপর চিকনের কাজ করা এক-একখানি রুমালের মত। দুঃখময় ভগবানের দিকে বিপদের ঝটিকায় উদ্বেল হইয়া তাঁহার গানগুলি কত-না লীলাতরঙ্গে ভাসিয়া চলিয়া যায়।

কিন্তু আজ আমরা এই প্রসঙ্গে অতুলপ্রসাদ সেনের গান ও কবিতার আর আলোচনা করিব না। শুধু প্রবাস নহে, বাংলাদেশ হইতেও তাঁহার গীতি-কবিতার যথোচিত সমাদর আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে থাকিব। তাহা ছাড়া আমরা যাঁহাকে হারাইয়াছি তিনি শুধু যদি কবিই হইতেন, তাহা হইলে আমাদের শোক এত আন্তরিক ও দুবহ হইত না। তিনি আমাদের প্রবাসী সমাজের নায়ক ছিলেন। আজীবন তিনি বাঙালি ইয়ংমেনস্ অ্যাসোসিয়েশনের ও বেঙ্গলি ক্লাবেরও সভাপতি ছিলেন। সামাজিক হিসাবে তিনি লখনৌ-বাসী বাঙালির সঙ্গে এত নিবিড়ভাবে মিশিতেন যে, প্রত্যেক বাঙালি তাহার মৃত্যুতে ব্যক্তিগত শোক অনুভব করিতেছে। সেদিনকার বিরাট বিষাদযাত্রায় কি ধনী, কি দরিদ্র, কি বাঙালি, কি অবাঙালি যে-শোকে তাঁহার শবানুগমন করিয়াছে তাহাও তাঁহার জনপ্রিয়তার নিদর্শন। তিনি প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের একজন জন্মদাতা। উহার প্রথম অধিবেশন কানপুরে এবং গত অধিবেশন গোরক্ষপুরে সভাপতি হইয়া তিনি প্রবাসী বাঙালির সংহতির উপদেশ দেন। এমন কোনো বাঙালি অনুষ্ঠান এ-প্রদেশে নাই যাহা তাঁহার নিকট ঋণী নহে। তাঁহার দান কিন্তু জাতিধর্মনির্বিশেষ ছিল। তিনি বহুকাল ধরিয়া অযোধ্যা সেবাসমিতির সভাপতি ছিলেন এবং নানা লোকহিতকর কার্যে তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিয়াছিলেন। অস্পৃশ্যতা-নিবারণ-আন্দোলনেও তিনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আমি তাঁহাকে অনেকবার চামার বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে দেখিয়াছি। এ-সকল বিষয়ে বিশেষত পল্লীর সংস্কারে তাহার অদম্য উৎসাহ ছিল। গোখেল ভ্রাতৃসংঘের তিনি সভাপতি ছিলেন। দূর পথ অতিক্রম করিয়া তিনি গ্রামে গ্রামে কৃষকগণের নিকট দেশের বাণী পৌঁছাইয়া দিতেন। কবি ও ভাবুক হইয়াও তিনি একজন অধ্যবসায়ী কর্মী ছিলেন। লোকশিক্ষা প্রচার, পল্লীগঠন, অস্পৃশ্যতা-নিবারণ, দুর্ভিক্ষ, বন্যা বা প্লাবন পীড়িতের জন্য কল্যাণকর্ম—সব উদ্যোগে সর্বদাই অগ্রণী হইয়া তিনি দেশের লোককে আহ্বান করিতে জানিতেন। সে আহ্বান এদেশবাসী শুনিত। তিনি

রাজনীতিতে গঠনবাদী ছিলেন এবং দুইবার যুক্তপ্রদেশের প্রাদেশিক উদারনৈতিক সম্মিলনের সভাপতি হইয়া গঠনের দিকের প্রতিই বিশেষ জোর দিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষ তাঁহাকে রাজনৈতিক নেতা বলিয়া চিনে কিন্তু তিনি যে গান রচনা করিয়া অমর হইয়াছেন এ-খবর বাংলার বাহিরে অবিদিত। লিবারাল নেতা হইয়াও তাঁহার এমন বহুদর্শিতা, সাহস ও ত্যাগ ছিল যাহা পুরাতন নেতাশ্রেণীর মধ্যে বিরল। তিনি আপনা ভুলিয়া দান করিতে জানিতেন। বাস্তবিক তাঁহার স্বাভাবিক, অভ্যাসগত দানধর্মের ব্যত্যয় পাছে ঘটে এইজন্য নীরোগ না হওয়া সত্ত্বেও অর্থোপার্জন তাঁহার মৃত্যুরও প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। মৃত্যুর পর তিনি যে-দানপত্র রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতেও তাঁহার উদারতা, জাতীয়তা, ও নিঃস্বার্থ দান প্রকাশ পাইয়াছে। এমন একটি সুরসিক অথচ বৈরাগী, ভাবুক অথচ কর্মপ্রাণ, উদার অথচ সাহসী, ক্ষমতাশীল অথচ মৃদুকুসুম লোক পৃথিবীতে বিরল। এই মৃদুকুসুম লোকটির অন্তর হইতে তাঁহার মৃত্যুর পর যে-সুবাস ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহা আমাদের প্রবাস-জীবনকে ধন্য করিবে। যিনি গন্ধ বিতরণ করিয়া গেলেন তাঁহার জীবনের যে সার্থকতাই এই অযাচিত, অফুরন্ত দানে। তিনি নিজেই গাহিয়াছেন:

[illegible]
[illegible]

১৩৪১

তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গন্ধ চলে যায়, হায়, বন্ধ নাহি থাকে,
ফুল তারে মাথা নাড়ি ফিরে ফিরে ডাকে।
বায়ু বলে—যাহা গেল সেই গন্ধ তব,
যেটুকু না দিবে তারে গন্ধ নাহি কব।

অতুলপ্রসাদ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আর সেই দীর্ঘ ঋজু সুঠাম সৌম্য মূর্তি দেখতে পাব না: আর তাঁর সেই সরল সহাস সুমিষ্ট আলাপ শুনতে পাব না, সেই সহৃদয়তা ও উদারতার প্রত্যক্ষ প্রতীক হৃদয় মনকে আর চমকিত করবে না। ইহাই এ ধরণীর নির্মম নিয়ম।

এই সেদিনের কথা—এখনো বৎসর পূর্ণ হয়নি, অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি 'প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনে'র গোরক্ষপুর অধিবেশনে প্রধান সভাপতিরূপে যোগদান করেন এবং তাঁর সুন্দর অভিভাষণটি পাঠ করেন। তাতে বলেছিলেন,

> নিজেদের প্রবাসী বলতে আমি সংকোচবোধ করি। ভারতে বাস করে ভারতবাসী নিজেকে পরবাসী কি করে বলবে? সেটা বড্ড অশোভন। এদেশও আমাদেরি দেশ। এদেশেই আমরা অনেক ঘর বেঁধেছি। নানা কাজে এদেশেই নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি। এদেশের লোকদের বড় আপন মনে হয়, তাদের স্নেহ করি, তাদের স্নেহ পাই; তাদের সেবা করে আনন্দ পাই—কৃতার্থ হই; হয়ত এদেশেই ছাইটুকু রেখে যাব।

তাঁর এই শেষ কথাটি যে এত শীঘ্র সত্য হবে, তা তখন কে ভেবেছিল? কথাটির ব্যবহার যথাস্থানে সামঞ্জস্য বজায় রেখেই তিনি করেছিলেন, রেটরিক বা অলংকার হিসাবে ঠিক হলেও যেন তা স্বাভাবিক নয়, তাঁর শরীর ও মনের অবস্থা এই ভবিষ্যদ্‌বাণী তাঁর কলমের মুখে যুগিয়ে দিয়েছিল বলেই মনে হয়।

মানুষ যৌবনে কর্মক্ষেত্র, জীবনোপায়, পদপ্রতিষ্ঠা খুঁজতে, বিত্তার্জনে দেশ-বিদেশে বেরিয়ে পড়ে, উদ্দাম আশা-আকাঙ্ক্ষা তাকে সাহস দেয়, শক্তি যোগায়। সে সেখানে বাসা বাঁধে, দল বাঁধে—ক্লাব লাইব্রেরি থিয়েটার ফাঁদে, ক্রমে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্যে বিদ্যায়তন গড়ে তোলে, তার সকল উৎসাহ তখন সেই-মুখী হয়ে তাকে আনন্দে রাখে। দেশ, ঘরবাড়ি ক্রমে গৌণ হয়ে পড়ে। ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু বয়স যখন অস্তের দিকে হেলে পড়ে, তখন দেশ একে একে তার প্রাপ্য আদায় করতে থাকে—সেই ভিটা, সেই ঘর-বাড়ি, সেই পারিপার্শ্বিক, বাল্যের খেলাধুলা থেকে উৎসব-আনন্দ-বিচরণ স্থান, নদী-নালা, বৃদ্ধ কুলগাছটি পর্যন্ত চোখের সামনে ফুটতে থাকে—যেখানে কত কথা, কত গল্প, কত সরল সহজ ভালোবাসা, কত স্নেহ-স্পর্শ ছড়ানো আছে। সেই বিস্মৃত দিনের কত কথাই মধুর হয়ে উদয় হয়, তাদের ফিরে পাবার ইচ্ছা জাগায়, তাদের জন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলায়। যেন এখনো সেথা গেলে সে দেখতে পায়, সন্তানের শুভ-কামনায় পিতা-মাতার অনুষ্ঠিত হোমান্ত হবির বসুধারা, সেদিনের স্নেহধারা আজও দেয়ালের বুকে অশ্রুধারার মত ম্লান আভাসে তার তরে অপেক্ষা করে রয়েছে। এ-ও বোধ হয় স্বাভাবিক। একে কল্পনা বা বয়সের দুর্বলতা বলে উড়িয়ে দিতে পারি না।

অভিভাষণে কারণান্তর-চ্ছলে অতুলপ্রসাদ বলেন:

আমার সেই মিষ্টি দেশটি আমার চোখের সামনে, আমার প্রাণের সামনে আসতে লাগল। ভাল করে মনে হল আমি ভুলিনি, ভুলিনি আমার দেশমাতাকে যদিও প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর সে গ্রামখানিতে যাইনি। দূর দেশে থাকলে কি হবে, মার টান বড় টান।

প্রবাসী, চল রে দেশে চল,
আর কোথায় পাবি এমন হাওয়া, এমন গাঙের জল।
যখন ছিলি এতটুক
সেথাই পেলি মায়ের স্নেহ, ঘুম পাড়ানো বুক,
সেথাই পেলি সাথীর সনে বাল্যখেলার সুখ,
যৌবনেতে ফুটল সেথাই প্রাণের শতদল।
চল রে দেশে চল।

শুনে আমার প্রাণ চমকে উঠেছিল। এ তো কথা নয়, কবিতা নয়, এ যেন প্রাণের প্রতিধ্বনি শুনলুম। যৌবনে কবিরা অনেক কথাই লেখেন, তাতে ক্ষমতার পরিচয় থাকতে পারে—সে তো এমন সত্যের মর্মস্পর্শী সুর শোনায় না। প্রাণটা যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল।

সভাশেষে বললেন—'অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট চারুচন্দ্র দাস মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে কি?' 'না' বলায় বললেন 'আমি তাঁর বাড়িতেই আছি, চলুন না—দেখাটাও হয়ে যাবে। আমি আজই চলে যাব ভাবছি।' তাঁর ব্লাড-প্রেসার বেশ বেড়েছিল, তাঁকে একলা যেতে দেবার ইচ্ছাও আমার ছিল না, একত্রেই গেলুম। কবি কুমুদরঞ্জন ভায়াকেও সঙ্গে পেলুম।

'না আসাই আপনার উচিত ছিল' বলায় সহাস্যে বললেন—'উচিত তো অনেক কিছু থাকে, কটা পারলুম? ভদ্রলোকদের কথা দিয়েছিলুম যে।' সেখানে পৌঁছেও রেহাই নেই, একটি মহিলার অনুরোধে একটা গাইতেই হল! কাকেও ক্ষুণ্ণ করতে পারতেন না।

আর তিনি পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরে পাননি। অসুখ বাড়ায় চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় যান—বালিগঞ্জে কিছুদিন থাকেন। গত ফেব্রুয়ারি মাসে আমাকে কলকাতায় যেতে হয়। ভাগ্যক্রমে তাঁর সন্নিকটেই শ্রীযুক্ত ধূর্জটিপ্রসাদ ভায়ার বাড়িতে আশ্রয় পাই। তাঁর আবশ্যক আছে শুনে কাশী থেকে আমলকীর মোরব্বা নিয়ে যাই, দেখে তাঁর কি আনন্দ। তাঁকে দেখে আমার প্রাণ কিন্তু শিউরে ওঠে—দমে যায়। মুখে প্রাণ-জ্যোতি ম্লান। কথাও হল, হাসিও হল—প্রাণে কিন্তু বল পেলুম না। খাবার ব্যবস্থা শুনতে চাওয়ায়, হাসি টেনে বললেন—'ডারউইন লোকটা ঠিক ধরেছিল। দেখুন না, ফল খেয়ে বেশ আছি, একটু বল পেয়েছি, সকাল-বিকেল একটু বেড়াতে পারছি।'

বিদায় নিতে গিয়ে সেটা পেলুম একেবারে আলিঙ্গন-মধ্যে! কে জানত সেটা শেষ বিদায়। তিনি বোধ হয় জানতেন।

পাঁচ বছর পূর্বে ডাকেন, লখনৌ যাই। কবি তখন বরোদা যাবার পথে তাঁর অতিথি। সেই আনন্দের অংশ দেবার তরেই ডাক। সে পাঁচটা দিন জীবনে স্মরণীয় হয়ে রইল।

শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গাবে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে।...
নদী জলে পড়া আলোর মতন
ছুটে যা ঝলকে ঝলকে।

—লাইনগুলোর অর্থ উপলব্ধি করিয়ে দিলে।

সেই দিনগুলির ফাঁকে ফাঁকে অতুলপ্রসাদ বলে মানুষটিকে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। মুনশী, চাকর, ড্রাইভার, খানসামা সবাই পরিবারভুক্ত, স্বজন। তাঁর সামান্য অসুখে সবাই চঞ্চল, সবাই বিমর্ষ। তাদের কাছে শুনলুম—ধমকাতে জানেন না। এত দরদ, এত দয়া মা-বাপের কাছে পাইনি! কারোর দুঃখ দেখতে পারেন না, দু-চার টাকার কম দিতে দেখিনি। আর সব বড় বড় ত্যাগ ও গোপন সাহায্যের কথা গল্পের মতই ঠেকবে।

তিনি অভিভাষণ-মধ্যে যে বলেছেন—'এদেশের লোকদের বড় আপন মনে হয়, তাদের স্নেহ করি, তাদের স্নেহ পাই, তাদের সেবা করে আনন্দ পাই, কৃতার্থ হই' তারও সামান্য কিছু চোখে পড়ল। লখনৌ শহরে দুঃস্থ নবাব বংশ, অভিজাত বংশ বহু। তাদের কেহ পদব্রজে, কেহ মোটরে সকাল সন্ধ্যা যাতায়াত করেন, মামলা মকর্দমার জন্যে নয়, তাঁদের ভ্রাতৃবিরোধ, গৃহ-বিবাদ প্রভৃতি মিটিয়ে দেবার জন্যে। তাঁব কথায় সব মিটে যেত, তাঁর উপর তাঁদের এতটা বিশ্বাস ছিল। একজন হিন্দু বাঙালি কতটা সত্যনিষ্ঠ, সমদর্শী, চরিত্রবান, অভিন্নভাবাপন্ন ও ন্যায়নিষ্ঠ হলে ভিন্ন স্থানের মুসলমানেরা পর্যন্ত তাঁর উপর নির্ভর করে ও তাঁর কথা মেনে নেয়, সেটা ভাববার কথা! তাঁর স্থান অধিকার কববার মত বাঙালি আর কেহ এ প্রদেশে রইলেন কিনা জানি না।

কয়দিন সকল দিক বজায় রেখে একটু একান্ত হলেই তাঁকে নির্লিপ্ত বৈরাগীর মতই পেয়েছি। সে কী উদাস আত্মহারা নিবিষ্টতা।

তাই আমি একটি লেখার মধ্যে কোনো স্থানে লিখেছি—'লখনৌ গিয়ে একটি আদর্শ পুরুষ দেখে এসেছি।' তিনি আমার কাছে আদর্শ পুরুষই ছিলেন।

এই পুরুষই বঙ্গ-ভঙ্গের যুগে দেশ সম্বন্ধে সংগীত রচনা করে সহস্র সহস্র লোকের চিত্ত আকর্ষণ করেছিলেন, আজও যা সেদিনের সম্মান পেয়ে আসছে। পরে তিনি যেসব সংগীত রচনা করেন তার কতকগুলি মুখে মুখে কণ্ঠে কণ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে। কেহ তা রবীন্দ্রনাথের বলেই গ্রহণ করেন। যেমন—কাঙাল বলিয়া করিও না হেলা, আমি পথের ভিখারী নহি গো! শুনেছি কবি তা জানতে পেরে অতুলপ্রসাদকে নাকি নিজের নাম দিয়ে গীতগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে বলেন। তাতেই তাঁর 'কয়েকটি গান' বলে পুস্তকখানির প্রকাশ। গীতগুলির অন্তর থেকে কবিকে আবিষ্কার করতে বঙ্গ সুধী-সমাজের বিলম্ব হয়নি। সেগুলি সাগ্রহে সমাদরে গৃহীত হয়ে এখন বঙ্গের সর্বত্র গীত হচ্ছে ও প্রাপ্য সম্মান পাচ্ছে। পরে তাঁর অন্যান্য গীতিপুস্তকও প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যে খাটি বাংলা ভাষার

ও খাঁটি বাংলা ভাবের কবি সেটা বুঝতে কারোর বাকি নেই। বাঙালির কাছে তাঁর গানের মধ্যেই কবি অতুলপ্রসাদ অমর হয়ে থাকবেন। অন্য সকল কথা লোক ভুলে যেতে পারে—কেবল কবি অতুলপ্রসাদকে বাঙালি কোনোদিন ভুলবে না বলেই আমার বিশ্বাস। বাংলার মাটি আমাদের ভাবের ভিখারি, ভাবের পূজারী করে গড়েছে।

শুনেছি, যৌবনে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে তাঁর যাওয়া-আসা ছিল। বয়সে কনিষ্ঠ হলেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ স্নেহ ভালোবাসা তিনি পেয়েছিলেন এবং সে ভালোবাসা আজীবন অচ্ছেদ্য বর্তমান ছিল। আজ বেশ অনুমান করতে পারি, অতুলপ্রসাদের অভাব রবীন্দ্রনাথকে কতটা আঘাত দিলে। কাব্য-প্রেরণা সম্ভবত কবির সঙ্গই তাঁকে দিয়েছিল। কিন্তু গানে বা কাব্যে কোথাও অনুকরণের আভাস পর্যন্ত নেই। অতুলপ্রসাদ আজীবন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে গেছেন।

কাশী হতে 'প্রবাসজ্যোতি' পত্রিকা সম্পাদনকালে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'আ মরি বাংলা ভাষা' গীতটি পাই ও পাঠ করে মুগ্ধ হই এবং প্রকাশ করে ধন্য হই। পরে তাঁরই যত্নে 'উত্তরা'র জন্ম হয় এবং প্রধানত তাঁরই সম্পাদনায় ও সাহায্যে সে প্রচার ও পুষ্টিলাভ করে। তার প্রথম সংখ্যাতেই অতুলপ্রসাদের 'মিছে তুই ভাবিস মন' আর 'মনরে আমার তুই শুধু বেয়ে যা দাঁড়' এই গীত দুটি আমার অন্তর স্পর্শ করে আমাকে উদাস করে দিয়েছিল। এ তো সহজ অবস্থায় বেরোয় না, এ যেন অনাহত বাণী। লোকমাত্রকেই সান্ত্বনা দেয়।

বোধ করি তখনো তাঁর 'কয়েকটি গান' পুস্তকাকারে দেখা দেয়নি। এখন তা হাতের কাছে রয়েছে। অতুলপ্রসাদ তার মধ্যে দুর্লভ সম্পত্তি রেখে চলে গেলেন।

সাধক নিশ্চিন্ত হলেন।

তিনি নিজের সাধনালব্ধ এই দুর্লভ সম্পত্তি দেশকে দিয়ে গেছেন। এ শুধু গন্ধ বিতরণই করে না—পরমার্থ-প্রার্থীকে পথও দেখায়।

১৩৪১

অতুল

শ্রীসুবালা দেবী

ভক্ত তুলসীদাস নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,

> 'তুলসী! যব্ জগ্‌মে আযো, জগ্ হসে তুম রোয,
> এই সে কাম বন্ চলো কি তুম হসে জগ্ বোয।'

তুলসীদাসের এই বাণীতে পূর্ববঙ্গের ঢাকা নগরীতে একটি শিশুর জন্মকথা মনে পড়িল। এই শিশুটি আমার পরম পূজ্যপাদ পিতা স্বর্গত ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্তের সর্বপ্রথম দৌহিত্র। তাই এই শিশুর মুখদর্শনে সকল আত্মীয়-স্বজন ও দাদামহাশয়ের মনে আনন্দ আর ধরে না! ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শিশু দাদামহাশয়ের অঞ্চলের নিধি হইয়া উঠিল। তাহার সরলতা-মাখা পবিত্র মুখখানি দেখিয়া কেহ তাহাকে আদর না করিয়া থাকিতে পারিত না। দাদামহাশয় তাহাকে ভগবানের প্রসাদস্বরূপ পাইয়া তাহার নাম দিয়াছিলেন 'অতুলপ্রসাদ'। তাঁহার যত্ন ও সোহাগে এই শিশু বাড়িতে লাগিল। অত্যধিক আদরে শিশুর চরিত্র কোনোপ্রকার বিকৃত হয় নাই। তাহার আহার খেলা শোওয়া বসা সবই তাহার ঠাকুরদাদার সঙ্গে (অতুল তাঁহাকে ঠাকুরদাদা বলিয়াই ডাকিত)। তাই বাল্যেই দাদামহাশয়ের সকল সদ্‌গুণ তাহার চরিত্রে অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

আমাদের পিতৃদেবের পূত জীবন কাব্য সংগীত শিল্পকলা চিত্র ও হাস্যামোদে আনন্দময় ছিল। তিনি ছিলেন আনন্দের উপাসক; তাই এই সকলই তাঁহার ধর্মজীবনের অঙ্গীভূত ছিল। এই সকলের একত্র সমাবেশেই তিনি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম-জীবনের আদর্শ আমাদের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন। আনন্দোৎসবে ও শোকে দুঃখে সকল ঘটনাতেই তিনি সেই আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন করিতেন।

আমাদের অতুলেরও জীবন এমন আদর্শ জীবনের সহবাসে দিন দিন বিকশিত

হইতেছিল। বাল্যকাল হইতেই সংগীতে চিত্রে ও কাব্যে তাহার আশ্চর্য অনুরাগ ছিল। শুনিয়াছি, বাবা যখন উৎসবে নগর-সংকীর্তন লইয়া বাহির হইতেন এবং ভাবোন্মত্ত হইয়া কীর্তন করিতেন তখন পাঁচ বৎসরের শিশু অতুলপ্রসাদও করতাল-সহযোগে তাঁহার সহিত সংকীর্তনে উন্মত্ত হইত ও দুই চক্ষে জলধারা বহিয়া যাইত। এই দৃশ্য দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইতেন ও বালক ধ্রুব ও প্রহ্লাদের কথা স্মরণ করিতেন। তখন দাদামহাশয় তাহাকে কোলে লইয়া কত আদর ও আশীর্বাদ করিতেন। দাদামহাশয়ের আদর্শ জীবন আলোক-স্তম্ভরূপে চিরদিন তাহাকে জীবনপথে চালিত করিয়াছে।

বাল্যকাল হইতেই অতুল দানে মুক্তহস্ত ছিল। কাহারও দুঃখ-দারিদ্র্য দেখিলে সে অস্থির হইয়া পড়িত। কোনো ভিখারী তাহাব নিকট হইতে রিক্তহস্তে ফিরিতে পারিত না। মুষ্টি-ভিক্ষার স্থলে তাহার থলিটি পূর্ণ করিয়া বিদায় দিত। ইহা দেখিয়া আমার দিদি হাসিমুখে বলিতেন, 'অতুলের জন্য আমার ভিক্ষার চাউল সর্বদা ভাণ্ড ভরিয়া রাখিতে হয়। অল্প দিয়া তাহার প্রাণ কিছুতেই তৃপ্ত হয় না।'

আমি সম্পর্কে তাহার মাসী হইলেও তাহার বয়োকনিষ্ঠ ছিলাম। সেইজন্য বাল্যকালে অতুল আমার খেলার সাথী ছিল এবং আমরা একত্রে খেলাধুলা ও আনন্দে বর্ধিত হইয়াছি। তাহার সরল মিষ্ট স্বভাব সকলকেই আকৃষ্ট করিত। ছেলেবেলা হইতেই তাহার কবিতা লিখিবার অভ্যাস ছিল ও সংগীতে প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তালমানলয়-সহযোগে সুমিষ্ট কণ্ঠে গান গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করিত। অনুকরণ করিবার শক্তিও তাহার আশ্চর্য ছিল। তাহার সম-বয়সী ছোট মামার সঙ্গে একত্রে মিলিয়া সংগীত অনুকরণ ও হাস্যামোদে আমাদের গৃহ সর্বদা মুখরিত রাখিত। এইরূপে তাহার বাল্যকাল অতি সুখে ও আনন্দেই কাটিয়াছে। তাহার পর এগারো বৎসরে তাহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। এই সময় দাদামহাশয় তাহাকে আরো বুকে আঁকড়াইয়া ধরিলেন। তাহার মাতুলেরাও তাহাকে একদিনের তরে পিতার অভাব বুঝিতে দেন নাই। পাঠ্যাবস্থাতেই তাহার খুব বক্তা হইবার সাধ ছিল। যখন কলেজে পড়িত, অনেক সময় দেখিয়াছি ছাদে পায়চারি করিতে করিতে বিড় বিড় করিয়া কি বলিত। আমি হঠাৎ পিছন হইতে বলিতাম, 'কি করছ?' চমকিয়া বলিত, 'কিছু না, এক জায়গায় কিছু বলবার জন্য ছাত্রবন্ধুরা ধরেছে, তাই-যা বলব তাই অভ্যাস করছি।' পরবর্তী জীবনে তিনি যে সুবক্তা হইয়াছিলেন তা অনেকেই জানেন।

সেই সময়ে তাহার ইংলণ্ড যাইবার জন্য বড়ই আগ্রহ দেখা যাইত। আমার কাছে সমবয়সীর মত অনেক সময় মন খুলিয়া কথা বলিত। একদিন বলিল, 'আমার বিলাত যেতে এত ইচ্ছা হয় যে কি বলব। যদি কেউ চাকর করেও আমাকে সঙ্গে নিয়ে যায় আমি যেতে রাজী আছি।' পরে তাহার সে সাধ পূর্ণ হইয়াছিল। বিলাত হইতে ব্যারিস্টার হইয়া আসিলেন। সে-সময় কলিকাতায় কিছুদিন আমাদের সঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে তাঁহার খুব বন্ধুত্ব ছিল। এই সময় তিনি সর্বদা তাঁহার কাছে আসা যাওয়া করিতেন এবং তাঁহার রচিত গান তিনি অতুলপ্রসাদের মুখে শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া বলিতেন, 'আপনার মুখে আমার রচিত গান আরো সরস ও মিষ্ট শোনায়।' এই সময় দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী ও হাসির গানগুলি তাঁহার নিজের মুখে শুনিবার সুযোগ হইয়াছিল। দুজনে কী হাসির ফোয়ারাই তুলিতেন সেকথা স্মরণ করিয়া এখনও প্রাণে আনন্দ পাই।

তাহার পর তিনি রংপুরে কিছুদিন প্র্যাকটিস করেন। সেখান হইতে আবার বিলাত যাত্রা করেন। সেখানে তাঁহার একটি মুসলমান বন্ধু লখনৌ যাইয়া প্র্যাকটিস করিবার জন্য তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করেন এবং বলেন, 'আমি তোমার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। নিশ্চয়ই তোমার সেখানে ব্যবসায়ের উন্নতি হবে।' তাঁহার কথামতই তিনি ফিরিয়া আসিয়া লখনৌতে প্র্যাকটিস শুরু করিলেন। ভগবান কোন পথ দিয়া কেমন করিয়া কাহাকে লইয়া যান তাহা তিনিই জানেন। এই লখনৌ গমন ও বাসই তাঁহার জীবনের সর্বপ্রকার উন্নতির কারণ হইল। সেখানে আসিয়া তাঁহার জীবনের সকল দ্বার যেন মুক্ত হইয়া গেল। বাল্যে যে সদ্‌গুণগুলি চরিত্রে অঙ্কুরিত হইয়াছিল যৌবনে তাহা প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল এবং পরিণত জীবনে তাহা পূর্ণ বিকাশ লাভ করিল।

লখনৌ উচ্চাঙ্গের সংগীতচর্চার জন্য প্রসিদ্ধ। সেখানে গিয়া তাঁহার সংগীত-চর্চার বিশেষ সুযোগ ঘটিল এবং তাঁহার অন্তরের সংগীত নানা ভাবে ও নানা ছন্দে ও নব নব সুরে উচ্ছসিত হইতে লাগিল। তাঁহার কণ্ঠে এক উন্মাদনা-শক্তি ছিল। তাঁহার সুকণ্ঠে তাঁহার রচিত সংগীত যখন গীত হইত তখন মুখে এক স্বর্গীয় ভাব প্রকাশ পাইত। একথা আমি অতিরঞ্জিত করিয়া বলিতেছি না—যে-কেহ তাহা শ্রবণ করিয়াছেন তিনি তাহার সাক্ষ্য দিবেন। তাঁহার সংগীতের ভাষা সরল ও হৃদয়স্পর্শী। কি ধর্ম সংগীত, কি স্বদেশ সংগীত, কি অন্যান্য সংগীত সকলের ভিতরেই তাঁহার প্রাণের একাগ্রতা এবং ভগবানে ভক্তি

ও বিশ্বাস প্রকাশ পাইয়াছে। তাই তাঁহার দেশপ্রীতি শুধু কথায় পর্যবসিত হয় নাই। ধর্মকে ভিত্তি না করিলে যে খাঁটি স্বদেশপ্রীতি হয় না, সেই ভাব তাঁহার সকল স্বদেশ সংগীতের ভিতরেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর,' 'কতকাল রবে নিজ যশ বিভব অন্বেষণে ?' 'দুদিনের ধনের লাগি ভুলিলে পরম ধনে', 'পরের শিকল ভাঙিস পবে, নিজের নিগড় ভাঙরে ভাই' ইত্যাদি অনেক সংগীতই তাঁহার প্রাণের এই গভীর ধর্মভাবের পরিচায়ক। তাঁহার সংগীতেই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

অন্তর্নিহিত ভগবৎপ্রেমই বিশ্বপ্রেমে পরিণতি লাভ করে। এই প্রেমই তাঁহাকে দেশসেবা ও জনসেবার কার্যে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার মধ্য ও শেষ জীবন লখ্নৌ সহরেই কাটিয়াছে ; সেখানকার সকল মঙ্গল-প্রতিষ্ঠানেরই তিনি অগ্রণী ছিলেন এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে ধনী-দরিদ্র সকলেরই যথাশক্তি কল্যাণ-সাধনে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কাহারও দুঃখ-অভাবের কথা শুনিলে চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিত এবং সেই দুঃখমোচনে তনুমনধন সর্বস্ব দিতে কখনও দ্বিধাবোধ করিতেন না। তাই তিনি গাহিয়াছেন :

> সবারে বাসরে ভালো, নইলে মনের কালো ঘুচবে নারে।
> আছে তোর যাহা ভালো ফুলের মত দে সবারে।...
> যারে তুই ভাবিস ফণী, তারো মাথায় আছে মণি ;
> বাজা তোর প্রেমের বাঁশি—ভবের বনে ভয় বা কারে।

আলস্য তাঁহার শরীরে দেখি নাই। যখনই লখনৌ গিয়াছি, দেখিয়াছি নিজের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ না রাখিয়া উদয়াস্ত খাটিতেছেন। সারা দিন রাত্রিতেও তাহার দেখা পাওয়া দুর্লভ ছিল। এই অতিরিক্ত খাটুনিতেই অসময়ে তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। অনেক সময় বলিতাম, 'তোমার কাছে এলাম, অথচ তোমাকে তো একটুও দেখতে পাই না,' আবার বলিতাম, 'তুমি যখন এত খাটছ নিশ্চয়ই তুমি অনেক টাকা উপার্জন কর, কিন্তু এত টাকা তুমি কি কর।' উত্তর দিতেন, 'আমি খাটি এবং যথেষ্ট উপার্জন করি সত্য, কিন্তু সব খাটুনিই তো টাকা উপার্জনের জন্য করি না। আমার কতরকম কাজ আছে। লোকে সব কাজেই আমাকে ডাকে ; ডাকলে তো না যেয়ে পারি না।' টাকা উপার্জন যথেষ্ট করিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাহার অধিকাংশই দানে ব্যয়িত হইত। মৃত্যুর পরেও উইলে দেখা গেল যে তাঁহার সন্তান এবং স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত অর্থ রাখিয়া নিজের বসতবাটি ও বাকী সঞ্চিত অর্থ নানা

সৎ প্রতিষ্ঠানে দান করিয়া গিয়াছেন। জীবিতাবস্থায় তিনি যাহা দান করিতেন, গোপনে করিতেন। তাঁহার কোনো কাজ বা দান কখনও মুখে প্রকাশ করিতে শুনি নাই। সর্বদা নিজেকে আড়ালে রাখিতে ভালবাসিতেন এবং সকলের পিছনেই নিজেকে রাখিতেন। সংগীতে গাহিয়াছেন, 'নিচুর কাছে নিচু হতে শিখলি নাবে মন', 'যে নিচু সেই তো উঁচু।' তাঁহার হৃদয় বিনয়ে পূর্ণ ছিল। ঔদ্ধত্য তাঁহারা কোনো ব্যবহারে কখনো লক্ষ কবি নাই। এমনকি বয়োকনিষ্ঠ ও কেহ তাঁহাব দোষ-ত্রুটির কথা বলিলে সর্বদা নম্র শিরে তাহা শ্রবণ কবিতেন।

অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীব মত তাঁহাব প্রাণটি প্রেমে পূর্ণ ছিল। তাঁহাব সংস্পর্শে যিনি আসিয়াছেন তিনিই তাহা প্রাণে অনুভব করিয়াছেন। লোকান্তবে যাইবার কয়েক মাস পূর্বে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তিনি পুরী গিয়াছিলেন, সেখানে মাসাধিককাল ছিলেন। তাঁহার ভগিনীদিগের নিকট শুনিয়াছি—প্রতিদিন বৈকাল হইলে বহুলোক সমুদ্রতীরে মধু-মক্ষিকার মত তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিত এবং তাঁহার সঙ্গে আলাপে সংগীতে ও কীর্তনে সন্ধ্যা অতিবাহিত করিত। তাঁহারা বলিতেন, বহুকাল পুরীতে আমরা এমন সঙ্গ ও আনন্দ লাভ করি নাই। তিনিও সেখান হইতে স্বাস্থ্য ও আনন্দ লাভ করিয়া আসিলেন।

তাঁহার মাতৃভক্তি আশ্চর্য দেখিয়াছি। জীবনে পঞ্চাশ বৎসরের অধিক তিনি মায়ের স্নেহ ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু শিশুকাল হইতে এই বয়স পর্যন্ত কখনও মায়েব মুখের উপর কোনো কথা বলিতে শুনি নাই। মায়ের সঙ্গে সর্বদা তিনি শিশুর মত ব্যবহাব করিতেন। তাঁহার জননীদেবীর চরিত্রের মধ্যে কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল। ভগবানে বিশ্বাস, সেবা, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা তাঁহাব স্বভাবসিদ্ধ ছিল। আমাদের অতুলও তাঁহার নিকট হইতে এইসকল গুণেব অধিকারী হইয়াছিলেন। দিদি জীবনে শোক-তাপ-পরীক্ষা কম ভোগ করেন নাই। অধিক দুঃখ ও শোকে মানুষ অনেক সময় পাগল হইয়া যায় কিন্তু তিনি ভগবানের দিকে চাহিয়া হাসিমুখে সহ্য করিয়াছেন। গভীর শোক-তাপের মধ্যে যে-সকল সংগীত রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে শুধু এই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে—প্রভু তুমি যেমন ইচ্ছা কর, কিন্তু আমি তোমার মঙ্গল ইচ্ছাতে যেন অবিশ্বাসী না হই। তোমার ইচ্ছাই যেন আমার জীবনে পূর্ণ হয়। অতুলের জীবনেও নানা পরীক্ষা, নানা সঙ্কট গিয়াছে। এই ভগবানে বিশ্বাসই তাঁহাকে সহ্য করিবার শক্তি ও বল দিয়াছে। তাঁহার জননীর

শ্রাদ্ধবাসরে তিনি যে-প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

বিশ্বজননি! সংসারে পাইয়াছিও অনেক হারাইয়াছিও অনেক। কিন্তু এবার সকলের চেয়ে অমূল্য সম্পদ হারাইলাম—মা। তুমি আমাকে অনেক সুখে বঞ্চিত করিয়াছ কিন্তু একটি পরম সুখে একদিনের জন্যও বঞ্চিত কর নাই—সেই অপূর্ব মাতৃস্নেহ। আজ তাহা হইতে বঞ্চিত করিলে। এক-একসময় মনে হয় এখন কি লইয়া থাকিব। কে আমাদের সকল সুখে সুখী ও সকল দুঃখে দুঃখী হইবে। শৈশব হইতে যৌবনে, যৌবন হইতে প্রৌঢ়াবস্থায়, প্রৌঢ়াবস্থা হইতে প্রায় বার্ধক্যে আসিয়া পড়িলাম, মার কাছে চিরকাল শিশু হইয়াই রহিলাম। যখন মা বলিয়া ডাকিতাম আর মা যখন অতুল বলিয়া ডাকিতেন, তখন ভুলিয়া যাইতাম যে এত বড় হইয়াছি। শৈশবে যেমন স্নেহের শাসন পাইতাম সেদিনও সেরূপ পাইয়াছি। হায়! আজ তেমন করিয়া শাসন করিবে কে? তেমন করিয়া ভালবাসিবে কে? তেমন করিয়া সেবা করিবে কে? এই গৃহ রক্ষা করিবে কে? মাতৃহারা হইয়া নিজেকে নিঃসম্বল মনে হইতেছে। বিশ্বজননি! তুমি আমার সহায় হও।

তাঁহার ভগিনীগণ, আত্মীয়-স্বজন সকলেই তাঁহার গুণমুগ্ধ ছিল। ভগিনীগণ দুঃখ-বিপদে পড়িয়া তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়া কত শান্তি লাভ করিয়াছে এবং তিনিও স্নেহময় ভ্রাতার কর্তব্য করিতে কখনো ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ীরা পিতৃহারা হইবার পর তাঁহার কাছে পিতৃস্নেহ লাভ করিয়াছে। তিনিও তাহাদের পিতার অভাব কোনোদিনও অনুভব করিতে দেন নাই। সন্তাননির্বিশেষে ইহাদিগকে সস্নেহ আদরে ঘিরিয়া রাখিতেন।

স্নেহাস্পদকে প্রীতি ও পূজনীয়দিগকে যথাসাধ্য সম্মানদান করিতে কখনও ত্রুটি করেন নাই। গুণিজনের সমাদর করিতেও তাঁহার মত কাহাকেও দেখি নাই। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের জয়ন্তী উৎসবে তাঁহার আনন্দ আর ধরে না। যে জয়ন্তী-বন্দনা রচনা করিলেন, সুরতানলয়-সংযোগে যুবকবৃন্দ সঙ্গে লইয়া সেই বন্দনা গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিলেন। এই বন্দনার শেষ চরণটি উদ্ধৃত করিতেছি :

হে চিরবরণি, থাক মরণের শেষ
বর্ষ বর্ষ আসো মোদের সম্মুখে,
বহি বীণা আরো বাজাও গুণী,
মহান মোহন বাণী কহো শুনি।
রচো ত্রিভুবনে 'শান্তিনিকেতন'
পূর্ণ হউক তব পুণ্য সাধন।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, তাই কবিবর যখন প্রসিদ্ধ নোবেল প্রাইজ লইয়া দেশে ফিরিলেন তখন সেই গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া বঙ্গভাষাকে সম্বোধন করিয়া লিখিলেন :

বাজিয়ে রবি তোমার বীণে আনল মালা জগৎ জিনে !
গরব কোথায় রাখি গো !
তোমার চরণ-তীর্থে আজি জগৎ করে যাওয়া-আসা।

তাঁহার একটি ভাগিনেয়ীর বিবাহের সময় আমরা ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে বিবাহের উপাসনায় অতুলপ্রসাদের রচিত সংগীতই গীত হইবে। তিনি ইহা পছন্দ করিলেন না। আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'এ হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের এত সুন্দর সংগীত থাকতে শুধু আমার রচিত গানগুলিই হবে, এ আমার ভাল লাগছে না। চারটি গানের মধ্যে অন্তত দুটি গান রবীন্দ্রনাথের হোক।' পরে তাহাই হইল, নিজেকে তিনি নগণ্য মনে করিতেন।

বাড়ীতে কেহ অতিথি আসিলে আত্ম-পর-ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকেই সমান যত্ন ও আদর করিতেন। তাঁহাদের আরাম ও সুবিধায় রাখিবার জন্য নিজের সব ছাড়িয়া দিতেন এবং তাঁহাদের মনোরঞ্জনের জন্য কতরূপে ব্যয় করিতেন। তাঁহার গৃহ কখনও প্রায় অতিথিশূন্য থাকিত না। আজকাল এইরূপ অতিথির যত্ন কোথাও বড় দেখা যায় না। তাঁহার গুণের কথা আর কত বলিব। তাঁহার বিষয় কাহাকেও কাহাকেও বলিতে শুনিয়াছি—অতুলপ্রসাদ আমাদের দেশের একটি শ্রেষ্ঠ রত্ন। ধন্য মা, যিনি এমন সুপুত্রের জন্মদান করিয়াছেন। তাঁহার বড় ভয় ছিল মৃত্যুসময়ে রোগে ভুগিয়া পাছে কাহাকেও কষ্ট দেন। ভগবান তাঁহার সে প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন। সকলের কাছে হাসিমুখে বিদায় লইয়া শয্যাগ্রহণ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, সেই চক্ষু আর মেলিলেন না। তাই তাঁহার একজন বন্ধু লিখিয়াছেন, অতুলপ্রসাদ যেরূপ মহৎ প্রাণ নিয়ে এসেছিলেন, তাঁহার মহাযাত্রাও তদনুরূপ।

মানুষমাত্রেরই দোষ ত্রুটি ও দুর্বলতা আছে। তাঁহারও থাকা স্বাভাবিক। রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করে সত্য কিন্তু রাহুমুক্ত চন্দ্র যেমন স্নিগ্ধ ও নির্মল জ্যোতিতে প্রকাশিত হয়, আমাদের প্রিয় অতুলপ্রসাদের জীবনও আরো উজ্জ্বলতর রূপে আমাদের সকলের অন্তরে প্রকাশ পাইতেছে।

তাঁহার সংগীতে আছে

পায়ে যখন ঠেলবে সবাই,
তোমার পায়ে পাইব ঠাঁই ;
জগতের সকল আপন হতে আপন হবে কবে ?
শেষে ফিরব যখন সন্ধ্যাবেলা
সাঙ্গ করে ভবের খেলা,
জননী হয়ে আমায় কোল বাড়ায়ে লবে।

আজ বিশ্বাস করি বিশ্বজননী তাঁহার সকল সন্তাপ হরণ করিয়া তাঁহাকে কোলে স্থান দিয়াছেন।

১৩৪১

অতুলপ্রসাদ

অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার সঙ্গে অতুলপ্রসাদের জানাশোনা প্রায় ছাব্বিশ বৎসরের কথা। সকল কথা আজই বলিবার প্রয়োজন দেখি না। তবে আমার ছাত্র-জীবনে (১৯১৭) তাঁর হৃদয়ের ছবি যেভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল শুধু সেইটুকু অসংকোচে জানাইতে চাই।

স্বদেশী যুগের কথা। আমি তখন বালক বলিলেই হয়। কলিকাতায় হেদুয়ার ধারে একলাটি বসিয়া ভাবিতেছি দেশমাতার সেবায় যে-জাতি জাগিয়া উঠিয়াছে তাহার সহিত আমার ক্ষুদ্র প্রাণটিকে কি করিয়া একসূত্রে বাঁধিয়া লই? সেই সময় একজন অজানা মানুষ একটি স্বদেশ সংগীতের পুস্তিকা আমার কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া গেল। পুস্তিকাখানি খুলিবামাত্র যে-গানটি আমার হৃদয় অধিকার করিল তাহার একটি পদ আজ বিশেষ করিয়া স্মরণ করিতে চাই :

> কাণ্ডারী নাহিক কমলা, দুখলাঞ্ছিত ভারতবর্ষে ;
> শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী কাল-সাগর-কম্পন-দর্শে।
> তোমার অভয় পদস্পর্শে, নব হর্ষে,
> পুনঃ চলিবে তরণী শুভলক্ষ্যে।

কবির নাম মুখস্থ করিয়া লইলাম শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন। গানটি গাহিয়া ভারত-জননীকে নেতৃত্বের জন্য আবাহন করিতে মন চাহিল। কিন্তু মনের ইচ্ছা মনের মধ্যে লুকাইয়া গেল।

দুই বৎসর পরের কথা। আমার পিতা লখনৌয়ে উকিল ছিলেন। তাই আমাকেও বাংলাদেশ ছাড়িয়া প্রবাসে আসিয়া বসবাস করিতে হইল। শীতকালের দুপুরবেলা বারান্দায় বসিয়া আছি এমন সময় বাবা আসিয়া আমাকে বলিলেন যে ব্যারিস্টার এ. পি সেন মহাশয় আমাদের বাড়িতে আসিয়াছেন ও

আমাকে দেখিতে চান। আমি শান্তিনিকেতনের পুরাতন ছাত্র এবং লেখাপড়ার চেয়ে গানের সুরের সঙ্গেই যে আমার হৃদয়টা বেশি করিয়া নাচিয়া ওঠে—এ-পরিচয় মনে হইল বাবা আমার সম্বন্ধে সেন মহাশয়কে দিয়া থাকিবেন। তাই লজ্জিত হইয়া আমি বসিবার ঘরে সেন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তখনও জানিতাম না যে ব্যারিস্টার এ. পি সেন আর কেহই নন, আমাদেরই অতুলপ্রসাদ সেন—যাঁর নামটি আমার মত কিশোরের হৃদয়েও আঁকাবাঁকা অক্ষরে মুদ্রিত ছিল।

তারপর হইতে অতুলপ্রসাদের গৃহে আমার আসা-যাওয়া আরম্ভ হইল। ছুটির দিনে দুপুরবেলা তাঁর কাছে গিয়া গান শিক্ষা করিতে, গল্প শুনিতে, ইংরাজি ও বাংলা আবৃত্তি করিতে, শিখিতে নানা অছিলায় যাইতাম। ভারতগৌরব যে-কোন জননায়ক লখনৌয়ে আসিতেন অতুলপ্রসাদ তাঁহাকে সম্যকভাবে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রবাসী বাঙালিদের একত্র আহ্বান করিতেন। সে সভামঞ্চ ফুল ও পাতা দিয়া সজ্জিত করিবার কাজ, সে-সভায় গান গাহিবার ভার, সেই জনমণ্ডলীর মাঝে হৃদয়ের ভক্তিচন্দন দিয়া দেশসেবকদের পূজা করিবার অধিকার তিনি তরুণদের হস্তে দিতেন, প্রবীণদের সাহচর্যে তাঁহা বঙ্গীয় যুবক সমিতির পক্ষ হইতে সম্পন্ন হইত। অতুলপ্রসাদ এইসকল সভার জন্য গান রচনা করিতেন :

এসো হে এসো হে ভারতভূষণ, মোদের প্রবাসভবনে

অথবা

বলো, বলো, বলো' সবে, শত-বীণা-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

কিংবা পরবর্তীকালে

জয়তু জয়তু জয়তু কবি
জয়তু পুরব-উজল রবি।

এইরূপ গোখেল, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির সংবর্ধনা হইত ও ভারত গৌরবদিগকে হৃদয়-মন্দিরে স্থান দিবার সুযোগ ও সুবিধা অতুলপ্রসাদ লখনৌ-প্রবাসী বাঙালিদের এমন সুন্দরভাবে দিতেন যাহাতে কবি, ভক্ত ও দেশসেবক অতুলপ্রসাদের হৃদয়-শতদল আমাদের চিত্তকে সরস করিয়া আমাদের এক নূতন রাজ্যে লইয়া যাইত।

ইহা ত গেল সামাজিক হিসাবে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদিগের অভিনন্দনের প্রথা। অপরদিকে প্রবাসী বাঙালিদিগের পারিবারিক জীবনের দুঃখ-শোকে অতুলপ্রসাদ নিজেকে বিলাইয়া দিয়া যে শান্তি ও সান্ত্বনা দিতেন তাহাও ভুলিলে চলিবে না। অপরের জীবনের কথা উল্লেখ করিয়া কাজ নাই, শুধু নিজের জীবনের একটি স্মরণীয় দিনের বিবরণ সংক্ষেপে দিব। আমার বাবা যখন কাশীতে হঠাৎ একটা দুর্ঘটনায় মারা যান তখন আমি বি-এ ক্লাশে সবেমাত্র ভর্তি হইয়াছি। আমরা কাশী থেকে বাবার শেষ কার্য সমাপন করিয়া লখনৌয়ে বাড়িতে ফিরিলাম। সেদিন আমাদের বাড়িতে একটি অনাহূত শোকসভা বসিয়াছিল। সেই প্রথম দিন আমার জীবনে আমার পিতার হাত ধরিয়া সংসারের সামনে আমি দাঁড়াইতে পারি নাই। সকলের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত হইতেই শুনিলাম কয়েকজন বলাবলি করিতেছেন যে সকলেই আসিয়াছেন কেবল সেন মহাশয় আসেন নাই। সে-সময়ে সে-অবস্থায় আমার কোনো কথাই তখন ভাল লাগিতেছিল না। তথাপি একথা আমার কানে গিয়াছিল। তাবপর, দিনের শেষে মনটা যখন হু-হু করিয়া ভরিয়া উঠিয়াছিল তখন বিশ্বজগতের অন্তরালে জানালার ধারে বসিয়া পথের দিকে চাহিয়া কত কি ভাবিতেছি ও অশ্রুপাত করিতেছি এমন সময়ে দেখি বাহিরের চন্দ্রালোকে দাঁড়াইয়া অতুলপ্রসাদের সেই চির-পরিচিত মূর্তিখানি যাহা তাঁহার অন্তরের মমতাকে কাহারও নিকটে কখনও গোপন রাখে নাই। বাহিরে যাইতেই সেই প্রথম দিন অতুলপ্রসাদ আমাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন। আমি সেই বুকের স্পর্শ পাইয়াছিলাম যাহার জন্য প্রবাসী বাঙালি সকল দুঃখ-বেদনায় নিরন্তর কাতর হইয়া থাকিত। অতুলপ্রসাদের নীরব সহানুভূতি সভা-সমিতির উপলক্ষ খুঁজিত না, বরং লোকচক্ষুর অন্তবালে তাঁহার অব্যক্ত ভালবাসার পরিপূর্ণ শক্তি দ্বারা খণ্ড মানবকে অখণ্ড দেবতার মিলন-তীর্থে পৌঁছাইয়া দিত।

এই ঘটনার পর অতুলদাদাকে আমি জ্যেষ্ঠের মত সব সময়ই কাছে অনুভব করিয়াছি। কিন্তু সব কথা বলিবার এখনও অবসর আসে নাই। কেবল আমার ছাত্রজীবনে তাঁহার যে মধুর মুরতি আমার অন্তরে অঙ্কিত হইয়াছে তাহারই রেখাগুলি ধরিয়া যে স্মৃতির সুর আমার প্রাণে আজও ঝঙ্কৃত হইতেছে তাহাই কেবল জানাইব। শোকের সময় ভগবানের নাম ছাড়া বোধহয় আর কিছু ভাল লাগে না। অতুলপ্রসাদ বোধ করি আমার

মনের অবস্থা জানিয়াছিলেন। তাঁর গৃহে প্রতি রবিবার সকালে একটি ছোট উপাসনার সভা বসিত। মাত্র কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবের সমাগম হইত। অতুলপ্রসাদ ভগবৎ-সংগীত গাহিতেন, নানাবিধ ধর্মগ্রন্থ হইতে পাঠ করিতেন। অল্প একটু প্রার্থনাও হইত। সেই উপাসনার সময় অতুলপ্রসাদ আমাকেও তাঁর নিকট বসিবার স্থান দিলেন। তাঁর সে-সময়ে যে ধর্ম-সংগীত রচনা হইত, তিনি সেই উপাসনার শুভ অবসরে ভগবৎ-চরণে তাহা প্রথম উপহার দিতেন :

পরানে তোমায় ডাকিনি হে হরি,
ডেকেছি শুধুই গানে,
তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো

অথবা

তোমায় ঠাকুর বলব নিঠুর কোন মুখে

ইত্যাদি সংগীতগুলি ভাবে-ভোলা কবির প্রাণ হইতে যখন সদ্য বিকশিত হইয়া ভগবৎ-চরণে সৌরভ বিলাইত তখন স্তিমিত নয়নে আমরা কোন স্বপ্নের দেশে চলিয়া যাইতাম। শোক তখন সার্থক হইয়া উঠিত। বেদনা তখন ব্যথার সীমা অতিক্রম করিয়া আনন্দধামে গিয়া বিলীন হইয়া যাইত। ভক্ত অতুলপ্রসাদকে পূজারীর বেশে যেমনটি দেখিয়াছিলাম তাহা কখনও ভুলিব না।

অতুলপ্রসাদের সান্নিধ্যলাভ করিয়াছিলাম আর-একটি স্থানে—যাহাকে তাঁর মজলিস বলা চলে। প্রতি মাসেই একবার, কখনও দুইবার ছুটির দিনে তাঁর গৃহে অপরাহ্নকাল হইতেই গান, গল্প বা পান ইত্যাদির বৈঠক বসিত। এ ব্যাপারটি তিনি বড় ভালবাসিতেন এবং ইহার সভ্য সংখ্যা পরে বাড়িয়া গিয়াছিল। আমি যে-সময়ের কথা বলিতেছি তখন আমরা মাত্র ছয়-সাতজন তাঁর সাহিত্যিক মধুচক্রের অমৃত-পিয়াসী ছিলাম। তাঁর কাছে বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির রচনা বা জীবনের ঘটনাগুলি শুনিতে পড়িতে ও আলোচনা করিতে ভালবাসিতাম। তাঁর নিজের রচিত স্বদেশ সংগীত বা প্রেম-সংগীতগুলি আমাদের শুনিবার ও যাহার ইচ্ছা লিখিবার সুযোগ হইত। হোলির দিনে হোলির গান, শ্রাবণের বারিধারায় বর্ষা-সংগীত, শারদীয় বৈকালে পূরবীর তান বারেবারে শুনিতাম, কখনও পুরাতন হইত না। কারণ কবির অন্তরে সেযুগে যে-সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল বাংলার আকাশে বাতাসে, বাঙালির গৃহে যতদিন গানের আদর থাকিবে, যতদিন চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ

ও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রাণের কথাগুলি দেশবাসীগণ নিজেদের হর্ষ-বেদনা মিশাইয়া গাহিবেন ততদিন বাঁচিয়া থাকিবে ও বাঙালির দেহে সেই রোমাঞ্চের সৃষ্টি করিবে যাহা একদিন অতুলপ্রসাদকে ঘরের বাহির করিয়া পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। এই সাহিত্যের আখড়ায় অতুলপ্রসাদ যেমন প্রাণ খুলিয়া হাসিতেন, গল্প করিতেন এমন আর কোথাও নয়। বাংলা রচনায় তিনি আমাদের কত উৎসাহ দিতেন। তিনি সব সময় কহিতেন যেন আমরা বাংলার তুলি দিয়া বাঙালির মর্মকথা গদ্য ও পদ্যে চিত্তপটে অঙ্কিত করিয়া বঙ্গভারতীর পূজায় উপঢৌকন দিই। প্রবাসী বাঙালির কাছে তাঁর এই নিবেদন পরে প্রবাসী সাহিত্য সম্মিলনে পরিণত হইয়াছিল, কারণ তিনি নিজেই গাহিয়াছেন :

সুজলা সুফলা ওগো শ্যামা,
ওগো বাঙালি-হৃদি-রমা,
ভোলেনি তোমায় ভোলেনি মা
তোমার প্রবাসী সন্ততি।

ভাবুক অতুলপ্রসাদের পরিচয় দিতে গিয়া কর্মী অতুলপ্রসাদকে ভুলিলে চলিবে না। আমাদের দেশে এক সময় ছিল যখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরা কবি হইতেন যেমন—বঙ্কিম, দ্বিজেন্দ্রলাল, নবীনচন্দ্র। পরবর্তী যুগের কৃতী বাঙালি সন্তানেরা আর চাকরী চান নাই, স্বাধীন ব্যবসা করিবার জন্য ব্যারিস্টারি গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। এ-যুগের সাহিত্যসেবীদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন ও অতুলপ্রসাদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্যারিস্টারের অনেক কাজ। প্রভাতে মক্কেলের মনোরঞ্জন, দুপুরে জজের চিত্তবিনোদন এবং সন্ধ্যায় মকর্দমার হার-জিতের হর্ষবেদনা লাগিয়াই আছে। কতবার শেষ রাত্রে ঘুম ভাঙিয়াছে, আর নিদ্রা আসে না দেখিয়া অতুলপ্রসাদের গৃহে ছুটিয়া গিয়াছি, কারণ তাঁর কাছে যাইবার জন্য পঞ্জিকা বা ঘড়ি দেখিবার প্রয়োজন তিনি আমার জন্য কখনও রাখেন নাই। গিয়া দেখি মকর্দমার কাগজপত্র, পুস্তক প্রভৃতি বন্ধ করিয়া সবেমাত্র তিনি নিদ্রা যাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন, কিন্তু নিদ্রার পরিবর্তে কবিতা-সুন্দরী তাঁর সেদিনের শেষ হাসিটুকু ও শেষ অশ্রুবিন্দু আপন অঞ্চলে

সঙ্কল্প করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় কবি রচনা করিতেন :

নিদ নাহি আঁখিপাতে।
তুমিও একাকী, আমিও একাকী
আজি এ বাদল রাতে।...

এ মধুব বাতে বলো কে বীণা বাজায়।...

হরি হে, তুমি আমার সকল হবে কবে।

শেষ গানটির বিষয় মনে পড়ে অতুলপ্রসাদ রচনা সম্পূর্ণ করিলেও গানটিকে গাহিয়া গাহিয়া পুরাতন করিতে পারিতেছিলেন না, সে-রাত্রে এমনই অবস্থায় আমি তাঁর কাছে গিয়া পৌছিয়াছিলাম। কবি বার বার গাহিতেছেন, আমাদের অলক্ষ্যে প্রভাতের নূতন আলোকের সঙ্গে একায় করিয়া মক্কেলদের আগমন হইল। অতুলপ্রসাদের সে-রাত্রে বিশ্রাম মিলিল না।

কেহ যেন না মনে করেন যে মক্কেলদের জন্য তাঁর কোনো ক্ষতি হইত। তাঁর জীবনটি ছিল একখানি সংগীত, তাহা পূর্ণ হইল কি অপূর্ণ রহিল তাহা ভবিষ্যতের সাহিত্যিকগণ বিচার করিবেন। কিন্তু গান গাহিয়া গলা বসিয়া যাইলে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি 'এমন হলে তো আমার চলবে না, আমাকে যে আজ আদালতে ভিখাবির গান গাহিতে হইবে।' তাই মনে হয় বিচারকদের সম্মুখেও তাঁর অন্তরাত্মা গানের প্রেরণায় মুখর হইত যাহার জন্য তিনি পরে অযোধ্যা প্রদেশের সবচেয়ে যশস্বী ব্যারিস্টার হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি জীবনে কাজকে বড় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তাই গাহিলেন :

আপন কাজে অচল হলে
চলবে না বে চলবে না।
অলস স্তুতি-গানে তাঁব আসন
টলবে না বে টলবে না।

মক্কেলদের কাজ হইতে অবসর পাইলে তাঁর স্বোপার্জিত ধনে তিনি গরীবের দুঃখমোচনে নিযুক্ত থাকিতেন। কত অনাথিনী বিধবা, কত অবলম্বনহীন ছাত্র তাঁর সাহায্য প্রতিবৎসর লাভ করিত। কেহ সাহায্য না পাইয়া তাঁর নিকট হইতে কখনও ফিরে নাই। অর্থের চেয়ে সবচেয়ে বড় দাম ছিল তাঁর অন্তরের ভালবাসা যাহার জন্য সবাই মুগ্ধ হইয়া যাইত ও তাঁহাকে ভুলিতে পারিত না।

আমার নিজের জীবনের একটি দিন যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করিতে চাই। বিশ বৎসর পূর্বের কথা। গোমতীতে বন্যা আসিয়াছে। অবিরাম মুষলধারায় লখনৌ নগরীর গরীবদের পল্লিগুলি বিধ্বস্ত হইয়াছে, অনেক স্ত্রী-পুরুষ ছেলেমেয়েদের হাত ধরিয়া নগরের রাজপথে আশ্রয় লইয়াছে। অতুলপ্রসাদ সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়ির সম্মুখ দিয়া পদব্রজে যাইতেছিলেন, আমিও গিয়া তাঁর সহিত সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুরিয়াছিলাম ; গরীবদের অর্থ দিয়া, স্কুল মন্দির বা অন্য আবাস-স্থলে তাহাদের জন্য আশ্রয় করিয়া দিয়া তিনি যে কিপ্রকারে অর্থহীন নিরাশ্রয়দের সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা আমি কখনও ভুলিব না।

অতুলপ্রসাদ চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় ভালবাসার কানায় কানায় ভরা ছিল। ভালবাসার কাঁটার আঘাতে তাঁর হৃদয় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইলেও তাহারই কোমল মধুময় স্পর্শে জগতের অনেক দুঃখী কাঙাল নরনারীর মনের ব্যথা, শরীরের যন্ত্রণা এবং সংসারের দুঃখকষ্ট তিনি অপনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতুলপ্রসাদের ভালবাসা অতুলনীয় ছিল। এক্ষণে তাঁরই প্রতিধ্বনি আমাদের বুকে বাজিয়া উঠিতেছে। তবুও সব কথা বলিতে পারিলাম না।

প্রিয়জনের মৃত্যুতে শ্মশানে দাঁড়াইয়া ভক্ত অতুলপ্রসাদকে গীতটি গাহিতে আমরা শুনিয়াছিলাম। সেই গানের সঙ্গে যে-সকল মহারত্ন 'প্রবাসে দৈবের বশে' আমরা হারাইয়াছি তাহা স্মরণ করিয়া মঙ্গলময়ের চরণে বার বার জানাইতে চাই,

বলো হে কবে জানিব, শ্মশানেতে তুমি শিব ;
তোমারে সুখে বরিব দুঃখের মাঝারে।...
মনে হয় তব কাছে সব হারাধন আছে,
তাই তো এসেছি হে নাথ, তোমার দুয়ারে।

১৩৪৩

———

স্মৃতিচারণ

দিলীপকুমার রায়

অতুলদা বয়সে আমার চেয়ে পনের কুড়ি বৎসর বড় হলেও তাঁকে আমি পিতৃবন্ধু হিসাবে কাকা বলতাম না। কারণ তাঁর মনটি পঞ্চাশেও ছিল কিশোরই বলব—বিশেষ করে সৌকুমার্যে। যে-কোনো সভা-সমিতিই তিনি এলে উজ্জ্বল হয়ে উঠত, কিন্তু তিনি কখনো ভুলেও নিজেকে সামনে ধরতেন না। এরি তো নাম সৌকুমার্য। ধূর্জটির সঙ্গে লখনৌয়ে যেদিন প্রথম তাঁর ওখানে যাই সেদিন তিনি কী যে খুশি! উজিয়ে উঠে বলতে লাগলেন, পিতৃদেবের সঙ্গে এক সময়ে কী আনন্দেই না তাঁর দিন কাটত! মন ভিজে উঠল দেখতে দেখতে পূর্বরাগ ও প্রণয়ের যুগপৎ অভ্যুদয়ে। আমি যথাবিধি গান গাইলাম। তারপর অতুলদাকে অনুরোধ করলাম তাঁর নিজের দু'-একটি গান শোনাতে। তিনি অতি কুণ্ঠিত হয়ে 'না না' করে শেষে গাইলেন তাঁর মিষ্টি গাঢ় কণ্ঠে

পাগলা মনটারে তুই বাঁধ
কেনরে তুই যখন তখন পরিস গলে ফাঁদ।
শীতল বায়ে আসলে নিশি, তুই কেন রে হোস উদাসী?
(ওরে) নীলাকাশে অমন করে হেসেই থাকে চাঁদ।

চলতি ভৈরবী কিন্তু তাঁর গানের একটা বিশিষ্ট ঢং ছিল—বিশেষ করে ঠুংরী-ভঙ্গিম গানে। এর পরই তিনি গাইলেন

কমক ঝুমক কম ঝুম নূপুর বাজে।
বিরহী পরান মম সে-দুটি চরণ যাচে।

ধূর্জটি সমজদার তো—বলে উঠল : 'ইউরেকা! এরই তো নাম সৃষ্টি।' আমি সায় দিয়ে সোৎসাহে বললাম : 'শুধু সৃষ্টি নয়, বাংলা গানে এর

আগে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পার আমদানি হয়েছে—কেবল ঠুংরী বাকী ছিল। আপনিই তার এ-অভাব প্রথম পূর্ণ করলেন।'

শিহরণটুকু অবিস্মরণীয় বলেই অতুলদার মুখে শোনা এ-গান তুটির কথা মনে আছে, বিশেষ করে দ্বিতীয়টি পিলু-খাম্বাজ ঠুংরীতে বানানো। কিন্তু এ-সম্বন্ধে লিখে কী বোঝাবো—হরফের মাধ্যমে তো নয়, কণ্ঠস্বরের মাধ্যমেই যে গানের স্ফূর্তি। তাই বেশি বলা বৃথা—খানিকটা পরমাসুন্দরীর সৌন্দর্য—বর্ণনার পণ্ডশ্রমের মত।

অতঃপর যা হবার তাই হল—ভবিতব্য—কিনা আমি অতুলদাকে তথা তাঁব গানকে ভালোবেসে ফেললাম, শুরু করে দিলাম তাঁর গানের প্রচার, আমার নানা কনসার্টে গাওয়ানো আরম্ভ করলাম তাঁর নানা সুন্দর সুন্দব গান আমার ছাত্র-ছাত্রীকে দিয়ে। দেখতে দেখতে অতুলদার গান খুবই লোকপ্রিয় হয়ে উঠল। সে-সময়ে তাঁব গানেব কিরকম আদর হয়েছিল সংগীত-রসিকরা কয়েক বৎসব আগেও বলতেন যথা সোমনাথ মৈত্র, উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, মেঘনাদ সাহা, পাহাড়ী সান্ন্যাল, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অমিয়নাথ সান্ন্যাল, বেণুকা দাশগুপ্ত আরো অনেকে, যাক্।

অতুলদার গান আমাব কাছে ঠিক সময়েই এসেছিল, কেননা সে-সময়ে আমি নানা ওস্তাদের ও বাইজিব কাছে বিশেষ করে হিন্দি ঠুংরীতেই তালিম নিচ্ছিলাম। তাই বাংলায় ঠুংবীব বস পরিবেশন করে আমি নিখর্চায় নাম কিনলাম।

'নিখর্চায় নাম কিনলাম' বলাটা অবশ্য অত্যুক্তি, কারণ অতুলদার গান প্রচাব করতে আমাকে কম খাটতে হয়নি, এমনকি স্বরলিপিও করতে হয়েছিল তাঁব অনেক গানের। আমাব বলার কথা শুধু এই যে, সব জিনিসের মতন গানেরও এক একটা যুগ আসে। এই সময়ে বাংলাদেশে খাঁটি হিন্দুস্থানী ঢঙেব গান অনেক সংগীতোৎসুকের মনকেই একটু একটু করে রসিয়ে তুলেছিল। ফলে বাঙালি সংগীত-রসিকবা ঠুংরীর রস চাইছিলেন বাংলা গানে, কেননা হিন্দুস্থানী ঠুংরীর নানা গানেরই কথা অতি কদর্য—গাওয়া হত : ভুরু কামান চোখ কাঠারি (কিনা নয়নবাণ), কোঁকড়া চুল, ইত্যাদি। এক কথায় নিম্নশ্রেণীর শৃঙ্গার রসে ভরা। ভদ্র বাঙালি শ্রোতার আসরে এসব গান গাওয়া অসম্ভব, অথচ ঠুংরীর পেলব আদিরসে আপত্তি করবে কে—অরসিক ছাড়া ? এইরকম পরিস্থিতিতে হাজির হল অতুলদার

নানা ঠুংরী-ভঙ্গিম গান : ঝমক ঝুমক ঝম ঝুম, শ্রাবণ ঝুলাতে, জানি জানি তোমারে গো রঙ্গরানী, চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে; আমার বাগানে এত ফুল···কত বলব ?

অতুলপ্রসাদ তাঁর এই শ্রেণীর বাংলা গানের মধ্যে দিয়ে যে হিন্দি ঠুংরীর অনেক চমৎকার তান মীড় খোঁচের প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন তার কারণ তিনি সুরকারের প্রতিভা নিয়েই জন্মেছিলেন, নইলে তাঁর গানের বাঙালি কাঠামোয় হিন্দি সুরকারুর চালচিত্র এমন সুন্দর করে সাজাতে পারতেন না কখনই। তাছাড়া, লখনৌয়ে বহু বৎসর থেকে সেখানকার সেরা ঠুংরীর রস তাঁর কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশেছিল তো, তাই যে-রসে নিজে রসিয়ে উঠেছিলেন অপরকে সে-রসের রসিক করে তুলতে তাঁকে বেগ পেতে হয়নি। কীভাবে লখনৌয়ের ঠুংরী তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি স্মৃতিচারণী ঢঙেই।

যৌবনে বিলেত থেকে ফিরে আমি নানা ওস্তাদের ও বাঈজির কাছে খেয়াল ও ঠুংরীতে তালিম নেওয়া শুরু করি। লখনৌয়ে অচ্ছন বাইয়ের গান শোনার সুযোগ হল এক বাঙালি ভদ্রলোকের বাড়িতে। বাঈজির দক্ষিণা অতুলদাই দিয়েছিলেন কারণ সে-ভদ্রলোকের পক্ষে অত খরচ করা সম্ভব ছিল না। আমি অতুলদাকে ধরেছিলাম—অচ্ছন বাইয়ের গান না শুনলে মান থাকে না। অতুলদা হেসে বলেছিলেন : 'কেবল দেখো দিলীপ, প্রাণ নিয়ে না টানাটানি হয়।'

বলতে মনে পড়ল এক মজার ঘটনা—যে-আসরে তাঁর গান হয় সে-আসরের আমিই ছিলাম কর্মকর্তা। কিন্তু ওমা, অধ্যাপকদের নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে দেখি, অনেকেই আতঙ্কে যে ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন : 'বলো কি দিলীপ ? আমরা বাইনাচ দেখতে যাব ?' আমি বললাম : 'নাচ নয়, শুধু বৈঠকী গান।' তাঁরা তবু মাথা চুলকে বললেন : 'তবু—বাই তো। মানে - বুঝলে না, আমাদের একটা ঠাট বজায় রাখতে হয় কিনা।' কী করি—বিষণ্ণ মুখে ফিরে গিয়ে অতুলদাকে সব বললাম। তিনি হেসেই কুটি কুটি, বললেন : 'শুধু ঠাট নয় দিলীপ, ঠমকও আছে।'

যাহোক, সে-আসরে দু'-একজন অধ্যাপক দুর্গা বলে এসে এক কোণে গলাবন্ধ জড়িয়ে জুজুবুড়ি হয়ে বসে গান শুনেছিলেন। এদের মধ্যে একজন পরে আমার কাছে এসে একদিন ফিসফিস করে বললেন, 'দিলীপ, আহা কী

গানই শোনালে! শুনি, তুমি তাঁর ওখানে যাও গান শিখতে—আমাকে—মানে—ইয়ে—একদিন লুকিয়ে নিয়ে যেতে পারো?'

আমি অচ্ছন বাইয়ের অপরূপ চালে এতই মুগ্ধ হয়েছিলাম যে অবিলম্বেই তাঁর কাছে দিনের পর দিন গিয়ে অনেকগুলি ঠুংরী শিখেছিলাম। সে কথা পরে বলছি। সেদিন সন্ধ্যায় এই মহীয়সী গায়িকা কী গানই যে গাইলেন সমজদার শ্রোতা পেয়ে। কোনোদিন কি ভুলব তাঁর 'মুকুটধারী কান্‌হ বাজায়ে বাঁশিয়া রে।' সে কত তান, কত মীড়, সুরকে নিয়ে কত আদর, কখনো অশ্রু কখনো আনন্দ···মনে হল বুঝি সত্যিই মুকুটধারীর মুরলী শুনছি। অতুলদার সঙ্গে দাদা পাতিয়েছিলাম কি সাধে? অমন খাঁটি সুরপ্রেমিক জীবনে কটাই বা দেখেছি?

পরদিন সন্ধ্যায় অতুলদা আমাকে তাঁব সুরম্য ছাদে ডাকলেন। নিজের গান শোনাতে তিনি সত্যিই লজ্জা পেতেন, তার উপর ঈষৎ তোৎলামি তাঁর সৌকুমার্যকে আবো মধুর কবে তুলত। বললেন লাজুক সুরে: 'দিলীপ···ক্‌-কাল রাত্রে একটি গ্‌-গান বেঁধেছি। ক্‌-কেমন হয়েছে কে জানে?'

আমি সোৎসাহে ধরলাম: এক্ষুনি শিখিয়ে দাও।

অতুলদা: আহা···শোনোই তো আগে···তাবপব তো বিচার···

আমি (হেসে): না অতুলদা, তোমাব গান যখন, তখন আগে ফাঁসি তারপর বিচার।

অতুলদা হো হো কবে হেসে উঠলেন—সে প্রাণখোলা হাসি আজও কানে বাজে। পবে তাঁর সুকুমার লাজুক ভঙ্গিতে, সুমিষ্ট সুবেলা কণ্ঠে গাইলেন:

চাঁদিনী বাতে কে গো আসিলে?
উজল নয়নে কে গো হাসিলে?
মোহন সুরে ধীবে মধুবে
পবান বীণায় কে গো বাজালে·

সেদিন সন্ধ্যায় ধূর্জটি আসতেই তাকে গেয়ে শোনালাম এ-গানটি নিজে নানা তানে মিড়ে সমৃদ্ধ করে। ধূর্জটি আনন্দে আত্মহাবা, বলল হাততালি দিয়ে: 'কী গানই বেঁধেছেন অতুলদা! উঃ!'

অতুলদা (সুকণ্ঠে): না না। হয়েছে কি—দিলীপ গাইছে তো। মানে—কণ্ঠ—বুঝলে না?

কিন্তু তারিফের কথা অবান্তর। প্রাসঙ্গিক কথাটা হচ্ছে এই যে, এ-গানটি

পরে বাংলাদেশে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল এইজন্যই যে এর ঠুংরী চালে বাঙালি রসিক পেয়েছিল বাংলা কবিতার ভাব ও হিন্দি ঠুংরীর সুর, দুইয়ের মনোরম সমন্বয়—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, অর্ধনারীশ্বর যুগলমিলনের রস। এই সঙ্গে আরো স্মরণীয়: অচ্ছন বাইয়ের নানা মর্মস্পর্শী মীড়, কম্পন ও সূক্ষ্ম কারুকাজ এ-গানটির মধ্যে সহজেই অনুপ্রবেশ করেছিল অতুলদার শিল্পিহৃদয়ের আনন্দের সহজ তাগিদে। তাই না চিরন্তনীর উজল নয়নেব চাহনি সুরে বিগলিত হয়ে তাঁর প্রাণের বীণায় বেজে উঠেছিল। এর পরে আমার ও কাজী নজরুলের কয়েকটি সুর নিয়েও তিনি গান বেঁধেছিলেন কয়েকটি। এইজন্যেই বলছিলাম, তিনি এসেছিলেন বাংলা গানেব সুর-উচ্ছলতার জোয়ারের দিনে তাঁব সুকুমার হৃদয়েব প্রেম নিয়ে, লাজুক মনের মাধুর্য নিয়ে, সূক্ষ্ম আবেশের রং নিয়ে। এক কথায় তাঁর গান হিন্দি ঠুংরীর নকল ছিল না বলেই বাঙালি তাঁব বসসৃষ্টিকে সাদরে গ্রহণ কবেছিল এবং ভবিষ্যতেও করবে যদি তাঁব গানের প্রাণের রসটি ঠিকমত পবিবেশন করা যায়।

এই মানুষটির মধ্যে দেখেছিলাম পরকে আপন কবে নেওয়ার আশ্চর্য শক্তি। লখনৌতে তাঁব নিরুপম নিলয়ে তাঁব কত যে ভক্ত ও অনুবাগী তাঁর সান্ধ্য মজলিশের গালগল্পের মলয়ানিলে উজিয়ে উঠত সে একটা দেখবার জিনিস ছিল। কিন্তু গালগল্প ভালবাসলেও তাঁব প্রাণের উপজীব্য ছিল গান। তাঁব একটি সুন্দব গান তিনি জৌনপুরী টোড়িতে বসিয়ে আমাকে প্রায়ই শোনাতেন:

ওগো দুঃখ-সুখেব সাথী, সঙ্গী দিন রাতি, স গীত মোব!
তুমি ভবমরুপ্রান্তব মাঝে শীতল শান্তিব লোব।

তাঁব একটি সুবিখ্যাত গান সম্বন্ধে একটি বড় অপরূপ স্মৃতি মনে পড়ে। অতুলদার এ-গানটি আজও আমাব কাছে তেমনি প্রিয়ই—ভৈরবী ঠাটে বাঁধা:

কী আব চাহিব বলো হে মোব প্রিয়,
তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।
বলিব না রেখো সুখে, চাহ যদি রেখো দুখে,
তুমি যাহা ভাল বোঝ তাই করিয়ো।
যে পথে চালাবে নিজে, চলিব, চাব না পিছে;
আমার ভাবনা প্রিয়, তুমি ভাবিয়ো।
দেখো সকলে আনিল মালা ভকতি-চন্দন-থালা,
আমাব যে শূন্য ডালা, তুমি ভরিয়ো।

একদিন অতুলদা কি একটা কাজে বাইরে গেছেন। আমি তাঁর ঠাকুর

ঘরে একলা বসে এ-গানটি গাইতে গাইতে ভাবাবেশে চোখের জল রাখতে পারিনি। গানের শেষে উঠে দাঁড়াতেই দেখি—সামনেই অতুলদা—তাঁরও চোখে জল। আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন গাঢ়কণ্ঠে: জানো দিলীপ, এ গানটি আমি বেঁধেছিলাম আমার জীবনের এক দারুণ দুঃখের সময়ে—যখন মনে হয়েছিল · যাক্, সে-কথা আর একদিন বলব—বলেই চোখের জল গোপন করে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। সেদিন আমি অতুলদাকে দেখতে শিখি এক নতুন দৃষ্টিতে। জীবনে দুঃখ পায় শতকরা একশোজনই! কিন্তু কজন বেদনাকে বোধনায় রূপান্তরিত করিতে পারে অন্তঃশক্তির রসায়নে? গ্যেটে বলতেন প্রায়ই যে, গভীর দুঃখ পাওয়াও সার্থক যদি সে দুঃখে একটি গানও ফুটে ওঠে আঁধারে তারার মত। কিন্তু একথা সাজে কবিরই মুখে। সাধারণ মানুষ দুঃখে হাহাকার করেই মরে, এক কবিই দুঃখের দহনে ধূপের সৌরভ বিলাবার শক্তি ধরেন। অতুলদা ছিলেন কবি—তাই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন:

> হৃদয়ের শব্দ শুনে চমকে ভাবি মনে,
> ওই বুঝি এল বঁধু ধীরে মৃদুল চরণে!
> পরানে লাগলে ব্যথা ভাবি বুঝি আমায় ছুঁলে
> বঁধু আমার!
> আর কতকাল থাকব বসে দুয়ার খুলে, বঁধু আমার!

এর পরে অতুলদায় সঙ্গে আমার স্নেহ-সম্বন্ধ নিবিড় হয়ে উঠল দুটি আনন্দের যোগাযোগে: এক, আমি তাঁর গান সর্বত্র প্রচার করার ফলে তিনি গানের পর গান বাঁধতে আরম্ভ করলেন—একে বলতে পারি সাংগীতিক লাভ। দুই, অবিমিশ্র গানের আনন্দ পেতে আমরা অভিযান শুরু করলাম কখনো মধুপুরে, কখনো সুন্দরবনে ষ্টিমারে, কখনো বা শিমুলতলায় আমার বোন মায়ার সুরম্য ভিলায়। একে নাম দেওয়া যেতে পারে হার্দ্যিক লাভ। দুয়ের যোগাযোগে গানে গানে আমরা যেন মাতাল হয়ে উঠতাম অতুলদা যোগ দিতে·না দিতে, কিন্তু তাঁর গানের কথায় ফিরে আসি।

আমি দিনের পর দিন তাঁর কাছে তাঁর নানা গান শিখে তান বিস্তারে সমৃদ্ধ করে শুধু যে বাংলার নানা শহরে গেয়ে বেড়াতাম তাই নয়, ঐসঙ্গে নানা বক্তৃতা দিয়ে সংগীতরসিকদের সোৎসাহে বোঝাতাম—অতুলদার সুরকার বৈশিষ্ট্যটি কী। কিন্তু এই নিয়ে বহু লেখা লিখেছি, তাই আজ আর নতুন করে এ-গবেষণা করতে মন চায় না। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে অতুলদার

গানের সহজ সরল কথার আবেদন ঠুংরীর সুর-মাধুর্যের মাধ্যমে সত্যই এক বিচিত্র রসাবেশের সৃষ্টি করত যাতে সংগীত-কোবিদরা সবাই আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

অতুলদার অনেক গানেই ছন্দের খুঁৎ আছে। উদাহরণ দেওয়া বাহুল্য হবে—যে-কোনো ছন্দজ্ঞই তাঁর নানা মনোজ্ঞ গানেও ছন্দপতন ধরতে পারবেন। এরকম ছন্দের খুঁৎ রবীন্দ্রনাথেরও অনেক গানে আছে, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্তেরও কোনো গানের মাত্রা সুরের টানে টেনে পড়তে হয়। কিন্তু তবু বলব যে অতুলদার ছন্দের কান রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল বা রজনীকান্তের মতন অনুশীলিত ছিল না। মানে তাঁর অনেক গানে এমন সব ছন্দপতন আছে যাকে সহজেই নিখুঁৎ করা যেত এবং করলে সুরের জৌলুষ বাড়ত বৈ কমত না। এরূপ ক্ষেত্রে যে গানের ছন্দও নিখুঁৎ হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এ নিয়ে বোধকরি রসিক সমাজে মতদ্বৈধ হবে না।

কিন্তু একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মানতেই হবে যে অতুলদার অনেক গানেই ছন্দের ফাঁক সুরে এমন অপরূপভাবে ভরাট করা হয়েছে যে ফাঁক রাখা অন্যায় হয়নি—যথা, ধরা যাক তাঁর 'শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।' রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত গানের নজির দিচ্ছি আমার এ-ওকালতির সপক্ষে :

না, না গো না, কোরো না ভাবনা,
যদি বা নিশি যায় যাব না যাব না···

চিরকুমার সভায় এ-গানটি সুরে শোনবার সময় আমার মন আনন্দে উজিয়ে উঠেছিল—তাই বলছি এ-গানে ছন্দপতনকে খুঁৎ বললেই ভুল হবে। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার অধিকাংশ গানেই রবীন্দ্রনাথ এইভাবেই সুরের জন্যে ফাঁক রেখেছেন তাঁর ছন্দে। আমি এ-গানগুলি সুরের সংগতে শুনিনি, তবে মনে আছে রবীন্দ্রনাথ আমাকে প্রায় বলতেন যে, কাব্যে ছন্দকে নিখুঁৎ করা চাইই বটে, কিন্তু গানের বেলায় সময়ে সময়ে সুরকে ছাড়া দেওয়ার জন্যে ছন্দের ফাঁক রাখলে অপরাধ হয় না।

একথা সশ্রদ্ধে মেনেও বলব যে অতুলদার অনেক গানের ছন্দে এরকম ফাঁক সমর্থনীয় হলেও তাঁর অনেক ছন্দে—তথা মিলে—কান ব্যাহত না হয়েই পারে না। কিন্তু এটুকু উল্টো গেয়ে ফিরে তাঁর গানের সাধুবাদে বলতে পারি অসংকোচেই যে তাঁর শ্রেষ্ঠ গানে মন যে গভীর আনন্দ পায় তার জন্যে সংগীত রসিকদের কাছে তিনি চিরদিনই বাংলার একজন বড় কবি না হন, সুরকার বলে আদরণীয় থাকবেনই থাকবেন।

স্মৃতিচারণ, প্রথম খণ্ড

অতুলপ্রসাদ সেন

অতুলপ্রসাদ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

স্বর্গীয় অতুলপ্রসাদ সেন আমার ভারী বন্ধু ছিলেন। আপনারা আমাকে এই সমস্ত মৃত্যুর পরে শোকসভায় বক্তৃতা করার জন্য কেন ডাকেন? মানুষে জানে আমি বক্তৃতা করতে পারিনে; তবু আমাকে ডেকে এনেছেন আজকের-দিনে আপনাদের কিছু বলবার জন্যে।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তাঁব সঙ্গে আমাব দেখা হয়েছিল। অনেক আলাপ-পবিচয় সেদিন তিনি করলেন। তার কিছুদিন পরেই তাঁর পবলোক-গমনের খবর পাওয়া গেল—আমি বিস্মিত হলাম এই পর্যন্ত, কোনোরকম দুঃখ বা শোক আমাব এল না। মানুষের একটা বিশেষ বয়সেব পরে মানুষ যখন যায় তখন সেটা এমন নিশ্চিত জিনিস মনে হয় যে সেটা আমার কাছে আনন্দের আকারে দেখা দেয়।

অতুলপ্রসাদ ছিলেন ভারী ভক্ত এবং ভগবৎপ্রেমে তাঁর মন পবিপূর্ণ ছিল। তার দয়া, দান, দাক্ষিণ্য জানাবার লোক এ সভায় নেই—তাঁরা অত্যন্ত গরীব, —অখ্যাত অজ্ঞাত অজানা লোক। তাঁবা যদি আসতে পারতেন, তাহলে বলতেন কত বিপদের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে অতুলপ্রসাদ দিয়েছেন এবং তাঁদের বিপদ থেকে মুক্ত করেছেন।

তাঁর গান বাংলাদেশ ছাড়িয়ে যেখানে যেখানে বাঙালি আছেন সেখানে পৌঁছেচে। তাঁর জীবনটিও ছিল ঐরকম ধরনের। সংসারে থাকতে হলে দুঃখ, আনন্দ, ব্যথা সবই আছে; তিনি তাঁর বাইরে ছিলেন না। তারপর তাঁর দিন এল—ডাক পড়ল—তিনি চলে গেলেন। বয়সে যাঁরা কম তাঁবা এই নিয়ে অশ্রুপাত করতে পারেন, কিন্তু আমাদের দিন এসে পড়েছে—সেই দিক দিয়ে আমার অতুলপ্রসাদের জন্য শোকবোধ হয় না। মনে হয় এই নিয়ম,

এই রকমেই মানুষ যায়—তুদিন আগে আর তুদিন পরে। তাঁর মৃত্যুর মধ্যে সান্ত্বনা এই যে, তিনি কখনও তাঁর ক্ষতি করেননি—সকলের ভাল করে গেছেন।

গানের ভিতর দিয়ে, কাব্যের ভিতর দিয়ে তিনি বাংলা ভাষার অনেক উন্নতি করেছেন। তাঁর গানের মত ছিল তাঁর জীবন। এমনি করে এই ধারা ধরে বাংলা সাহিত্যকে যাঁরা বড় করেছেন অতুলপ্রসাদ তাঁদের মধ্যে একজন।

আমিও একজন লেখক—বাংলাভাষার সেবক। আমার তাই মনে হয়—এমনি করে আরও কিছুদিন তিনি দিয়ে যেতে পারতেন। তাঁর দিন এসেছিল। তিনি চলে গেলেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে, ব্যথার সঙ্গে এই কথাই মনে করছি—তিনি আমাদের মধ্যে নেই।

আজকের দিনে বিশেষভাবে স্মরণ করি—আমাদের মাঝ থেকে আমাদের বন্ধু সরে গেলেন, তাঁর আত্মার কল্যাণ হোক এই আমার আজকের দিনের প্রার্থনা।

১৩৪১। টাউনহলে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনে অতুলপ্রসাদ-স্মৃতিসভায় সভাপতির ভাষণ

আমার স্মৃতিতে অতুলপ্রসাদ

সুরেশ চক্রবর্তী

পঞ্চাশ বৎসরের পূর্বাপর স্মৃতিচারণ করতে বসে

'তবু মনে হয় যেন সেদিন সকাল'।

ব্যক্তি অতুলপ্রসাদ! কবি ও সুরকার অতুলপ্রসাদ, মানব-দরদী অতুলপ্রসাদ!

এই মহান মানুষটির সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তটি আমার জীবনে এক পরম লগ্ন। এই শুভ লগ্নটির আবির্ভাবের পূর্বতন কাহিনীর বিবৃতি কিছুটা আত্মকথনের অপেক্ষা রাখে।

কৈশোরের চাপল্য ও যৌবনের প্রথম পদধ্বনির সন্ধিক্ষণে জীবনের রঙ্গমঞ্চে যে উচ্ছলিত দৃশ্যগুলি অভিনীত হয়েছে তার স্মৃতি মনে জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বাগ্রে একটি আপাততুচ্ছ ঘটনার কথাই মনে পড়ে যা আমার সাহিত্য জীবন-ধারার গতিপথের প্রথম উৎস। সুতরাং নবীন সাহিত্যব্রতীর মনের রহস্য-ব্যঞ্জনার ইতিবৃত্তটুকু পুনরাবৃত্তি না করলে অতুলপ্রসাদ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হবে না। বাংলা সাহিত্যে আকৃষ্ট আমার মানস-চিন্তা নানা খাতে প্রবাহিত। হাতে-লেখা একখানি মাসিকপত্রের প্রকাশ তারই ফলশ্রুতি। কিন্তু উচ্চাভিলাষের অঙ্কুরটি অন্তরে ক্রমবর্ধমান হয়ে আমাকে সর্বদা এক স্বপ্নরাজ্যে বিচরণে বিভোর করে রাখত।

সেটা ১৯২০ খৃষ্টাব্দ।

বাংলার বাইরে বাঙালির অবহেলিত মাতৃভাষার প্রতি আকর্ষণ যেন দুর্নিবার হয়ে উঠছে। বর্তমান শতকের প্রথম দশকেও বাঙালি ছেলেরা একত্রে বেড়াবার সময় আপনাদের মধ্যে হিন্দিতে কথাবার্তা বা রহস্যালাপ করত, এমনকি বাড়িতেও পরিজনদের মধ্যে হিন্দিতে বাক্য-বিনিময়

চলত। এ রূপের পরিবর্তন দেখা গেল। প্রায় প্রতি বড় সহরেই বাংলা স্কুল ও বাংলা পাঠাগারের দ্রুত প্রসার ঘটতে লাগল। প্রবাস থেকে জনকয়েক বাংলা সাহিত্যসেবীর অভ্যুত্থানে একটা আশার আলোকে যেন কুয়াশা কাটতে শুরু করল।

ধর্মপীঠ ও জ্ঞানপীঠ দুয়েরই সমন্বয় এই কাশী। আবহমানকাল থেকেই কাশী বাঙালির বড় প্রিয়।

একালটায় স্বাস্থ্যান্বেষী বঙ্গবাসীরা দূর দেশ বলতে মধুপুর, শিমুলতলার পরে কাশীর কথাই ভাবতেন। তীর্থভ্রমণাভিলাষী পর্যটকদের কথা স্বতন্ত্র।

বহু কীর্তিমান বঙ্গদেশীয়দের আগমন যখন-তখন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, ঐতিহাসিক অথবা কি না! সুদূর মানস-সরোবর তীরবর্তী বলাকার মত তাঁরা বহন করে আনতেন বাংলা সংস্কৃতির আবহাওয়া, বাংলাদেশের সাহিত্যের নতুন দিগন্তের বার্তা। তাঁরা স্বল্পকালীন অবসর-বিনোদনের স্থান হিসাবে নির্বাচন করতেন বাঙালি-অধ্যুষিত এই উত্তরবাহিনী গঙ্গা-তীরবর্তী বারাণসীকে।

এ সুযোগ কিন্তু প্রবাসের অন্যত্র দুর্লভ।

বাঙালিরা নানা কর্মোপলক্ষে দূর-দূরান্ত প্রদেশে কর্মমুখর জীবনযাপন করতেন ঠিকই কিন্তু বাংলার সজল স্নিগ্ধ বাতাসের রোমাঞ্চকর স্পর্শ থেকে তাঁরা যে কিঞ্চিৎ বঞ্চিত, একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না। এই মাপ-কাঠিতে উত্তর ভারতের অন্য প্রদেশ থেকে কাশী ব্যতিক্রম।

এমনই দিনে একটি সাহিত্য-পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল এখানে। পরিমণ্ডল শব্দটার ওজন বেশি, মজলিশ শব্দটা বেশ ঘরোয়া। বিশেষ যেখানে সুরসিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যমণি। এ-আসরটি বসত নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসগৃহে। মণিবাবু তখন লেখনী পরিত্যাগ করে বণিকের মানদণ্ড হাতে তুলে নিলেও তাঁর গৃহের মজলিসটি ছিল সাহিত্য-রসের মধুচক্র। কবি কিরণচাঁদ দরবেশ, রবীন্দ্রভক্ত সাহিত্যানুরাগী অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ইতিহাসের অধ্যাপক বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য, উদীয়মান তরুণ লেখক মহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রমুখ মধুকরের আনাগোনা চলত এই মধুচক্রে। বহিরাগত ভ্রমরের গুঞ্জনও আসরকে সচকিত করে তুলত কখন-সখন।

রচনার মুখপাতে যে উচ্চাভিলাষের অঙ্কুরটির আভাস দিয়েছিলাম সেটি হাতে লেখা মাসিকপত্রটির পরিবর্তিত মুদ্রণাঙ্কিত রূপ।

উচ্চাভিলাষ কথাটির অন্য অর্থ আমার কাছে অবান্তর। মনের সংগোপনে রক্ষিত এই অনুচ্চারিত আকাঙ্ক্ষার খবরটি রাখতেন যে একজন তিনি কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলা সাহিত্যে তখন মাসিকপত্রিকার স্বর্ণযুগ। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মানসী ও মর্মবাণী, ভারতী, নারায়ণ, সবুজপত্র একসাথে।

যেন সাহিত্যের দেবদেউল।

এইসব মাসিকপত্রিকার সমগোত্রীয় একখানা মাসিকপত্র প্রকাশের কল্পনায় এবং সমধর্মী কেদারনাথেব সহমর্মিতায় উদ্দীপিত হয়ে মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে কথাটা বলি। তিনি সাগ্রহে আমার প্রস্তাব সমর্থন করেন। মণিবাবুর ব্যবসা তখন তুঙ্গে, একটি মুদ্রণালয়ের মালিকও তিনি। কার্যত তাঁর সমর্থনের মূল্য আছে।

কি জানি কি ছিল বিধাতার মনে।

জনচিত্তজয়ী বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরিজনসহ বায়ুপরিবতনের জন্য কাশী এলেন ঠিক সেই সময়। আলাপ-পরিচয় ক্রমশ হৃদ্যতায় পরিণত হল। আমাদের মজলিসে তাঁর ঘন ঘন যাতায়াত। তাঁব বাড়িতেও দ্বিতীয় বৈঠকের সমারোহ। সাহিত্য-আলোচনা যত না হোক, বৈঠকী গল্পের আমেজে সে অভাব পূর্ণ করতেন শরৎচন্দ্র।

শরৎচন্দ্রের মন-মেজাজের সঙ্গে তাল রেখে, একদা আমাদের পরিকল্পিত মাসিকপত্র প্রকাশের কথা উত্থাপন করে অসীম সাহসে তাঁকে একখানি উপন্যাস দেবার অনুরোধ জানালাম। সময়টি বুঝি অনুকল ছিল। স্বীকারোক্তি আদায় হল।

উৎসাহের আতিশয্যে আমাদের কর্মচাঞ্চল্য ও উদ্যোগ-আয়োজন জোয়ার উচ্ছ্বসিত নদীর মত লক্ষ্যাভিমুখী।

পত্রিকার নামকরণ করলেন কেদারনাথ। 'প্রবাসজ্যোতি'।

সহববহুল এই প্রদেশে এ-জাতীয় প্রচেষ্টার অগ্রদূত এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত 'প্রবাসী'। অপ্রত্যাশিতভাবে সম্পাদক ও প্রকাশক মহাশয় প্রবাসভূমি ত্যাগ করে অচিরেই স্থানান্তরিত করলেন তাঁদের দপ্তর কলকাতায়। 'প্রবাসী' নামটি রইল, সুসংগতি রইল না।

কলকাতার প্রচার-বর্ধিষ্ণু মাসিকপত্রিকাদিতে 'প্রবাসজ্যোতি'র বিজ্ঞাপনে সাড়ম্বরে 'শরৎচন্দ্রের উপন্যাস' প্রকাশিত হবে কথা ক'টি বেশ বড় বড় অক্ষরে ঘোষিত হল।

চলতি খ্যাতিমান লেখক-লেখিকাদের লেখা পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে পত্র লেখার কাজটির ভারও নিলেন কেদারনাথ।

ভবিষ্যৎ পত্রিকার রূপরেখা অঙ্কিত করে অনুষ্ঠানপত্র লেখা ও ছাপা শেষ। গ্রাহক হবার অঙ্গীকার পত্র, রসিদ বই, বড় বড় নানা বর্ণে রঞ্জিত পোস্টার যা মণিবাবুর মস্তিষ্কপ্রসূত। এক সময়ে থিয়েটারের সংশ্রবে ছিলেন ত'! সব আয়ুধ প্রস্তুত।

সর্ব অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে উত্তর ভারতের বাঙালি-প্রধান সহরগুলিতে 'প্রবাস-জ্যোতি'র প্রচার ও গ্রাহক সংগ্রহের অভিযানে প্রথমেই সংযুক্ত প্রদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লখনৌ অভিমুখে বেরিয়ে পড়লাম।

সর্বাগ্রে এ সহর মনোনয়নের প্রধান কারণ--শরৎচন্দ্রের নির্দেশ ও উপদেশ। আমাদের এ-প্রচেষ্টার সূত্রপাতেই তিনি আমায় বলেছিলেন—'তোমরা একবার লখনৌর এ. পি সেনের সঙ্গে দেখা করবে। ব্যারিস্টার! নামজাদা মানুষ। তাঁর সাহায্য ও পরামর্শ নেবে।' কথাটা ভুলিনি।

কম্প্রবক্ষে নম্রনেত্রপাতে যাত্রা সুরু হল।

বিদেশ-ভ্রমণের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না।

লখনৌ শহরে মকবুলগঞ্জ পল্লীতে এক বাল্যবন্ধুর আশ্রয় নিলাম। নাম দুর্গাপ্রসন্ন। কাশীতেই বাড়ি, সম্প্রতি এখানে কমিশারিয়েট অফিসের একজন করণিক।

লখনৌর পৌরাণিক নাম লখিমপুর বা লক্ষ্মণাবতী। ইংরাজ আমলে এর আদরের ডাকনাম 'সিটি অব্ গার্ডেনস্।'

সহরটি বেষ্টন করে পুষ্পপাদপ-শোভিত অসংখ্য উদ্যান। এই রম্য নয়ন-মুগ্ধকর উপবন-সমাকীর্ণ নগরী নবাগত মুসাফিরকে একবার বিমনা না করেই পারে না। আছে বড় বড় ইমারৎ ও প্রাসাদ। নবাবদের কীর্তি। গোমতী তীরে অবস্থিত ছত্রমঞ্জিল হর্ম্যটি এক বিস্ময়। কৈসরবাগের উদ্যানটির আকর্ষণ দুর্দমনীয়। কল্পনা করতে ভাল লাগে, নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্‌র বেগমরা কৈসরবাগ উদ্যানের আনাচে-কানাচে এখনো বুঝিবা লোকচক্ষুর অন্তরালে নৃত্যপরা। সকালে সন্ধ্যায় ইমামবাড়া থেকে নামাজের ভাবগম্ভীর আওয়াজ সহরটিকে সচকিত করে তোলে।

'কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান'। তবু নিরঙ্কুশ ইংরেজ

রাজত্বেও লখনৌর মুসলমানরা তাদের নবাবী আমলের মেজাজটা একেবারে মুছে ফেলতে পারেনি। পারেনি বলেই তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচরণে এটা প্রকট হয়ে পড়ে। আমিনাবাদের ঘন পথ অঞ্চলে একটি তাম্রখণ্ড-প্রয়াসী দণ্ডায়মান হুঁকাবরদারের হস্তধৃত আলবোলার সটকায় সুখটান না দিয়ে পথিকেরা পথ চলতে অনভ্যস্ত। বটের বাজী, কবুতর বাজী বা পতঙ্গ বাজী (ঘুড়ি ওড়ানো) এসব নবাবী নেশা ছাঁটকাট করেও কিছুটা বিদ্যমান। বেশেবাসে, কায়দাকানুনে, চলনেবলনে নিজেদের যুগটাকে ধরে রাখতে আপ্রাণ সচেষ্ট।

এহেন লখনৌ শহরে পদার্পণ করে আমার প্রথম চিন্তা ব্যারিস্টার এ. পি সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

সেন সাহেব। সামান্য টাঙাওয়ালা থেকে উচ্চকোটির লখনৌ-অধিবাসীর কাছে তিনি সম্ভ্রমের সঙ্গে উচ্চারিত শুধু 'সেন সাহেব'।

এ. পি সেন যে অতুলপ্রসাদ সেন এবং তিনি যে একজন কবি, সংগীতজ্ঞ —এ পরিচয় আমার অজানা। বয়স অল্প, অভিজ্ঞতা স্বল্প। অনেক বিষয়েই ত' অনধিকার।

বঙ্কিমচন্দ্র, নবীন সেন, হেমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, শরৎচন্দ্র এসব সদাপ্রচলিত নামের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা। এঁদের সাহিত্য-সম্ভার আমাকে সারস্বত সাধনায় অনুপ্রাণিত করেছে। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় যেসব কবি ও সাহিত্যিক লেখনী চালনা করে যশস্বী হয়েছেন—তাঁদের নামধাম আমার জিহ্বাগ্রে। কিন্তু অতুলপ্রসাদ!

সাহিত্য-কাননে বড় বড় বনস্পতির আবডালে যে-পুষ্পতরুটিতে কবিতা ও গানের অজস্র ফুল একান্তে প্রস্ফুটিত হয়ে সৌন্দর্য ঢেলে দিচ্ছে সে দৃষ্টিসুখ কয়টি নয়নের!

অতুলপ্রসাদের 'শত বীণা-বেণু রবে ভারত আবার জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে' বা 'উঠগো ভারতলক্ষ্মী, উঠ জগতজনপূজ্যা'—এসব স্বদেশী গান বহুকণ্ঠে গীত হলেও রচয়িতার নামটি জনসাধারণের কাছে অশ্রুতই বলা যায়। মুষ্টিমেয় অভিজাতশ্রেণীর রসবেত্তা সাহিত্যিক ও কবির মধ্যেই অতুলপ্রসাদের কবিকৃতি সীমাবদ্ধ। দু-একখানি মাসিকপত্রিকায় কোনোকালে দু-একটি কবিতা ও গান প্রকাশিত হলেও তা নগণ্য।

এ-যুগে রেকর্ড ও রেডিও অতুলপ্রসাদের নাম ও গান ঘরে ঘরে পৌঁছে দিলেও বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এ নামটি অপরিস্ফুট।

একদা কালক্রমে যেন নন্দন কাননের উদ্যান-পালক সযত্নে পুষ্পতরুটিকে বাংলাদেশ থেকে আহরণ করে দ্বিতীয় নন্দন কানন এই লখনৌ শহরে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

অবশ্য এসব ত' আমার পরবর্তী ভাবনা।

আমার তৎকালীন ধারণায় অতুলপ্রসাদের স্বরূপ তিনি একজন বিখ্যাত ব্যারিস্টার। সাহেবী ধরন-ধারণ, মান্যগণ্য, ধনী ব্যক্তিবিশেষ।

এখন সমস্যা! কে আমায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবে? কোন সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করবার সুবিধা? আমিই-বা কিভাবে আমার বক্তব্য তাঁর কাছে উপস্থিত করব? নিঃসঙ্গ অবস্থায় যেতেও উৎসাহ পাচ্ছি না।

যেটা তখন সমস্যা বলে মনে হয়েছিল, ভাবতে আশ্চর্য লাগে, উত্তরকালে অপরিচিত মহা-মহা দিকপাল সাহিত্যরথীদের সঙ্গে কি অনায়াস ভঙ্গীতেই না দেখা-সাক্ষাৎ করেছি। কথাবার্তায় অস্বাচ্ছন্দ্যের লেশমাত্র থাকত না।

এমনকি কাশীতে নিজের গণ্ডীর মধ্যে অনেকটা স্বচ্ছন্দবিহারী। ধনী মানী গুণিজনের সঙ্গে সহজ ভঙ্গিমায় আলাপচারী।

গণ্ডির বাইরে সর্বপ্রথম আমার এই পদচারণা আমাকে বিহ্বল ও দিশেহারা করে তুলল।

সমস্যা ও সমাধান দুটি বিপরীতধর্মী শব্দ হলেও একে অন্যের পরিপূরক।

কাশীর পরিচিত একজনেব সঙ্গে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ।

'তুমি এখানে?'

প্রশ্নের উত্তরে লখনৌ আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে হল। পরিচিত ব্যক্তিটি উল্লসিত হবার মত লোক নন। তাঁর পরিচয় তিনি পুলিশের একজন ইনফর্মার বা গুপ্তচর। নাম কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

সে-যুগে কাশী একটি বিখ্যাত বিপ্লবকেন্দ্র। বারাণসী ষড়যন্ত্র মামলার উদ্ভব এখানেই।

কাশীর একশ্রেণীর অশিক্ষিত সত্রভোজী নেশাবাজ অকালপক্ক যুবকরা যেমন বহুবিধ কুকার্যের নায়ক, অপরদিকে শিক্ষিত তেজস্বী বিপ্লবধর্মে দীক্ষিত স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ভারতের স্বাধীনতাকামী তরুণদলের সংহতিতে শাসকদল সন্ত্রস্ত।

এই বিপ্লবী দলের কার্যকলাপের প্রতি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখবার ও তাঁদের দমন করবার জন্য যে-দুজন প্রতাপশালী পুলিশ-অধিকর্তা কাশীতে একচ্ছত্র রাজত্ব

চালাচ্ছিলেন—তাঁদের একজনের নাম জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরই অধীনে কাজ করতেন এই কালীকৃষ্ণ অপভ্রংশে কালীকেষ্ট।

শচীন্দ্র সান্যাল, রাজেন লাহিড়ী, মন্মথ গুপ্ত, শচীন বক্সী—এঁরা ত' চিহ্নিত। অচিহ্নিত যুবকদের উপরও শ্যেনদৃষ্টি ছিল পুলিশের।

কালীকেষ্টকে দেখতাম—সন্দেহভাজন ব্যক্তির গতিবিধি লক্ষ্য রাখবার অভিসন্ধিতে সমান অবিচল ধৈর্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে উদ্দিষ্ট বাড়ির সামনে দেয়ালে গা ঘেঁষে। মুখে চুরুট, হাতে একখানা বই।

নাম যদিও কালীকৃষ্ণ—গায়ের রঙটা বেশ ফর্সা। সুপুরুষ বলা যেত যদি তাঁর একটি চোখ টেড়া না হত। চশমার আড়ালে সেই বাঁকা চোখের তির্যক দৃষ্টি লক্ষ্য ভেদ করবার সুবিধাটুকু বিধাতার দান।

স্বভাবটি মিনমিনে। পুলিশের চর জানা সত্ত্বেও লোকের কাছে ভীতিপ্রদ ছিলেন না। গুজগুজ করে অনেক যুবককে নাকি পূর্বাহ্ণে তাঁদের সাবধান হবার ইঙ্গিত দিতেন।

গোয়েন্দা-কর্মের বাইরে সাহিত্য-হাটের ছোটবড় অনেক খবর তাঁর নখদর্পণে।

তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শিবকৃষ্ণবাবু মণিবাবুর অফিসের একজন কর্মচারী। ঐ সূত্রে ওখানে গতায়াত মাঝে মাঝে। আমি কালীকেষ্ট নামের সঙ্গে একটা 'দা' যোগ করে ডাকতাম কালীকেষ্টদা।

হঠাৎ এ-সময়ে এ-সহরে তাঁকে দেখে বিস্মিত হইনি। পেশাগত কারণে লখনৌ আসা তাঁর এমনকি অস্বাভাবিক!

আমি এ. পি সেনের সঙ্গে দেখা করতে উৎসুক জেনে আমায় আশ্বাস দিলেন—'তোমায় মি. সেনের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব।'

এ. পি সেনের সঙ্গে এঁর মাধ্যমে পরিচিত হতে আমি একটু ইতঃস্তত করছিলাম। কিন্তু মুখে উৎসাহ দেখিয়ে বললাম—'বেশ ভাল হয় তাহলে। কবে নিয়ে যাবেন বলুন?'

'কাল সকালে। এই ত ব্যাংকস্ রোডে তাঁর বাংলো।'

একটা নির্দিষ্ট স্থানে আমায় অপেক্ষা করতে বলে তিনি বিদায় নিলেন।

কৈসরবাগ প্রবেশপথের অদূরবর্তী রাস্তাটি ব্যাংকস্ রোড। এরই দক্ষিণ প্রান্ত ঘেঁষে একটি বাংলো ধরনের পাকাবাড়ি। রাস্তার উপরের ফটক দিয়ে ভিতরে

ঢুকলাম। সঙ্গী কালিদা। বাংলোর চারপাশটা বেশ ফাঁকা। অল্প-স্বল্প গাছ-গাছড়ার সন্নিবেশ।

সন্ধানী দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক দেখছি। ঝাড়ন হাতে একজন বেয়ারা সামনে এসে হাজির। সেনসাহেবের দর্শনপ্রার্থী জেনে সে হিন্দী-উর্দু মেশানো ভাষায় যা বললে, তার সার কথাটুকু: 'সায়েব এখন গোসলখানায়। অন্তত আধঘণ্টা দেরী হবে। তারপর দপ্তরখানায় এসে বসলে তখন দেখা হবে।'

গুটিকয়েক সিঁড়ি উপেক্ষা করে বারান্দায় উঠলাম বেয়ারাকে অনুসরণ করে। বারান্দার পশ্চিমদিকের ঘরখানার সামনে একখানা লম্বা বেঞ্চি। ইশারায় উপবেশন করবার স্থানটি দেখিয়ে সে অন্তর্হিত হল।

পাশাপাশি দুজনে নিঃশব্দে বসে রইলাম বেঞ্চির উপর।

আষাঢ় মাস হলে হবে কি! সংযুক্ত প্রদেশের আকাশে মেঘদূতের প্রবেশ নিষেধ। তবে আনাগোনায় আপত্তি নেই। খণ্ড মেঘের আড়াল থেকে ঝলমল আলো এসে পড়েছে গাছগুলির মাথায়!

একটু অন্যমনস্ক ভাব দু'পক্ষেই। অতর্কিতে কানে এল মধুর কণ্ঠের মৃদু গুঞ্জন। গুঞ্জন ক্রমশ রূপায়িত হয়ে উঠল ধ্বনিতে। ঝরঝর জল-তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে কানে ভেসে এল একটি গানের কলি:

'কবি হে, তুমি আমার সকল হবে কবে?'

যেখানটায় বসে আছি, তার সংলগ্ন ঘরটিই নিশ্চয় স্নানাগার। গায়ক স্নানপর্ব উদ্‌যাপন করছেন স্বতঃনিঃসৃত সংগীত-উপচারে।

গানের কথায় ও সুরের মাধুর্যে মোহাবিষ্টের মতন কতক্ষণ মগ্ন ছিলাম, জানি না।

তন্ময়তা দূর হল কার আহ্বানে। তাকিয়ে দেখি পশ্চিমদিকের ঘরখানার দ্বার উন্মুক্ত। এদেশীয় একটি ভদ্র চেহারা আমাদের উপবেশন-কক্ষে দুখানা চেয়ার দেখিয়ে বসতে অনুরোধ জানিয়ে 'সায়েব আসছেন' এ-সংবাদটুকু ঘোষণা করে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

আমরা চেয়ারে বসে কক্ষটির চারপাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলাম। আলমারিতে চামড়া-বাঁধানো স্বর্ণাক্ষরে নাম লেখা বইগুলি সাজানো। সামনে একটি প্রশস্ত টেবিল, তার একধারে সুবিন্যস্ত কিছু নথিপত্র।

একটি মন্থর পদধ্বনির শব্দে সজাগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতের দ্বার

দিয়ে আবির্ভূত হলেন একজন দীর্ঘকায়, নাতিস্থূল, পাশ্চাত্ত্য পরিচ্ছদে সজ্জিত স্বভাব-গম্ভীর প্রৌঢ় মানুষ। আমরা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম এবং দাঁড়িয়েই রইলাম। তিনিও তাঁর কেশবিরল মস্তকটি সামান্য নত করে হাত দু'খানি জোড় করে নমস্কারের ভঙ্গীতে যেন আমাদের স্বাগত জানালেন। সুবিন্যস্ত গোঁফের ফাঁকে একটুকরো হাসি ফুটিয়ে—'এই যে বসুন, বসুন।'

কালিদার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে—'কি ব্যাপার, হঠাৎ এ-সময়ে?' অনুমান করতে পারলাম, পরিচয়টা একেবারে শূন্যগর্ভ নয়।

এবার আমার পালা। 'ইনি?' উত্তরে কালিদা বললেন—'আপনার সঙ্গে দেখা করতেই ত লখনৌ এসেছেন।'

'তাই নাকি—তা—'

এই শান্ত অথচ রাশভারী লোকটির সান্নিধ্যে কিছুটা আড়ষ্ট বোধ করলেও মুহূর্তে আত্মবিশ্বাসে প্রবুদ্ধ হয়ে বলে উঠলাম—'কাশী থেকে একখানি মাসিকপত্র বের করতে যাচ্ছি, আপনার সহায়তা ও পরামর্শ পাব এই আশায় লখ্‌নৌ এসেছি।' শরৎচন্দ্রের নির্দেশেই যে তাঁর কাছে এসেছি—এ-কথাটারও উল্লেখ ছিল।

এখানে একটু অপ্রাসঙ্গিক কৌতুক-কথার অবতারণা করছি। যদিও বহু বৎসর পরের কথা। সেদিন অতুলপ্রসাদের অনুজের আসনটি আমার দখলে। এই ধীর, স্বল্পবাক মানুষটি আড্ডা-মজলিসে কতখানি স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারেন —বারবার তা দেখেছি, উপভো করেছি। কোনো এক ছুটির দিনে অতুলদার ড্রইংরুমের আসরটি জমজমাট। প্রিয়জনরা অনেকেই উপস্থিত। আলোচ্য বিষয় গুরুগম্ভীর ছিল না। হাল্কা মেজাজের গালগল্প। মজলিশী গল্প কে কত রসিয়ে বলতে পারে—এ-প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের নাম উচ্চারিত হতেই বৈঠকের রসভঙ্গ করে বললাম—'অতুলদা, হয়ত আপনার মনে পড়বে না, আপনার সঙ্গে লখনৌ এসে প্রথম সাক্ষাৎ করি শরৎদারই উপদেশে। তাঁর সঙ্গে আপনার আলাপ ত বহুদিনের। শরৎদার গল্প ত অনেক। আপনার জানা কিছু বলুন না।'

অতুলদা তাঁর স্বভাবসুন্দর হাসিটি ফুটিয়ে বললেন—'এমন কিছু আমার জানা নেই, তবে তাঁর রহস্যপ্রিয়তার একটি ছোট ঘটনা মনে পড়ছে। ঘটনাটা এখানেরই।

বেলা তখন প্রায় নটা। মক্কেল বিদায় দিয়ে কোর্টে যাবার তোড়জোড়

করছি, বেয়ারা এসে খবর দিলে—কে একজন মৌলবীসাহেব আমার সঙ্গে দেখা করতে চান, বাইরে অপেক্ষা করছেন। বেরিয়ে এসে দেখি—একজন মুসলমান ভদ্রলোক। পরনে ধুতি, গায়ে চাপকান, মাথায় উঁচু তুর্কী টুপি। দাড়ি ত ছিলই।

কি অতুলবাবু, চিনতে পারেন?

ইতঃস্তত করছি।

অকস্মাৎ মাথার ফেজটি খুলে হাসতে লাগলেন।

শরৎবাবু, আপনি?

চিনতে পেরেছেন তাহলে। দুজনেই হাসতে লাগলাম।'

স্মরণীয়—শরৎচন্দ্রের তখন দাড়ি ছিল, মাথার তুর্কী টুপিটাই এক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতক।

'প্রবাসজ্যোতি'র অনুষ্ঠানপত্র তাঁর হাতে দিতেই তিনি পুস্তিকাটির পাতা উলটে উলটে চোখ বুলোতে লাগলেন। একটু আগ্রহ ও ঔৎসুক্য যেন প্রতিফলিত হল তাঁর চোখেমুখে।

'বাঃ! এ ত খুব ভাল কথা। বলুন কি করতে হবে?'

'লখনৌ থেকে পত্রিকার জন্য কিছু গ্রাহক সংগ্রহ করতে চাই। এ-বিষয়ে কিভাবে অগ্রসর হওয়া যায়? আমি ত' এ শহরে নবাগত—কারও সঙ্গেই তো জানাশোনা নেই। আপনার সুপরামর্শই আমার ভরসা।'

এইরকমই কিছু বলে থাকব।

মুখে কোনো উত্তর না দিয়ে তিনি টেবিলের ড্রয়ার থেকে লেখবার প্যাড বের করে খসখস করে দু'খানা চিঠি শেষ করে, খামে ভরে, তার উপর নাম ও ঠিকানা লিখে আমার হাতে দিলেন। বললেন—'এঁদের সঙ্গে দেখা করুন, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

খাম খুলে চিঠি দু'খানি পড়লাম। বয়ান একই। চিঠির নীচে নাম স্বাক্ষর—অতুলপ্রসাদ সেন।

সংক্ষিপ্ত এ. পি সেনের পুরাদস্তুর নামটির সঙ্গে আমার এই প্রথম পরিচয়।

আমার ঈপ্সিত কার্যে আনুকূল্য করার সুপারিশপত্র দু'খানি হাতে নিয়ে নমস্কার জানিয়ে দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম।

প্রারম্ভিক পদক্ষেপ যে শুভপদ—এতে মনটা আনন্দ-উচ্ছল। কালিদার কাছে আমি সত্যাই কৃতজ্ঞ।

বন্ধু দুর্গাপ্রসন্ন আমার কথানুযায়ী স্থানীয় একজন কামলা দিয়ে 'প্রবাস-জ্যোতি'র চিত্র-বিচিত্র পোস্টারগুলি শহরের বাঙালিপ্রধান মহল্লার দেওয়ালে দেওয়ালে সেঁটে দিয়েছে। লক্ষ করেছিলাম সেগুলি বাঙালি অধিবাসীর সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

পত্র দু'খানি যাঁদের নামে আজ বহু বর্ষ পরে তাঁদের নাম দু'টি মনে রাখতে না পারলেও একজনের নাম আবছা-আবছা স্মরণ হয়। তিনি হরিনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় নামটি আমার স্মৃতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

দুজনেই কর্মে একনিষ্ঠ, আদর্শবাদী যুবক। তাঁদেব কাছে প্রদত্ত সুপারিশ-পত্র দুখানি যেন প্রত্যাদেশপত্র। তাঁরা আমায় সঙ্গে নিয়ে তত্রত্য প্রতিটি বাঙালি পরিবারের বাড়ি বাড়ি ঘুবে বেড়াতে লাগলেন। 'ও, সেন সাহেব পাঠিয়েছেন।' আর কথা কি। তাঁরাও অতুলবাবু সম্বোধন করেন না। তাঁদেব কাছেও তিনি সেন সাহেব। এই নামটির প্রতি এঁদের কতু অবিচল শ্রদ্ধা। আবাব শ্রদ্ধার পরিবর্তিত রূপ প্রীতি ও ভালবাসা।

সময়টা উনিশ-শো একুশ-বাইশ। লখনৌয়ে বাঙালির সংখ্যা তুচ্ছ করার নয়। ব্যবসায়ী বাঙালি, ব্যবহারজীবী বাঙালি, চিকিৎসক বাঙালি, শিক্ষাব্রতী বাঙালি, চাকুরিজীবী বাঙালি—দিনদিনই বাঙালিব বাড়-বাড়ন্ত। মডেল-হাউস মহল্লাটি ত' কাশীর বাঙালিটোলা। তাছাড়া নগবের এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত—সেখানেও বাঙালি মুখের উঁকিঝুঁকি।

গোমতীর অপর পারে নবনি[illegible]ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাসাদ-চত্বরেও সদ্য-আগত উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপক বাঙালিদের ক্ষীণ পদধ্বনি।

ইয়ং মেনস এসোসিয়েসন, বেঙ্গলী ক্লাব প্রভৃতি বাঙালির নিজস্ব প্রতিভার মৌলিক স্বাক্ষরও বর্তমান।

কিন্তু বাঙালি ছেলে-মেয়েদেব মাতৃভাষা পঠন-পাঠনের কোন বিদ্যায়তন? হয়ত আমার চক্ষুকে প্রতারিত করেছে।

আশাতীত গ্রাহক সংগ্রহ হল 'প্রবাসজ্যোতি'র। কায ত সিদ্ধ। সুতরাং সিদ্ধিদাতার সমীপে প্রণিপাত না করে যাওয়া ত' অকৃতজ্ঞতা।

সময়টা জানাই ছিল। যথাসময়ে সেন সাহেবের চেম্বারে এসে সব বৃত্তান্ত জানালাম।

তিনি খুব খুশি। বললেন, 'আমাকেও গ্রাহক করে কাগজ পাঠাবেন।'

চকিতে একটা কথা মনে পড়ল। শরৎচন্দ্র ত একথাও বলে দিয়েছিলেন—'ওঁর কাছ থেকে লেখা-টেখা চেয়ে নেবে।'

'কি লেখেন ইনি!' ভাবলাম, 'লেখা চেয়ে এঁকে একটু আপ্যায়িত করে রাখা ভাল। এঁর জন্যই ত' এত গ্রাহক সংগ্রহ হল।'

ভদ্রলোককে তুষ্ট করবার মনোভাব আর কি! আমার মনোজগত তখন ত' ছোট পরিধি মাত্র।

'আপনাকে লেখা দিতে হবে।'—একটু আবদারের সুর ফুটে থাকবে আমার কণ্ঠে। পূর্বের আড়ষ্ট ভাবটা অনেক শিথিল। সান্নিধ্যটুকুও ভাল লাগছিল।

তিনি সলজ্জে বললেন: 'আমি ত' বড় একটা লিখি না। তবে গান-টান কিছু লেখা আছে খাতায়। যদি আপনাদের ভাল লাগে এর থেকে বেছে নিতে পারেন।'

ড্রয়ার থেকে ধুলো ঝেড়ে একখানা 'এক্সারসাইজ বুক' আমার সামনে এগিয়ে দিলেন। খাতাখানি বেশ পুরনো। পাতাগুলিও খুলে খুলে পড়তে চাইছে। অক্ষরগুলির উজ্জ্বল কালিও কিছু ম্লান। সদ্যোলিখিত যে নয় এটা সুস্পষ্ট।

আমি একটির পর একটি গান পড়ে যেতে লাগলাম। সেন সাহেব তখন নিজের নথিপত্র নিয়ে ব্যস্ত।

একখানি সাদা কাগজ চেয়ে নিয়ে পরপর দুটি গান নকল করে খাতাখানি তাঁকে ফেরৎ দিলাম। বললাম: 'দুটি গান নিলাম।'

হাতের প্রতিলিপি-করা কাগজখানি চেয়ে নিয়ে তার উপর নিমেষমাত্র দৃষ্টিপাত করে সেখানি তিনি আমাকে প্রত্যর্পণ করলেন।

নির্বাচন তাঁকে সন্তুষ্ট করেছে, প্রশংসিত চোখ দুটিই তার সাক্ষ্য।

গান দুখানি এই,

(১) মোদের গরব, মোদের আশা · (২) হরি হে, তুমি আমার সকল হবে কবে…

প্রথম গানটি নির্বাচনের মূলে আমার নির্জ্ঞান মনের প্রেরণা।

দ্বিতীয় গানটির কথা ও সুর পূর্বশ্রুত। যেদিন প্রথম অতুলপ্রসাদের বাস-ভবনের অলিন্দে অপেক্ষারত, আমার কর্ণে স্নানাগার থেকে উত্থিত সেই অপূর্ব সুরমূর্ছনা বুঝিবা এই গানটি আহরণের মূলাধার।

হৃষ্টচিত্তে বিদায় নিলাম—অতুলপ্রসাদ বা লোককান্ত এ. পি সেনের কাছ থেকে।

লখনৌ থেকে উত্তর ভারতের কয়েকটি শহর পরিভ্রমণ করে 'প্রবাস-জ্যোতির' প্রচার ও গ্রাহক-সংগ্রহ অভিযানে সমাপ্তি-রেখা টেনে ফিরে এলাম কাশীতে।

সহকর্মীরা, বিশেষ করে দাদামশাই কেদারনাথ আমাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন—যিনি এই সাহিত্যযজ্ঞের পুরোধা। উৎফুল্ল হলেন মণিবাবুও—যজ্ঞেশ্বর ত' তিনিই।

প্রবাসজ্যোতি!

প্রবাসে বাংলা সাহিত্যপত্রের প্রথম বৈজয়ন্তী আকাশপৃষ্ঠে উড্ডীয়মান। সেই দোদুলামান পতাকার শীর্ষে প্রবাসী বাঙালির যে ধ্যানমন্ত্রটি উৎকীর্ণ সেটি অতুলপ্রসাদের 'আ মরি বাংলা ভাষা।'

সময়টা বঙ্গাব্দ আশ্বিন ১৩২৭।

অতুলপ্রসাদের সঙ্গে প্রাথমিক যোগাযোগের নাটকীয় বর্ণনার আলেখ্যটি—তাঁর সঙ্গে আমার মহত্তর পরিচয়ের পূর্বাভাসমাত্র। উত্তরজীবনে অতুলপ্রসাদের মনের কেন্দ্রবিন্দুটির সঙ্গে আমার সাহিত্য-ভাবনার যে-সংযোজন ঘটেছিল—প্রবাসী বাঙালির ধ্যান-ধারণার সেটি চিহ্নিত ইতিহাস। তাঁর সম্বন্ধে স্মৃতিকথা লিখতে বসে প্রথমে স্বীকার্য একটি বিষয়ের উল্লেখ অত্যাবশ্যক। এ স্মৃতিচারণ, নির্দিষ্ট একক গণ্ডীর মধ্যেই যার চলাফেরা। অতুলপ্রসাদের পারিবারিক, রাজনৈতিক বা এমন অন্য কোনো চর্চা যাতে আমার অনধিকার তাতে আলোকপাত করবেন বহুজ্ঞরা। যৌবনের প্রথম সূর্যালোকে যে মহিমময় ব্যক্তিত্বটি আমার ঈপ্সিত পথযাত্রার দিশারী—তারই স্বীকৃতি এই স্মরণীয় উপচার।

এটুকু জানিয়ে আবার অতীতে ফিরে আসা যাক।

'প্রবাসজ্যোতি'র প্রকাশে আমার মনের আকাশে 'আকাশ-কুসুম' ফুটল ঠিকই তবে সে খ-পুষ্পটি বিলীন হয়ে গেল বৎসরকাল মধ্যে।

মাণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মাসিকপত্রটির অঙ্গরাগ ও মুদ্রণে যে-দৃষ্টান্ত

রাখলেন—যা তৎকালীন কলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিকপত্র-সমাজের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। বিংশ শতাব্দের প্রথম পরিচ্ছেদে যদিও মানাত তিরিশের প্রাক্‌কালে তা যে সৃষ্টিছাড়া, মণিবাবুর তদানীন্তন চিন্তনে তা অনুপস্থিত। আমাদের কল্পনায়-গড়া রূপোজ্জ্বল বঙ্গবাণী মন্দিরকে প্রদক্ষিণ করে এ যেন ফেলা হল এক কৃষ্ণ যবনিকা। আমাদের এত পরিশ্রম, এত উৎসাহ-উত্তেজনা, এত স্বপ্নবিলাস সমস্তই ব্যর্থতার আঘাতে মুহ্যমান। ক্ষোভে-হতাশায় ম্রিয়মাণ হলেও সান্ত্বনার কিছু আছে, আমার শূন্য অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ধীরে ধীরে সঞ্চয়িতা হয়ে উঠেছিল। 'প্রবাসজ্যোতি' সেবার পুরস্কার।

বহির্বাণিজ্যটুকুও উল্লেখনীয়। দেবী সরস্বতীর কৃপাধন্য কৃতকৃতা সাহিত্য-সেবকদের বহুজনের পরিচয় পত্র ও সাক্ষাতের মাধ্যমে ঘন হতে শুরু করেছিল। আমার ভবিষ্যতের মূলধন।

যৌবন জল-তরঙ্গ রোধিবে কে!

উদ্যোগ-আয়োজন আবার আরম্ভ। নবীন চিন্তাসমৃদ্ধ, যুগোপযোগী, সুমুদ্রিত মাসিকপত্রের প্রকাশ আসন্ন। 'বহু যুগের ওপার হতে আষাঢ় এল আমার মনে' গানখানি পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ। নাম 'অলকা'। ১৩২৮ ফাল্গুন, দ্বিতীয় পর্বের শুভারম্ভ। শুভারম্ভ কথাটি আমাদের নিজস্ব। নিজস্ব শব্দটিও যে অনুকূল, সেটা বুঝতে দেরী হল না। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত 'অলকার' অকাল তিরোধানে।

বাংলায় একটা প্রবচন আছে—'দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো।' আমার অবদমিত সাহিত্য-আকাঙ্ক্ষা এখন ঐ প্রবচনটিকে মানপত্র দান করে, আত্ম-নিগ্রহের প্রতীকরূপে পুনরায় দেখা দিল ক্ষুদ্র এক পাক্ষিক পত্রিকা—'প্রবাসী বাঙালী'।

এসব কাহিনী উত্থাপনের মুখ্য কারণ আমার সাহিত্যকৃতির খুঁটিনাটি সংবাদও যে অতুলপ্রসাদের গোচরে এবং তিনি যে এসব ক্রিয়া-কলাপে কিঞ্চিৎ কুতূহলী—উত্তরকালে যার নজীর আছে।

বাংলা ১৩২৮—২৯ সাল।

প্রবাসি-বাঙালির চিন্তারাজ্যে সমাজ-সচেতন মনোভাব সঞ্চারিত করা, মাতৃভাষার প্রতি ঔদাসীন্য দূর করা, বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে

একাত্মতা স্থাপনের একটা স্বপ্ন—কিছু চিন্তাশীল মনে ক্রমবর্ধমান। প্রত্যাশিত সুযোগের মুখাপেক্ষী অনেকেই।

কানপুরের 'বঙ্গসাহিত্য সমাজ'-গৃহে এক বার্ষিক উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে এলেন যুক্তপ্রদেশের নানাস্থান থেকে কিছু প্রথিতযশা বাঙালি মনস্বী। লখনৌ থেকে আগত অতুলপ্রসাদ ও ড' রাধাকমল এঁদের মধ্যে প্রধান।

এই সমারোহে স্বাগত-সমিতির সভাপতি স্থানীয় বাঙালিদের কর্ণধার ও ঐ সহরের সর্বজনগ্রাহ্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন।

সভাপতি মাননীয় অতুলপ্রসাদ সেন।

উভয়ের ভাষণের মধ্যেই উচ্চার্য ঘোষণা—বহির্বঙ্গের বাঙালিদের একটি সম্মিলনী প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা। সভানায়ক অতুলপ্রসাদ ভাষণে পরিস্ফুট করলেন—ভবিষ্যৎ সম্মেলনের অনেক কার্যকর প্রস্তাবনা ও পথনির্দেশ।

সকলেই সাগ্রহে একমত হলেন। অতুলপ্রসাদকে পুরোভাগে রেখে সম্মিলনীর নামকরণ হল—'উত্তর ভারতীয় বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনী'।

এই সম্মিলন-প্রতিষ্ঠার পশ্চাৎপটে যে আর একটি অলিখিত ইতিহাস গর্ভগৃহে ভ্রূণাবস্থায় অদৃশ্য কানপুরের সূতিকাগারে উত্তর ভারতীয় বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের জন্মমুহূর্তে সেই ভাবনাটি উপেক্ষণীয় হবে না। সংক্ষেপে রসবেত্তা সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু স্মরণ করি।

'আমার জীবন-কথা'য় তিনি লিখেছেন: '১৯০৫ অগস্ট অর্থাৎ তিন বৎসর পরে ভারতে ফিরে কানপুরে Store office-এর ভার গ্রহণ করতে হয় এবং এই সঙ্গে স্থানীয় ভদ্রলোকদের ইচ্ছা ও অনুরোধে সেখানকার 'বঙ্গসাহিত্য সমাজ' লাইব্রেরীর সম্পাদকত্বও স্বীকার করতে হয়। স্থানীয় সর্বপ্রিয় যশস্বী ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট। প্রবাসে উৎসাহী, উদ্যমী, কর্মপ্রাণ, উদার মুক্তহস্ত মনীষীদের মধ্যে তাঁকে অন্যতম বললেও যেন সবটা বলা হয় না।

'আমাদের উভয়ের প্রীতির বন্ধন ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল, বাঙালিদের জন্য তিনি একটা কাজের মত কাজ খুঁজছিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ থেকে চিন্তা-চর্চা চলছিল, পরে ১৯০৯ খৃঃ প্রস্তাব করি এ-প্রদেশে বাঙালি যুবকদের মধ্যে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ উদ্দীপনের চেষ্টার আবশ্যক হয়েছে। কিন্তু অগ্রণী হয়ে নিজেরা কিছু করতে গেলে সহানুভূতি পাওয়া সহজ হবে না।

সব সহরগুলির চিত্তাকর্ষণ করতে হলে তাঁদের সামনে একটি সমষ্টিগত শক্তিমান প্রতিষ্ঠানের বলিষ্ঠ আদর্শ একবার ধরে দিতে হবে। এই বৎসর এলাহাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন। আমার প্রস্তাব ছিল এই মণ্ডপের সুযোগ নিয়ে প্রথমে কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে এ-প্রদেশে আহ্বান করে বাঙালিদের মধ্যে বাংলার ভাবধারা ও বঙ্গভাষার শক্তিসামর্থ্য ও মাধুর্য সংক্রামিত করা এবং তাঁদের চিত্তে বঙ্গভাষার প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা। প্রস্তাবটি ডা' সেন সোৎসাহে সমর্থন করেন।

'পরে উদ্দেশ্যটি বিশদ ও বিস্তারিতভাবে ও উদ্দেশ্যের কারণগুলি বিশেষ সতর্কতার সহিত সুগঠিত করে প্রধান প্রধান সহরগুলির লাইব্রেরি ও ক্লাবের সম্পাদকদের নিকট পাঠাই ও তাঁদের অভিমত আহ্বান করি। বিশেষ শ্রমসাধ্য হলেও সে সুযোগ না নষ্ট হয় সেই চেষ্টাই করি। সকলের অভিমত সংগ্রহের পর পরম শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য ত্রিবেদী মহাশয়ের নিকট আবেদন উপস্থিত করি। তাঁর আন্তরিক সমর্থনও পাই। কিন্তু তৎপূর্বে ময়মনসিংকে কথা দেওয়া হয়েছিল, তাঁর চেষ্টা সত্ত্বেও ময়মনসিং অধিবেশন স্থগিত রাখতে রাজি হতে পারলেন না যেহেতু তাঁরা বহুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন।

'এই আশাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আমি কলিকাতায় বদলী হওয়ায় সকলেই, প্রধানত ডা' সেন, নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন। আমি কথা দিই কলকাতা অবস্থানকালে পরিষদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ পাব। আমার তিন মাস ছুটি পাওনা আছে, সেই সাহায্যে এ-কাজটি করে যাব।

"তা আর করতে হয়নি। আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা উদ্দেশ্যের দিকে ধীর গতিতে আপনি রূপায়িত হতে থাকে। পূর্ব চেষ্টার ফলে ও প্রভাবে প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যেও একটা নীরব জাগরণ সঙ্ঘবদ্ধ হবার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।'

কানপুরে অতুলপ্রসাদ এই প্রথম বৃহত্তর পটভূমিকায় প্রবাসী বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রদীপটি হাতে তুলে নিলেন।

অবশ্য নিজ কর্মভূমি লখনৌ এ বাঙালি-অবাঙালি, হিন্দুমুসলমান প্রতি মহলের সর্ববিধ সৎ ও প্রগতিমূলক কর্মকাণ্ডের তিনি অগ্রদূত। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত গোঁড়ামিবর্জিত অতুলপ্রসাদ ধর্মমতনির্বিশেষে সকলের আনন্দ-উৎসবের শরিক। মুসলমানদের মুশায়েরা জমায়েতে যেমন তাঁকে দেখা গেছে, হিন্দুর রামলীলায়ও তাঁর সাহচর্য। বিজয়ার সাদর আলিঙ্গন ও নমস্কার বিনিময়ে স্থানীয়

বঙ্গভাষীর যেমন আনাগোনা, বাসিন্দা মুসলমানরাও ইদ্ মোবারকে তাঁকে ইয়াদ করে তস্‌লিম জানাতে ভুলতেন না।

একমাত্র লখনৌকে কেন্দ্র করেই অতুলপ্রসাদের জীবনচক্র আবর্তিত হয়নি। ব্যবহারজীবীরূপে তাঁর প্রতিষ্ঠা, সুযশ, স্থির ব্যক্তিত্ব, চরিত্র-মাধুর্য, মননশীলতা, দেশপ্রেম—একাধারে বহু সদ্‌গুণের নিরিখে তিনি অনন্য হয়ে ওঠেন যুক্তপ্রদেশে। একালে অর্থাৎ ১৩২০-২১-এ মধ্যপন্থী জননায়কদের প্রাধান্য সর্বজনবিদিত। মধ্যপন্থীদের মধ্যমণি গোপালকৃষ্ণ গোখেল—তাঁরই অনুগামী ড' সুন্দরলাল, সার তেজবাহাদুর সাপ্রু, বিখ্যাত ইংরাজি দৈনিক 'লীডার'-এর সম্পাদক সি. ওয়াই চিন্তামণি প্রমুখের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের আসন একসারে। এঁদের উক্তিতে—'His genius for friendship, the strength of his attachments, his deep-seated love of country and his anxiety to serve were accompanied by a keen intelligence, versatile talents and many-sided interests.' সার্থকনামা অতুলপ্রসাদ একদা তাঁদের নেতৃত্বের সিংহাসনখানিও অলংকৃত করেন।

লখনৌর অতুলপ্রসাদ সেন, কানপুরের ডা' সুরেন্দ্রনাথ সেন, আর কাশীর রায় বাহাদুর ললিতবিহারী সেন—এই সেন উপাধিকারীদের ছত্রচ্ছায়ায় উত্তর ভারতের প্রবাসী বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা নির্ভরশীল। শুধু এ তিন সহর নয় দিল্লী ও রাজপুতানায়ও এই সেনবংশীয়দের রাজত্ব। একমাত্র ব্যতিক্রম এলাহাবাদ। বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়রাই ব্রাহ্মণ্য কুলীনত্বে এখানকার সমাজ-জীবনের ধারক ও বাহক।

ললিতবিহারী সেন-রায় ছিলেন কাশীর বাঙালি-সমাজের অবিসংবাদী নেতা। বাঙালির সমস্ত কর্মপ্রেরণার উৎস এই ললিতবিহারী। এঁরই অধিনায়কত্বে উত্তর ভারতীয় বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন কাশীতে নির্বাহিত হয়।

১৩২৯, ১৯ ফাল্গুন।

বহির্বঙ্গের বাঙালিদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপদান করে উদ্দীপ্ত উৎসাহে এই সদ্যোজাত সাহিত্য সম্মেলনের জাতকৃত্য দোলপূর্ণিমার দিন কাশী সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ, কাশী-নরেশ নামাঙ্কিত প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। নানাজাতীয় পত্রপুষ্প, সুগন্ধি ধূপ-ধূম সুরভিত বিরাট অঙ্গনটি অলংকরণের পারিপাট্যে একটি সারস্বত কুঞ্জে পরিণত।

সভাপতি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, দূর দূরান্ত সহর থেকে প্রায় দু'শত প্রতিনিধির সমাগম হয় এই সম্মেলনে। লখনৌ থেকে যে বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অতুলপ্রসাদ ত ছিলেনই, আর ছিলেন মুখোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয়। ড' রাধাকুমুদ ও ড' রাধাকমল। পণ্ডিত-সমাজের পুরোবর্তী এই দুই মনীষীকে প্রথম দেখলাম। দু' ভ্রাতাই আলাপচারি। সামান্ত আলাপের সূত্রপাতেই সান্নিধ্যের উত্তাপ অনুভব করলাম। নিকট ভবিষ্যতে এঁরা দুজনে যে আমাকে নিবিড় স্নেহবন্ধনে জড়িয়ে ফেলবেন—এই মুহূর্তে এ-সম্ভাবনা আমার কাছে ছিল অচিন্তনীয়।

ড' রাধাকমল লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও সমাজ-বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক। অন্য পরিচয়ও আছে। মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রবর্তিত 'উপাসনা' মাসিকপত্রের সম্পাদক এককালে। বাংলা সাহিত্যে প্রবেশের ছাড়পত্র 'শাশ্বতী'-র গ্রন্থকার 'সবুজপত্রে' প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে কূটতর্কে অবতীর্ণ 'সাধু বনাম কথ্য ভাষা'-র দ্বন্দ্বে। বাগ্‌বৈদগ্ধেও ধার ও ভার দুই-ই উপস্থিত। সভা-সমিতিতে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে দীপ্তিমান। লেখ-শৈলীতেও সাহিত্য-বৈভবের দ্যুতি। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সে-ত পরের অধ্যায়। অগ্রজ ড' রাধাকুমুদ ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-বিভাগের প্রধান। যেন দু'রাজ্যের দু'জন অধীশ্বর। তাঁর গবেষণা-সমৃদ্ধ গ্রন্থাদি সমস্তই ইংরেজি-আশ্রিত। স্বদেশেব-বিদেশের বিদগ্ধ মহলে তাঁর প্রশস্তি। আচার-ব্যবহারে খুব সামাজিক। লক্ষ করলাম—নিজের প্রতিষ্ঠা-সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল।

প্রকাশ্য অধিবেশন শুরু হওয়ার পূর্বে সম্মেলন মণ্ডপের অদূরে 'তেলাঙ্গ হলে' বিষয়-নির্বাচন সমিতির বৈঠক বসে। 'বিষয় নির্বাচন সমিতি'র অর্থে তর্কাতর্কির আসর। ড' রাধাকমলের সুচিন্তিত অথচ তেজোদ্দীপ্ত বক্তৃতায় আসর বেশ জমে উঠেছিল। অন্য বক্তারাও তাঁদের বক্তব্য রাখলেন বটে তবে যেন কিছুটা ম্লান।

এরকম একটি মহতী সমাবেশে আমার প্রথম যোগদান অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যরূপে। বক্তৃতা যত না শুনছি তার চেয়ে হলটিতে উপস্থিত জনতার দিকে মুগ্ধচক্ষে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। প্রবাস-ভূমির অনেক রত্নের সন্নিবেশ এখানে।

একধারে অতুলপ্রসাদ। নীরব দর্শক মাত্র।

বেলা দুটোর সময় প্রকাশ্য অধিবেশন। এই ঐতিহাসিক অধিবেশনের

প্রথম আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথ। অন্তরা যথানিয়মে যবনিকার আশ্রয়ে। জ্যোতির্ময় পুরুষের জ্যোতিচ্ছটায় সমস্ত সভা বিচ্ছুরিত। তাঁর অনবদ্য অননুকরণীয় বাচনিক কথনে শ্রোতৃমণ্ডলী ভাবাবিষ্ট।

দ্বিতীয় যেজন পার্শ্বনায়ক, তিনি দিলীপকুমার রায়। রবীন্দ্রনাথের বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠধ্বনির রেশ মেলাতে না মেলাতে তাঁর সুধা-ঝরা গানে সভা চমকিত ও উদ্বেল।

দেখলাম সভামঞ্চেব অদূরে ঢালাও আস্তরণে উপবিষ্ট অতুলপ্রসাদকে। সভার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ প্রিয়জন অতুলপ্রসাদ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বসে আছেন পদ্মাসনে। আগুয়ান হয়ে নিজেকে জাহির করবার মানসতা তাঁর স্বভাবে বিরল বলেই বারাণসীর এই সম্মেলনে তিনি অন্তরালবর্তী। কিন্তু 'অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না।' রবীন্দ্রনাথের আহ্বান। দশাসই মানুষটি দ্বিধাগ্রস্ত। এ ত আহ্বান নয়—আদর, সমাদর।

অতুলপ্রসাদ বাউল সুরে গাইলেন—

মোদেব গবব মোদেব আশা আ মবি বা লা ভাষা।

সাধা কণ্ঠের উদ্বেল চমকিত আসরে এ-গান যেন তুলসীতলে নিবেদিত প্রদীপটি, শান্ত স্নিগ্ধ জ্যোতি বিকিরণ যাব স্বভাবধর্ম।

উত্তর ভাবত বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনেব দ্বিতীয় অধিবেশন এলাহাবাদে। ১০ পৌষ ১৩৩০ সাল। এবার সভাপতি বিশ্রুত সাংবাদিক 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। কিন্তু সভায় উপস্থিত হতে পারলেন না অসুস্থতা-নিবন্ধন। সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে কাশী থেকে এলেন বারাণসীর প্রথম অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি পণ্ডিতাগ্রণ্য প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

এবারকার সম্মেলনে পূর্বপরিচিত নামটি পরিবর্তন করে এর নূতন নামকরণ করা হল—প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন।

প্রস্তাবক : মাননীয় লালগোপাল মুখোপাধ্যায়। প্রতিনিধি সংখ্যাও এবার পরিমিত। লখনৌ থেকে অতুলপ্রসাদ এলেন না। পরিচিত মুখখানির অদর্শনে সভাস্থ প্রতিনিধিরা অনেকে খুব হতাশ হলেন। জানা গেল, তিনি অসুস্থ। ডাক্তারের নির্দেশে তিনি তখন উটক্বামণ্ডের না অন্য কোনো স্বাস্থ্যকর

স্থানের স্বাস্থ্যনিবাসে। সম্মেলন-তরণীটির কাণ্ডারী এখনকার মত মাননীয় বিচারপতি লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়। লালগোপালবাবু তাঁর অসাধারণ সৌজন্য ভদ্র-মধুর ব্যবহার ও নিরহংকরতার গুণে প্রবাসী বাঙালিমাত্রেরই হৃদয় জয় করেছিলেন। অতুলপ্রসাদ ও লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়কে অধিনায়করূপে পেয়েছিল বলেই আগামীকালে এই সম্মেলন একটি দৃঢ়মূল বনস্পতির মতই সতেজ ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠেছিল।

দু'খানি সাহিত্যপত্র ও দু'টি সাহিত্য-সম্মেলন পরিক্রমা, 'প্রবাসী বাঙালী' সাময়িকীর সম্পাদনা এবং আমারই উদ্যোগে স্থাপিত 'বিশ্বনাথ লাইব্রেরিতে উপলক্ষ সৃষ্টি করে, সাহিত্যরথীদের আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ করে এনে মনের অরাজকতা দুব করবার ব্যর্থ প্রয়াসে যখন আমি দিগভ্রান্ত—অপ্রত্যাশিত এক পত্রের আবির্ভাব।

লেখক অতুলপ্রসাদ সেন। স্বহস্তে লেখা। চিঠিখানি ছোট'ও নয়। যদি এ চিঠিখানি এখানে তুলে ধবতে পারতাম, তাহলে আমার বক্তব্যে কোনো দায়িত্ব থাকত না।

চিঠির মর্মকথাটুকু যা আজও স্মরণে: আগামী ২৮-২৯ চৈত্র, শনিবার ও রবিবার লখনৌতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনেব তৃতীয় অধিবেশন। প্রস্তুতি চলছে। আমার উপস্থিতি একান্ত কাম্য। এলে খুশি হবেন এবং আশা করবেন আমার আসার।

আনুসঙ্গিক আরও কিছু ভাল ভাল কথা থাকলেও থাকতে পারে। অতুলপ্রসাদের পরবর্তীকালে লেখা পত্রগুচ্ছ আমার ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকলেও তাঁর এই প্রথম লিপিখানির অন্তর্ধান আজও আমার মনকে পীড়িত করে।

আমার মত একজন অপরিণত যুবককে এ প্রদেশের শীর্ষস্থানীয় একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির এ-ধরনের পত্র স্বতঃই মনকে চঞ্চল ও বিস্মিত করবার পক্ষে যথেষ্ট। বিস্ময়ের আরও একটু কারণ—সম্মেলনের মুদ্রিত আমন্ত্রণলিপি না পাঠিয়ে স্বয়ং অতুলপ্রসাদ নিজের হাতে চিঠি লিখে আমাকে আহ্বান, এ মর্যাদাদানের পশ্চাতে কোন রহস্য বিদ্যমান—ঔৎসুক্যের নিরসন তখন হল না বটে তবে আত্মপ্রসাদের অভাব হয়নি।

৩

১৩৩১ সাল, চৈত্র মাস।

'গুড ফ্রাইডে' ও 'ইস্টার মনডে'র ছুটির আবহাওয়া। তখন ত' ইংরাজ-আমল। কয়েকটি দিন স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত সব বন্ধ।

২৮-২৯ এ-দুটি দিনে যুক্তপ্রদেশের সুরম্য নগরী লখনৌতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় সমারোহ।

কাশী থেকে আমরা কয়েকজন সম্মেলনে যোগদানের সদুদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম নির্ধারিত সময়ের একদিন পূর্বেই। 'আমরা কয়েকজনে'র মধ্যে যাঁরা বিশেষরূপে অভিজ্ঞাত তাঁরা হলেন: (১) ফণিভূষণ অধিকারী—কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক। পরিচয়ের পরেও পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের নিকট পার্ষদদের একজন যাঁর রাণু নামধেয় সুরূপা নাবালিকা কন্যাটিকে একসময় কবি 'ভানুদাদা' ছদ্মনামের অবকাশে অজস্র পত্রমাল্যে ভূষিত করে তাকে সাহিত্যে অমর করে রেখেছেন। (২) সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—শুষ্ক ইতিহাসের অধ্যাপক হলেও বাংলা সাহিত্য-রসে মনটি নিমজ্জিত। সুপুরুষ, সুবক্তা। সভা বা মজলিসকে প্রাণময় করে রাখবার আর্ট তাঁর করায়ত্ত। ভূতপূর্ব 'অলকা' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক। (৩) রায় বাহাদুর ললিতবিহারী সেন-রায়—বারাণসীর প্রথম অধিবেশনের যজ্ঞেশ্বর। (৪) মহেন্দ্রচন্দ্র রায়—'প্রবাসী'তে ধারাবাহিক রচনা 'মেটারলিঙ্কের নাট্য-ভাবনা' সম্বন্ধে সুচিন্তিত আলোচনা সাহিত্য-রসিকদের ঔৎসুক্য সৃষ্টি করে তুলেছিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে লখনৌ স্টেশনে ট্রেন থামামাত্র বুকে সম্মেলনের 'অভিজ্ঞান ব্যাজ' আঁটা কয়েকটি তরুণ স্বেচ্ছাসেবকের আমাদের কামরায় উঁকি-ঝুঁকি—ভাবখানা, শিকার না ফসকায়।

'আপনারা'—

তাদের অর্ধসমাপ্ত কথার মধ্য পথেই আমাদের আত্মসমর্পণ। 'হ্যাঁ, আমরা...' মুহূর্তে সে কি প্রলয়কাণ্ড! কেউ সুটকেস, কেউ-বা 'হোল্ড-অলে' বাঁধা বিছানা-পত্র কাঁধে তুলে ছুট্।

'আসুন, আসুন'—

আমাদেরও শেষটায় কাঁধে না তোলে, কতকটা যেন সেই লজ্জায় আমরা তাদের পশ্চাদ্ধাবনে দেরী করিনি।

'কোথায় আমাদের প্রতিনিধি শিবির?' জিজ্ঞাসার উত্তরে জানলাম— 'চার্চমিশন হাইস্কুল' ভবনে আমাদের সাময়িক গৃহস্থালী।

'স্টেশন থেকে কতদূর?' 'সোজা একটিই রাস্তা, কৈসরবাগ পর্যন্ত। কৈসরবাগের মোড়ে ব্যাংকস রোডের উপরেই।'

নাম ও স্থান দুই-ই আমার স্মরণে ও সংস্কারে। মোটে ত' চার বছর। পূর্বস্মৃচনা মনে পড়ল।

'এ. পি সেনের বাংলো ও ঐ রাস্তায় না?' 'হ্যাঁ, চার্চমিশন স্কুলবাড়ির অপর পারে তাঁর বাংলো। তিনিই ত' এ সম্মেলন ডেকেছেন।'

টাঙাওয়ালা ততক্ষণে আমাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিয়েছে।

ক্যাম্পে উপস্থিত হতেই সাদরে অভ্যর্থিত হলাম। আমাদের বসবাসের জন্য যে-কক্ষটি নির্ধারিত সেখানে প্রথম কাজ নিজের ঘরকন্না গুছিয়ে আশ্বস্ত হওয়া।

'আপনি কোথা থেকে আসছেন দাদা?' 'আজমগড়।' 'জায়গাটা ত কাশীর লাগোয়া শহরতলি। সেখানে বাঙালি! জানতাম না ত'।' 'আপনি কোথা থেকে?' 'ইন্দোর? সে ত' দূর-দুরান্তে। সেখান থেকে এসেছেন? খবর রাখেন ত' খুব।'

ভদ্রলোকটি হেসে উঠলেন। বাইরের অলিন্দে জমায়েত থেকে টুকরো টুকরো কথা ও হাসির শব্দ কানে ভেসে এল। চা ও জলযোগের ঢালাও আয়োজন। স্বেচ্ছাসেবকরা সততই তটস্থ। কর্মকর্তাদের কাউকে কৈ দেখছি না!

ঐ যে ড রাধাকমলবাবু আসছেন। হাতে একটা ফাইলে কিছু নথিপত্র। তিনি শশব্যস্ত হয়ে সকলকে আপ্যায়িত করে খবরাখবর নিচ্ছেন।

তিনিই ত' এ যজ্ঞের যাজ্ঞিক।

রাধাকমলবাবু ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন: 'অনেক স্থানেই নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে প্রতিনিধি পাঠাবার অনুরোধ জানানো হয়েছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় বেশির ভাগ পত্রের কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। প্রতিনিধি সংখ্যা তো দেখছেনই।' সত্যই প্রতিনিধি সংখ্যা এবার খুব কম। পঞ্চাশ, ষাট জন হবেন হয়ত।

বারাণসীর প্রথম অধিবেশনে উত্তর ভারত পাঞ্জাব মধ্যভারত বিহার —বিভিন্ন স্থান থেকে যে-সংখ্যায় প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন তাতে এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রতি আস্থা ও প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব

যেভাবে উপলব্ধ হয়েছিল, এলাহাবাদ ও লখনৌতে এর সংখ্যাল্পতা সম্মেলনের স্থায়িত্ব ও গতিবেগের পক্ষে কিছুটা উদ্বেগজনক বৈকি! অবশ্য বর্তমান যুগের মত প্রচার-মাধ্যম সংবাদপত্রের সাহায্য সে-যুগে সুলভ ছিল না, বিশেষ করে বাংলা সংবাদপত্র তো তখন উদয়ের পথে। ভরসা, ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা। তাঁরা ক্ষুদ্রাক্ষরে তাঁদের মর্জিমত স্থানে সংবাদটি সুপারিশ-সাপেক্ষে কখনো প্রকাশ করতেন, কখনো না। সম্মেলনের ব্যবস্থাপকরা মুদ্রিত লিপির সাহায্যে যতটা সম্ভব প্রচার কাজ চালাতেন।

তখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সাহিত্যিকগোষ্ঠী বা বাংলা মাসিক সাহিত্য পত্র-পত্রিকাগুলি বাংলার বাইরের এই সাহিত্য সম্মেলনের প্রকৃতি-সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন। নাম শুনে তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন—'এ বুঝি বৎসরান্তে কতগুলি প্রবন্ধ পাঠের রঙ্গমঞ্চ।' এ সবের মূলে ঐ এক শব্দ—প্রচারণ।

প্রতিনিধি সংখ্যার বাড়াবাড়ি না থাকায় অল্পক্ষণের ব্যবধানে একটা মধুর ও হার্দ্দিক ঘরোয়া পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল আমাদের মধ্যে। চায়ের টেবিলের ওধারে যে নব্য গৌরবর্ণ যুবকটি দিব্যি আসর জমিয়ে গল্প করছেন—কে উনি?

'ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।'

নাম আগেই শোনা। 'সবুজপত্রে'র প্রমথ চৌধুরীর হাতে-গড়া শাকরেদ। এই প্রথম দর্শন। ভদ্রলোকের চেহারাটি বেশ। সাজতেও জানেন। কোমল দেহটি ঘিরে কাল সরুপেড়ে শুভ্র কোঁচানো ধুতি, গিলে-করা ঢিলে-হাতা পাঞ্জাবিতে অল্প-অল্প বাবু বাবু ভাব। একটু যা মাথায় কেশাভাব। কেশী না হলেও প্রশস্ত ললাটের সঙ্গে মানিয়েছে ভাল। কথা বলছেন ত' বলছেনই আর সে বলার কী ধ্রুপদী ভঙ্গি। অঙ্গুলীধৃত জলন্ত সিগারেট মুহুর্মুহু ওষ্ঠসংলগ্ন অবস্থার ধূম্রোদ্গারণের মুহূর্তটি যা একটু অবসর। একক বক্তা। সবাই নিরপেক্ষ শ্রোতা। এই পরিবেশে দেখলে মনে হয় না ইনি লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও সমাজ-বিজ্ঞানের একজন প্রখ্যাত অধ্যাপক। একটু মৃদুগুঞ্জনে সামনে তাকালাম। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি অতুলপ্রসাদ সেন ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছেন আমাদের দিকে। প্যাণ্ট-কোট টাইপরা সেন সাহেব নন। ধুতি জামা-চাদর গায়ে সেন মহাশয়। এ সময় তাঁকে আমাদের মধ্যে পাব এটা ধারণা করতে পারিনি। একেবারে মূল অধিবেশন-মঞ্চে সম্মানার্হ আসনে তাঁকে দেখব —এই ছিল প্রত্যাশিত আশা।

স্বেচ্ছাসেবকটির সেই উক্তিটি মনে পড়ে গেল—'তিনিই ত' সম্মেলন

ডে:কছেন। তাই বুঝি আমন্ত্রণকর্তা অন্যদের আমমোক্তারনামা দিয়ে নিশ্চিন্তে স্থির থাকতে পারেননি।

'পথে কোন কষ্ট হয়নি ত?' 'কোনো অসুবিধা হচ্ছে না ত'? হলে বলা চাই।'

প্রতি কক্ষে-কক্ষে পবিভ্রমণ করে সকলের সঙ্গে প্রীতির বিনিময়, পরিচিতদের সঙ্গে আরও একটু অন্তরঙ্গ। কানপুরের ডা' সুরেন্দ্র সেনকে কটাক্ষে হেসে—'আপনার রেজিমেন্টই দেখছি দলে ভারী।' আমাকে দেখে কাছে এসে ডান হাতখানি আমার স্কন্ধে স্থাপন করে হাসি-খুশি মুখে—'এই যে আপনি এসে গেছেন। বেশ! বেশ! আমার চিঠি পেয়েছেন তাহলে।'

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লাম। বললাম—'চিঠি না পেলেও সম্মেলনে আসতাম।'

'বাঃ! বেশ, বেশ; এই ত' চাই।' অতুলপ্রসাদের এই 'বেশ' 'বেশ' কথা কয়টির মাধুর্য আমার বড় ভাল লাগল।

পরেও লক্ষ করেছি একটু উচ্ছ্বসিত হলে বেশি কথার মধ্যে না গিয়ে 'বেশ' 'বেশ' বর্ণমালার এই অক্ষর দু'টিব মাধ্যমে তিনি আনন্দ প্রকাশ করতেন।

মিষ্ট হাসি, মিষ্ট কথা বিতরণ করে সকলকে যুক্ত করে 'আচ্ছা আবার দেখা হবে' জানিয়ে তিনি চ'লে গে:লন। তাঁর আন্তরিকতার স্পর্শে প্রতিনিধিরা অভিভূত। 'সবারে বাসরে ভাল' তাঁর গানের কলিটির যেন মূর্ত প্রতীক এই অতুলপ্রসাদ সেন। এ-প্রদেশের বিখ্যাত রাজনীতিক প্রধানদের সঙ্গে যাঁর ওঠা-বসা, নামী ব্যারিস্টার মক্কেল আর ব্রিফ যাঁর সময়কে পথরোধ করে রাখে, তাছাড়া আছেন অর্থী-প্রার্থী, সাক্ষাৎকামী—ঘেরাও ত' তিনি সর্বক্ষণই।

মুক্তি কোথায়? তাঁব সাহিত্যাশ্রিত কবি-মানস কি স্বধর্মকে আঁকড়ে স্বস্তি পেতে উৎসুক? এই সাহিত্য-সম্মেলন কি তারই পূর্বাভাস!

প্রতিনিধি-আবাসে ভোর থেকেই কর্মচাঞ্চল্য। চা-জলযোগ শেষ করে কয়েকজন ভ্রমণ-বিলাসী নাগরী লখনৌর সঙ্গে পরিচয় করতে বেরিয়ে গেলেন। এ নগরীর পূর্ব-প্রণয়ীরা আয়েসী মেজাজে খবরের কাগজ ও চায়ের পেয়ালা নিয়ে দেয়ালা করছেন। বুদ্ধিমান বয়স্করা স্নানপর্ব শেষ করতে তৎপর।

চার্চমিশন হাইস্কুল ভবনটির সামনে কিছুটা খোলা জায়গা। সেখানে দাঁড়ালেই দেখা যায়, অপর পারে অতুলপ্রসাদের বাংলো। এপার-ওপারের

তুচ্ছ ব্যবধান অতিক্রম করে যখন-তখন অতিথিশালার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের সাধু অভিপ্রায় যে তাঁর মনে ছিল—স্থান-নির্বাচনের ঘটাতেই যেন এটি পরিস্ফুট।

চার বছর পূর্বে দেখা লখনৌর বহু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন। লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়—যুক্ত প্রদেশের ধনী মুসলমান তালুকদার যার প্রধান অংশীদার, এখন আরও উন্নত। এক নজরেই যে-বস্তুটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি হল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য থেকে অধ্যাপক প্রায় সমস্ত বিভাগেই বাঙালির কর্তৃত্ব। এঁদের সম্মান-দক্ষিণা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় আকাশস্পর্শী। নব প্রতিষ্ঠিত মহাবিদ্যালয়ের এই প্ররোচনাই হয়ত বাংলাদেশের বহু বিদগ্ধ শিক্ষাবিদকে এখানে আসতে প্রোৎসাহিত করে থাকবে। রাস্তা-ঘাট, বাড়ি-ঘর, বাগ-বাগিচায়ও নূতনের ছোঁয়া। অনেক পরিষ্কার, অনেক উজ্জ্বল।

ভ্রমণে বেরোলাম। সময়টা বড় সুখপ্রদ। চৈত্রে বসন্তের শেষ বিদায়ের ক্ষণের প্রভাতটি নাতিশীতোষ্ণ। গুলমোর ও কিংশুকে রঙের মাতামাতি।

সবে বেলা নটা। সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন সেই দুপুর বারোটায়। ডেরায় ফেরবার মুখে মনে হল—দেখা করে আসি অতুলপ্রসাদের সঙ্গে। আর ঐ ত' তাঁর বাংলো। এবারের অধিবেশনের সভানেত্রী স্বনামধন্যা সরলা দেবী চৌধুরানী তাঁরই অতিথি। দেখে আসি তাকেও, পেয়ে আসি তাঁর সান্নিধ্য। সভায় দূর থেকে দেখা আর একেবারে সামনে মুখোমুখি—এ ত' রোমাঞ্চ!

একটু ইতঃস্তত করে বাংলোর হাতায় ঢুকে গাড়ি-বারান্দায় সিঁড়ি ডিঙিয়ে ড্রয়িংরুমের সামনে এসে দাঁড়াতেই অতুলপ্রসাদের চক্ষুতে ধরা পড়ে গেলাম।

'এসো, এসো, ভেতরে এস।'

একটা ব্যাপারে মনের সংগোপনে যে-সংকোচ আমার পূর্বাপর ছিল তা দূর হল এবং আমি যে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহসূচক 'তুমি' সম্বোধনে ঘনিষ্ঠ হলাম—এ আমার অসীম শুভাদৃষ্ট। সৌজন্যদ্যোতক 'আপনি' খোলসটা উন্মুক্ত হওয়ায় ভারমুক্ত চিত্তপ্রসাদে কক্ষে প্রবেশ করলাম।

উপবেশন কক্ষের একধারে ড' রাধাকুমুদ ও আমার অপরিচিত দু'-একজন। অন্যপাশে একখানি মহার্ঘ কৌচে রাজেন্দ্রাণীর মত যে-মহিলাটি উপবিষ্টা তিনিই যে সরলা দেবী, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। শুভ্র বেশ-বাস। কেশে পাক ধরলেও, দেহে বার্ধক্যের ছায়া পড়লেও মুখখানি কী সুন্দর ও তেজোদৃপ্ত!

'সুরেশ, সুরেশ চক্রবর্তী। কাশীতে থাকেন। সাহিত্যে খুব উৎসাহ। বয়সে নবীন হলেও এরই মধ্যে কাগজের সম্পাদক।' সরলা দেবীর সঙ্গে পরিচয়ক্রমায়

অতুলপ্রসাদের এই শিষ্টাচার আমায় কিছুটা অপ্রতিভ করে তুলল। স্বভাবতই 'সম্পাদক' সংজ্ঞাটিতে আমার আপত্তি। এ যেন আমার অনধিকারচর্চা!

লজ্জিত হাস্যে অপরাধ শিরোধার্য করে দু'হাত তুলে সরলা দেবীকে নমস্কার করে একখানি চেয়ারে বসে পড়লাম। সরলা দেবীর এত কাছাকাছি, মন কিন্তু আমার 'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ'। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারীর কন্যা সরলা দেবীর নানা রূপের কত কথা। মাতা ও মাতুল সম্পাদিত ঐতিহ্যবাহী 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনভার নিয়ে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা। জাতীয় কংগ্রেসে 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র সংগীত উদ্বোধিত সভার সুর-সাধিকা। সমাজ-সংক্রিয়ার ভূমিকায় অগ্রবর্তিনী। 'বীরাষ্টমী' উৎসবের প্রবর্তিকা। বাঙালির মনীষা ও পাঞ্জাবের বীর্যবত্তায় বিশ্বাসী এই অসমসাহসিকা বঙ্গললনা সিন্ধুনদ প্রবাহিত প্রদেশের এক দেশপ্রেমী. সংস্কৃতিমান যুবক রামভুজ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে আবদ্ধ হলেন পরিণয়সূত্রে।

সংবিদ ফিরে পেলাম সরলা দেবীর কণ্ঠস্বরে। কথা বলছেন স্মৃতিচারণ ভঙ্গিতে। সকলের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করে বললেন: 'প্রবাসে নীড় বাঁধার মুখে এই অতুল সেনরাই আমায় প্রথম সংবর্ধনা করেন, আজ নীড় ভাঙার দিনে এঁরাই আবার স্নেহ দিয়ে ঘিরলেন। প্রবাস আমাকে ব্যথাই দেয়নি—আনন্দও দিয়েছে।'

রামভুজ দত্ত চৌধুরীর অকাল প্রয়াণ কিছুদিন পূর্বের কাগজে প্রকাশিত সংবাদ। নীরব সকলেই।

ড' রাধাকুমুদ মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলেন: 'এখন কি কলকাতায়ই থাকবেন?'

'হ্যাঁ। 'ভারতী' কাগজখানা আবার নিজের হাতে নেব। 'ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের' কাজও আছে।' আমার দিকে চোখ তুলে—'তুমি কাশীতে কোথায় থাক? এখান থেকে আমি কাশী যাব ঐ মহামণ্ডলের কাজে। দু' একদিন থাকব। তোমার ঠিকানা আমায় দিও ত?'

এবার সকলেরই গাত্রোত্থানের পালা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দ্রুত পা চালালাম। দশটা বেজে গেছে।

গঙ্গাপ্রসাদ মেমোরিয়াল হল।

গঙ্গাপ্রসাদ ভার্মা লখনৌর একজন নামজাদা নাগরিক। এ সহরের উন্নতিতে তাঁর অনেক অবদান। তাঁরই অনুপ্রেরণায় নগর পরিকল্পনায় তৈরী হয়েছে সহরের বড় বড় রাস্তা, পার্ক, ধর্মশালা ও পত্রপুষ্পশোভিত উদ্যান। তাঁরই

স্মৃতিবিজড়িত নবনির্মিত বিরাট হলে বেলা বারোটায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় সভাধিবেশন।

একে একে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত প্রতিনিধি ও স্থানিক দর্শকে হলটি পূর্ণ। একটা অস্পষ্ট ধ্বনি হলটিকে ঘিরে গমগম করছে। মহিলাদের উপস্থিতি সামান্য। তিরিশ দশকেও সভা বা যে-কোনো প্রকাশ্য আসরে মেয়েরা যোগ দিতেন কম।

মঞ্চের উপর অতুলপ্রসাদ, ড' রাধাকুমুদ, ডা' রাধাকমল, লখনৌ আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ বহুখ্যাত অসিতকুমার হালদার, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক ও বিগত এলাহাবাদ সম্মেলনের কর্মাধ্যক্ষ ড' প্রসন্নকুমার আচার্য, ফণিভূষণ অধিকারী, ডা' সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়রা। মধ্যস্থলে একটি গদিমোড়া কেদারায় সভানেত্রী সরলা দেবী। সম্মুখে রক্ষিত একটি সুদৃশ্য টেবিল। তার দু'পাশে দু'টি ফুলদানে দু'টি পুষ্পস্তবক। চিরাচরিত উদ্বোধন সংগীত।

স্বাগত ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন অতুলপ্রসাদ।

'প্রবাসী বন্ধুগণ, আপনাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া আজ আমি কৃতার্থবোধ করিতেছি।'

এলোমেলো চাদরখানি যথাযথ সুবিন্যস্ত করে তিনি উদাত্তকণ্ঠে, স্পষ্ট উচ্চারণে লিখিত ভাষণ পাঠ করতে লাগলেন উপবিষ্ট জনসঙ্ঘের সামনে। প্রবাসী বন্ধুদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার আনন্দজ্যোতি তাঁর চোখে-মুখে। কণ্ঠস্বর আবেগ ও উৎসাহে ভরপুর।

অবিচলিত শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁর বক্তব্যে একনিষ্ঠ। আমি অন্যান্যদের মত অনন্যচিত্তে অতুলপ্রসাদের বক্তৃতা শুনছি—মধ্যপথে কর্ণ যেন আরও সজাগ।

'প্রবাসী বাঙ্গালিদের মধ্যে সাহিত্য-সাধনার একটা প্রবল ইচ্ছা দেখা দিয়াছে; তাহার ফলে বাঙালিবহুল কাশীনগরী হইতে কয়েকখানি মাসিক-পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে 'অলকা' অলখিত, 'প্রবাসজ্যোতিঃ' নির্বাপিতপ্রায়। সম্প্রতি সাহিত্যপ্রেমী শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী কাশীধাম হইতে 'প্রবাসী বাঙ্গালী' নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা বাহির করিতেছেন। আমি তাঁহার সাহিত্যোৎসাহের প্রশংসা করি এবং তাঁহার সুলিখিত পত্রিকার স্থায়িত্ব কামনা করি। আমি কিন্তু তাঁহাকে একটি মনোরম ও সারগর্ভ মাসিকপত্রিকা সম্পাদন বিষয়ে সহায়তা করিতে অনুরোধ করিতেছি। পত্রিকাখানি সচিত্র

হইবে। উত্তর ভারতে আজকাল একাধিক খ্যাতনামা বাঙ্গালি চিত্রশিল্পী বাস করেন। আমার বিশ্বাস, এ-বিষয়ে শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার, শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকিল প্রমুখ চিত্রবিদ্যাবিশারদ বাঙ্গালিদের সহায়তা অনায়াসে পাইতে পারি। সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক বন্ধুবর ডাক্তার রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ-কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন এরূপ আশা করি। পাটনা কাশী এলাহাবাদ লখনৌ এবং লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অনেক সুযোগ্য বিদ্বান বাঙ্গালি অধ্যাপনার কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা অনেকে সাহিত্যিক ও সুলেখক। তাঁহারা কষ্ট স্বীকার করিলে অনেক সারগর্ভ প্রবন্ধাদি এ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে পারে। ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার প্রমুখ প্রবাসী ঐতিহাসিকেরা এদেশের প্রাচীন ইতিহাস-সম্বন্ধীয় অনেক অনাবিষ্কৃত তথ্য প্রকাশিত করিতে পারেন। যাঁহারা উর্দু ভাষায় পারদর্শী তাঁহারা বাগ, গালিব, জোখ, আমির, আতস, রতননাথ, আকবর, হালি প্রভৃতি সুকবিগণের কাব্যভাণ্ডার হইতে রত্নসঞ্চয় করিয়া আমাদের বাঙ্গলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন। যাঁহারা হিন্দিভাষায় সুশিক্ষিত তাঁহারা তুলসীদাস, সুরদাস, কবীর, বিহারীদাস, কেশবদাস, ভূষণ, মীরাবাঈ, রসখান, পদ্মাকর, রহিম, হরিশ্চন্দ্র, প্রতাপ, শ্রীধর পাঠক প্রমুখ প্রসিদ্ধ হিন্দিকবিগণের কাব্যকুসুম হইতে মধু আহরণ করিয়া আমাদের মধুচক্রটিকে আরও মধুময় করিতে পারেন। এদেশের তীর্থাদি, এদেশের জনপ্রবাদ, এদেশের লোকাচার ইত্যাদি সাহিত্যের প্রকৃষ্ট উপকরণ যথেষ্ট বিদ্যমান। আমার ধারণা এসব উৎকৃষ্ট উপাদান অবলম্বন করিয়া যদি একটি সচিত্র মাসিকপত্রিকা প্রবাসে নিয়মিতরূপে সম্পাদন করা যায় তাহা হইলে বহির্বঙ্গীয় বাঙ্গালিগণের মাতৃসাহিত্যসেবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করা হইবে, সাহিত্যপ্রেমীদিগকে মাতৃভাষায় প্রবন্ধ ও কবিতাদি রচনা করিতে উদ্বুদ্ধ করা হইবে। প্রবাসী বাঙ্গালিদিগের জাতীয়তা রক্ষা ও উন্নতি-সাধন বিষয়ে চিন্তাশীলেরা এ-পত্রিকায় আলোচনা করিবেন। বাঙ্গলা সাহিত্য আমাদের অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া আরও সমৃদ্ধ হইবে। আমি এ-বিষয়ে সাহিত্য-সম্মেলনের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি।'

লেখনীতে ফুটে উঠেছে অনাগত পত্রিকাখানির ভাব-রূপ শুধু নয়, অতুলপ্রসাদের সাহিত্যাদর্শের সুচিন্তিত ভাবনা। প্রকাশ্য এই মহতী সভায় বিদ্বজ্জন সমক্ষে আমার তুচ্ছ সাহিত্যকর্মের অকুণ্ঠ স্বীকৃতিদান—অতুলপ্রসাদের এরূপ মহানুভবতা ও গুণগ্রাহিতায় আমি বিহ্বল হয়ে পড়লাম।

ফিরে গেলাম অতীত কৈশোরে। অতুলপ্রসাদের মানস-মুকুরে 'প্রতিফলিত' আমারই প্রতিবিম্ব। না, এ আমার অপরিপুষ্ট মনের অহমিকা। অতুলপ্রসাদের পটভূমি কত সুদূরপ্রসারী। প্রবীণ চিন্তানায়কের মননে প্রবাসী বাঙালি ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-সমস্যা, প্রতিবেশী সাহিত্যের সহিত ভাবের আদান-প্রদান, বাংলাভাষা প্রসারের নানা পথনির্দেশ থাকে থাকে সাজানো।

কল্পারম্ভের ঘটস্থাপনা করে তিনি যেন সহজ হলেন।

বিষয়-নির্বাচন সভার আলোচ্য বহুর মধ্যে মুখ্য হয়ে দাঁড়াল সম্মেলনের মুখপত্রস্বরূপ একখানি মাসিক পত্রিকার প্রবর্তন। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে গঠিত হল পৃথক একটি 'পত্রিকা সমিতি'। সরলাদেবীকে মুখপাত্র করে এর দরবার বসে 'চার্চমিশন হাইস্কুল' প্রাঙ্গণে রাত দশটায়।

রাত্রি শান্ত কিন্তু আমাদের বাক্-বিতর্কে রাত্রির শান্তি বিঘ্নিত ও বিড়ম্বিত। এই প্রদেশ থেকে একখানা পত্রিকা বের করতে হবে—এই ছিল মুখবন্ধ। অতুলপ্রসাদ প্রস্তাবটি কিভাবে রূপায়িত করা যায় সভ্যগণের অভিমত-পরিপ্রেক্ষিতে সেটি উত্থাপন করে, শর সন্ধান করে প্রথমে লক্ষ্যবিদ্ধ করলেন আমাকে: 'সুরেশ, তুমি আগে কিছু বল। কয়েকখানি কাগজ চালিয়েছ, তোমার অভিজ্ঞতা হাতে-কলমে।'

অতুলদার অন্তরের কথা আমার জানা হয়ে গিয়েছিল, তবু বাস্তব দিকটার কথা উপেক্ষণীয় নয়।

'আপনার অভিভাষণে কাগজখানিতে যা বর্ণবিন্যাস করেছেন—এ রাজসূয় যজ্ঞের রাজস্ব যোগাবে কে?'

'বেশ ত'। আমরা এর অর্থনৈতিক দিকটাই নাহয় প্রথম আলোচনা করি।' অতুলদার উক্তি।

কাগজের একটা আনুমানিক হিসাবের খসড়া আমিই পেশ করলাম। কাগজ-পরিচালনার পূর্ব অভিজ্ঞতা এখানে আমার সহায়। দেখা গেল, পত্রিকা-প্রকাশের ব্যয় বাৎসরিক ন্যূনপক্ষে ৩,৬০০ শত টাকা।

'প্রবাসে এত বাঙালি! চেষ্টা করলে গ্রাহকের অভাব হবে না। আর এখানে আমরা যাঁরা উপস্থিত তাঁরা নিজের নিজের সহর থেকে এককালীন দান হিসেবে এ টাকাটা সংগ্রহ করে নিতে পারব। আপনি কি বলেন ডা' সেন?' অতুলদা কানপুরের ডাক্তার এই সম্মেলনের অন্যতম শরিক সুরেন্দ্রনাথ সেনের প্রতি সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত করলেন। 'নানা মুনির নানা মত।' উপমাটির

ছোঁয়াচ আমরাও এড়াতে পারিনি। যত মত তত পথ খোঁজার ধৈর্য-ই বা ক'জনের? রাত বারোটা ত' বাজে!

যবনিকা টানা হল নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে: ক। এককালীন দান খ। মাসিক চাঁদা গ। গ্রাহক সংগ্রহ।

সভা ভঙ্গ করে 'শুভরাত্রি' জানিয়ে সুধীরা যার যার পথে। অতুলদা অগ্রসর হলেন মাননীয়া অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে যেখানে 'দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি রাত্রি দ্বিপ্রহর।' তাঁদের পাশাপাশি পদযাত্রায় আমি কিছুক্ষণের সঙ্গী।

অতুলপ্রসাদের আসল রূপ—স্নেহের রূপ, ভালবাসার রূপ। গাম্ভীর্য সে ত' বহিরাবরণ। সবে তো দু'টি দিন। টুকিটাকির মধ্যেও তাঁর এই অনুভাব উপলব্ধি করেছিলাম বলেই আমি কিছুটা প্রগলভ। 'অতুলদা, টাকা যোগাড় শেষ কথা নয় বা পত্রিকা-সম্পাদনাই সব নয়! কত ঝঞ্ঝাট—গোটা একটা সংসারের মত।' সরলা দেবী সঙ্গে সঙ্গেই আমার উক্তির সমর্থনে বললেন, 'কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ—আমরাও ভুক্তভোগী।'

সরলা দেবীকে অতুলদা: 'সুরেশই ত' রয়েছে। সাহিত্যপ্রেমী তো বটেই—করিতকর্মা। ও আমাদের পাশে থাকবে, আমরা ওর পাশে।' সস্নেহে আমার পিঠ চাপড়ে—'কি, পারবে না?'

'আপনার পরিকল্পিত পত্রিকার স্বপ্ন তো আমার কিশোর বয়স থেকেই। কাগজ গড়তে চেয়েছি বার বার—গড়াগড়ি খেয়েছি কিন্তু প্রাণান্ত পরিচ্ছেদে তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল কৈ! যদি পত্রিকা হয়ই আমার আনুগত্যের অভাব হবে না।'

'বেশ! বেশ! তোমার কথা মনে ছিল। লখনৌতে সম্মেলন ডাকার পর মাথায় এল একখানা কাগজের সংকল্প। সঙ্গে সঙ্গে তোমার কথা। আচ্ছা, কাল আবার কথা হবে।'

'এত রাত পর্যন্ত তর্কযুদ্ধ, যুক্তির নানা বাণ বর্ষণ করে আপনি ক্লান্ত। সমস্ত দিনটাই ত' সম্মেলন নিয়ে কাটালেন।'

'ছুটি ছিল হে, ছুটি! যীশুখৃষ্টের দয়ায় এখন তো রুজি-রোজগার সব বন্ধ।' কৌতুক রহস্যের ঝিলিক ফুটে উঠল তাঁর চোখে-মুখে।

শয্যায় ফিরে আসতে আসতে ঘুরে-ফিরে যে-কথাটা মনে উদয় হচ্ছিল, শুধু কোর্ট-কাছারি বন্ধ বলেই কি ক্ষণিক সাহিত্য-বিলাসে মেতে উঠেছেন কবি অতুলপ্রসাদ।

যশোলিপ্সা !

'ভবের সভায় যশের মুকুট দেয় যদি তারা শিরে
পারি যেন দিতে সরল বিনয়ে তাদের চরণে ফিরে।'

এ ত তাঁরই লেখনী-নিঃসৃত আত্মনিবেদন।

বহির্বঙ্গে বাঙালি জাতির কল্যাণ ও উন্নতি সাধনের বাহনরূপে যে-পত্রিকার সম্ভাবনা আসন্ন তার উপকথা কৌতূহলোদ্দীপক ও বৈচিত্র্যময়। এ-পত্রিকা ধনী সাহিত্যপ্রেমীর অর্থকৌলিন্যের আস্ফালন, সাহিত্য-ব্যবসায়ীর উচ্চাকাঙ্ক্ষার হাতছানি বা নিজ নিজ গোষ্ঠীর মঙ্গলসাধনে উৎসর্গীকৃত মুখপত্র নয়। সমষ্টিগত একটা সম্প্রদায়ের শুভাশুভের ভাবমূর্তি, তাই এর উপক্রমণিকায় এত আতিশয্য, এত কলকণ্ঠ।

পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন বেলা তিনটায়। সভানায়িকা দেবী চৌধুরাণী স্বমহিমায় আসনে উপবিষ্টা। উপস্থাপিত বিষয় নিয়ে কত কচালে, কত ভোটরঙ্গ। আশ্চর্য হতে হয় সভা-পরিচালনায় সরলা দেবীর কুশাগ্র বুদ্ধি ও দক্ষতায়। স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে তিনি আসর নিয়ন্ত্রণ করছেন সহজাত আভিজাত্যে।

প্রবাসী বাঙালির স্বার্থে প্রণীত কতকগুলি প্রগতিমূলক ব্যবস্থা স্বীকারের পরবর্তী বিতর্কিত অধ্যায়—পত্রিকা-সমিতির প্রস্তাব বিভাবন। অগ্রণী ড' রাধাকমল। সালংকারে ও সবিস্তারে সমিতির অভিমত প্রসারিত করলেন জনাকীর্ণ সভায়। পক্ষ-বিপক্ষের মতাদর্শের নিরিখে এলাহাবাদের বিশেষ শিক্ষাব্রতী এবং সম্মেলনের একজন অক্লান্তকর্মা ও অনুরাগী দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব রাখেন : 'প্রথমে এক হাজার টাকা ও পাঁচ শত গ্রাহক সংগ্রহ করে সম্মেলন পত্রিকা-প্রকাশে অগ্রসর হতে পারে।' কুজ্ঝটিকা অপসারণে এ আলোকচিত্র সকলের সম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হল।

তখনই সভামণ্ডপ প্রতিশ্রুতিতে টলমল।

'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি কাড়াকাড়ি' আর কি !

'আমি লখনৌ থেকে তিনশো টাকা সংগ্রহ করে দেব'—অতুলপ্রসাদের প্রথম ঘোষণা। 'আমি দুশো টাকার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি কানপুর সহরের পক্ষ থেকে।' ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেনের সোৎসাহ উচ্চারণ। এলাহাবাদের প্রতিনিধি নলিনবিহারী মিত্র মহাশয়ের সুস্পষ্ট কণ্ঠনিনাদ—'এলাহাবাদও দুশো দেবে।'

কাশী, আজমগড়, আগ্রা, ফয়জাবাদ, লাহোর, ইন্দোর এবং সভাসীন

অন্যান্যরাও পিছিয়ে রইলেন না। রইলেন না স্বল্পাগতা মহিলারাও। প্রতিশ্রুতিময়ী আজ তাঁরাও।

লখনৌকে কেন্দ্র করে পরিচালন-সমিতি গঠিত হল। সভ্য সংখ্যা একাদশ। সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, সহ-সম্পাদকদ্বয় যথাযথ মনোনীত হলেন —অতুলপ্রসাদ সেন, ড' রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, ড' রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রলাল দে ও সুরেশ চক্রবর্তী। অন্য সহরের প্রতিভূ ছয়জন খ্যাতি ও প্রভাবে অনন্য। সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন উদ্‌যাপিত হল মধুর স্মৃতিকে বহন করে।

'আমার হল সারা, তোমার হল শুরু'।

সম্মেলন তো ফতোয়া দিয়েই দায়মুক্ত—'কর তোমরা পত্রিকা প্রকাশ।' গা ঢাকা দিতে তার কতক্ষণ!

অক্লান্তকর্মী অতুলপ্রসাদ! তাঁকে অনুসরণ করে আমাদের কজনের এক ঘরোয়া বৈঠক বসে প্রতিনিধি-আবাসের একটি প্রকোষ্ঠে। উপস্থিতিদের মধ্যে সরলা দেবীও একতম। অবসর-বিনোদনের জন্য বাহির প্রাঙ্গণে তখন উৎসব মুখরিত জলসা।

সান্ধ্য চা পানের শৌখিনতা ও পরামর্শ সভা দু'টি একীভূত। বুঝলাম, পত্রিকার আবির্ভাব অনিবার্য।

দৃঢ়মনা অতুলদা। কিন্তু গণতন্ত্রীয় পথই যে তাঁর আদর্শ, প্রতি পদক্ষেপে তার পরিচয়। অপরের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল অতুলপ্রসাদ তাই এত জনপ্রিয়। এখন জন্মের পূর্বেই জাতকের জন্মপত্রিকা!

'পত্রিকার নামকরণ?' অতুলদার ঝটিতি উত্তর—'উত্তরা'।

'বাঃ, বেশ সুন্দর নাম।' শুধু সুন্দর নয়, অর্থ গৌরবেও মহীয়ান! বিরাট রাজকন্যা উত্তরা নয়, নগাধিরাজের মানস-কন্যা উত্তরা যার বিস্তৃত অঞ্চলের আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে অসংখ্য প্রদেশ, দেশ, জনপদ। উত্তরাখণ্ড, উত্তরাপথ। আর্যসভ্যতার পীঠস্থান এই আর্যাবর্তে প্রবাসী বাঙালির সুদীর্ঘকালের সুখ-দুঃখের লীলা-নিকেতন।

প্রত্যেকেই নামটিকে অভিনন্দিত করলেন। সম্পাদক মনোনয়ন-পত্র এক-বাক্যে স্বীকৃত। একজোড়া সম্পাদক—অতুলপ্রসাদ সেন, ড' রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। একক সহ-সম্পাদক—সুরেশ চক্রবর্তী।

'এ প্রদেশের নামী সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদদের নিয়ে পত্রিকার একটি মন্ত্রণা পরিষদ থাকা ভাল।' বক্তব্য রাখলেন অতুলপ্রসাদ। 'মন্ত্রণা-পরিষদ! সে ত' পত্রিকার শিরোভূষণ মাত্র!' উত্তরে অতুলদা: 'শুধু তাই কি! তাঁদের নাম ও যশের কিছুটা সুফল আমরা পাব আর তাঁদের উপদেশ বা সহযোগিতা পাব না, এটাই বা আমরা ধরে নিচ্ছি কেন? অবশ্য আগ্রহটা আমাদের তরফের!'

আপাতত ছয়জনকে নিয়ে একটি 'মন্ত্রণা-পরিষদ' গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কিন্তু এই ছয়জন কে কে হবেন—এখানেও প্রশ্ন। 'কারে ফেলে কারে থুই, কে বেশি সুন্দর!' সরলা দেবী, ড' রাধাকুমুদ ও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার—এই তিনটি নাম উত্থাপন করে অতুলপ্রসাদ ছোটখাট একটি বক্তৃতাই দিয়ে ফেললেন।

'মাননীয়া সরলা দেবী এ সম্মেলনের সাফল্যে আমাদের অনেক সহায়। আমাদের পরিকল্পিত পত্রিকাটির জন্য ভবিষ্যতে অনুরূপ সহায়তা আমরা আশা করব। প্রবাসিনী তিনি বহুদিনের। কাগজ পরিচালনায়ও তিনি প্রবীণা!' একটু থেমে পার্শ্বে উপবিষ্ট ড' রাধাকুমুদের দিকে ব্যারিস্টারি ভঙ্গিতে গ্রীবা সঞ্চালন করে—'শ্রদ্ধেয় বন্ধু ড' রাধাকুমুদবাবু এই পরিষদে যোগ দিলে 'উত্তরা'র মর্যাদা তো বাড়বেই, অধিকন্তু সব সময় সব বিষয় আলোচনা বা পরামর্শ দরকার হলে তাঁকে হাত বাড়ালেই পাব। এছাড়া আমাদের পরিষদে একজন ঐতিহাসিকের আসন শূন্য থাকতে পারে না।' সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রসঙ্গে বললেন—'বিহার প্রদেশে 'উত্তরা'র প্রতিনিধিত্ব করবেন তো বটেই, বড় কথা তিনি একজন গুণী সাংগীতিক, সংগীতশাস্ত্রী। প্রবীণ সাহিত্যসেবী। সরস ছোট গল্প লিখে তিনি খ্যাতিমান।'

সরলা দেবী অতুলদার প্রতি সহাস্যে: 'অতুল সেন দেখছি এসব কোষ্ঠী আগেই তৈরী করে রেখেছিলেন।'

'এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক ড' মেঘনাদ সাহা রয়েছেন। তাঁকে মন্ত্রণা-পরিষদে আমন্ত্রণ দিতেই হবে। বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় রচনাদি বিচার তাঁকে পেলে সহজ হবে। ড' সাহাকে উৎসাহিত করে বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখতে উদ্বুদ্ধ করাও এ সম্মেলনের একটা সর্ত হওয়া উচিত।' ড' রাধাকমলের সতেজ কণ্ঠের স্পর্শে সকলে নড়েচড়ে বসলেন।

'আমাদের 'মন্ত্রণা-পরিষদে' সংগীত, বিজ্ঞান, ইতিহাসের আসন কখানি বণ্টন তো হয়েই গেল। দর্শন ও সাহিত্য এ দুটি শূন্য আসনের জন্য আমি নাম রাখছি কাশীর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ ও কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের।'

দাঁড়িয়ে উঠে আমার কথা পেশ করলাম সবিনয়ে, বললাম: 'কবিরাজ মহাশয় কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। সংস্কৃত ভাষার পুঁথিপত্রের মধ্যে তাঁর অবাধ বিচরণ। সংস্কৃত সাহিত্যে মহামহোপাধ্যায় হলেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ ও অগ্রাধিকার। নিভৃত নির্জনে নিজের সাধনায় মগ্ন। তাঁকে আমাদের মধ্যে আনতে হবে। বাংলা সাহিত্যে দেবার মূলধন তাঁর অনেক। দ্বিতীয় যে-নামটি, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি অবশ্য অতিতর পরিচিত নন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাঁর গোপন অভিসার বহুকালের। প্রবাসী বাঙালির এই যে সম্মেলন, এর আদি কারণ খুঁজতে গেলে তাঁর নামটি মনে আনতেই হবে। কাশী থেকে প্রথম বাংলা পত্রিকা 'প্রবাসজ্যোতি' ও 'অলকা' এসব সাহিত্যে-কর্মের পথ-প্রদর্শক তিনি। প্রৌঢ় বয়সেও সাহিত্যই তাঁর ধ্যান জ্ঞান ধারণা। আমার মতে, আমাদের 'মন্ত্রণা-পরিষদে'র পূর্ণচ্ছেদ তাঁকে দিয়েই করা শ্রেয়।' ততক্ষণ আমার অন্তস্তলে যে-কথাগুলি গজগজ করছিল তা প্রকাশ করে যেন স্বস্তি পেলাম।

সভাজনরা আমায় সমর্থন করলেন। নামকরণ, মনোমত সম্পাদক, মন্ত্রণা-পরিষদ এসব তো হল, এখন উত্তরার উদয় সময়টার জন্য পঞ্জিকাও যে দেখতে হয়।

'১লা আষাঢ়। আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে—কি বলেন কমলবাবু?' সত্যই অতুলদার সব যেন ছকে-আঁকা একখানা সতরঞ্চ।

'প্রেস! কোথা থেকে পত্রিকা মুদ্রাঙ্কিত হবে?'

এবার অতুলদার দ্বিধা। লখনৌতে বাংলা ছাপাখানা কোথায়? এ-যাত্রায় ত্রাণকর্তার ভূমিকায় কাশীর রায়বাহাদুর ললিতবিহারী: 'কেন, এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস। কাশীতে ওরা একটা ব্রাঞ্চ খুলেছেন, বাংলা বইপত্র ছাপাবেন বলে।' আমাব প্রতি: 'সুরেশ, তুমি সময়মত আমার বাড়িতে দেখা কর। তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেব। আমিও এর মধ্যে এলাহাবাদ যাব, তখন কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে আসব।'

পত্রিকা-রূপায়ণের আদি পর্বের কয়েকখানি পৃষ্ঠা।

সকলের উঠি উঠি ভাব। রাত মন্দ হয়নি।—'কত গান ত' হল গাওয়া।' বাহির প্রাঙ্গণে জলসার ভরা মরসুম। অতুলদা, কমল ও কুমুদ বাবু আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। 'তোমাকে এ কাজের উদ্যোক্তা হতে হবে। আমরা একান্ত করে পেতে চাই তোমাকে।' ড' রাধাকমলের কণ্ঠে আগ্রহের আধিক্য।

সরস-হাস্যে অতুলদা: 'আমার কোর্ট-কাচারি, আপনাদের কলেজ-য়ুনিভারসিটি, ওর কথাটাও আমাদের ভাবতে হয়।' কুমুদবাবু: 'ভাববে বৈ কি! সম্মেলন নিশ্চয় ভাববে।'

আশ্বাসে, অনুপ্রেরণায় অভিষিক্ত হয়ে কাশী রওনা হলাম পরদিন যথাসময়ে। শূন্য প্রতিনিধি-আবাস ধূলিধূসরিত হতে লাগল চৈত্রের উত্তাল বাতাসে।

এই চার্চমিশন স্কুলটির অবস্থান আজ কোথায়! একটি সংঘটন কিন্তু কাকতালীয় সদৃশ। একদিন যে ভবন-অঙ্গন প্রবাসী বাঙালির ভাবী পত্রিকার রচনায় আলোচনা-মুখর—স্বাধীনোত্তর ভারতে লখনৌ সহরের এই গৃহেই কংগ্রেসের নিজস্ব পত্রিকা 'ন্যাশনাল হেরাল্ডে'র কার্যালয়। যার শীর্ষদেশে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা,—ললাটের তিলক, পত্রিকার বিজ্ঞাপনপট্ট। ভিতর মহলে কর্মব্যস্ত সাংবাদিকদের জটলা।

অত্যন্ত আকস্মিক ঘটনা! ঘটনা নয়—ঘটনা-প্রবাহ।

লখনৌ আসার মুহূর্তেও ভাবতে পারিনি, আমার জন্য অপেক্ষা করছে সেই ইশারা যা আমার ভবিষ্যৎ ভাগ্যনিয়ন্তা। জাতকের জন্মলগ্নে বিধাতার অদৃশ্য হস্তের অপরিস্ফুট লেখন যেন ক্রমশ প্রকাশমান।

উপস্থিত স্পষ্টানুভূতি এটাই—যে-কর্মযজ্ঞে আহ্বান পেয়েছি তার পূর্ণাহুতির জন্য আমায় প্রস্তুত হতেই হবে।

কাশী পৌঁছেই প্রথম কাজ দুটি পত্রের মুদ্রণ। (১) পত্রিকার জন্য অঙ্গীকৃত অর্থ-সংগ্রহের জন্য ঘোষকদের নিকট সবিনয় নিবেদন। অতুলপ্রসাদের বকলমে রচিত ও মুদ্রিত।

লক্ষ্ণৌ

সবিনয় নিবেদন

সম্মেলনের মুখপত্রস্বরূপ মাসিক পত্রিকার প্রচারকল্পে সাহিত্য সম্মিলনের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে আপনি সহরের পক্ষ হইতে যে দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহার জন্য পরিচালন সমিতির পক্ষ হইতে আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

পত্রিকা প্রচার ও তাহার সম্যক ব্যবস্থার ভার পরিচালন-সমিতি গ্রহণ করিয়াছেন। পত্রিকার প্রথম সংখ্যা ১লা আষাঢ় ১৩৩২ সালে প্রকাশিত করিবার জন্য উদ্যোগ চলিতেছে। ছাপাখানার ব্যয়, বিজ্ঞাপন-প্রচার, কাগজ ক্রয় প্রভৃতির জন্য অগ্রিম টাকার প্রয়োজন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া একমাসের মধ্যে প্রতিশ্রুত অর্থ কোষাধ্যক্ষ ডাঃ শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি, লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়, লক্ষ্মৌ, এই ঠিকানায় পাঠাইয়া সত্বর পত্রিকা প্রকাশে সহায়তা করিবেন। ৩রা বৈশাখ, ১৩৩২ সাল।

বিনীত
শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি

নির্দিষ্ট সহর ও নিরূপিত টাকার অঙ্ক বিন্যাসের জন্য লিপিখানিতে দু'টি শূন্যস্থান।

(২) পরিচালন-সমিতির সভ্যগণ সমীপে। উত্তরা সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য জানিয়ে তাঁদের অনুকূল স্বীকৃতির আবেদন।

আবেদন-নিবেদন দুটি পত্রদূত পাঠানো হল দেশে-দেশান্তরে।

ধ্রুবতারা অতুলপ্রসাদ। পত্র লিখে আপাত সম্পাদিত সংবাদ জানলাম। দিগ্‌দর্শনের উপদেষ্টা তো তিনিই।

উত্তরে অতুলপ্রসাদ :

18 Outram Road
Lucknow
21. 4. 25

স্নেহাস্পদেষু

আমার শরীর এখনও অসুস্থ; আজ জ্বরটা একটু কম আছে কাশীটা আছে; বাড়ীতে মার পীড়া বাড়িয়াছে, ডাক্তাররা নিতান্ত সঙ্কটাপন্ন মনে করেন; সুতরাং আমার শারিরীক ও মানসিক অবস্থা বুঝিতেই পার। তোমায় আপাততঃ খরচের জন্য ৫০ টাকার cheque পাঠাইতেছি। আমার বোধ হয় কলেজ বন্ধ হইবার পূর্ব্বে তোমার একবার লক্ষ্মৌ আসা দরকার; রাধাকমলবাবু

এবং রাধাকুমুদবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া এবং পরামর্শ করিয়া কাজে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। আমার কয়েকটি কথা যাহা মনে হয় তাহা এই :—

১. সম্মিলনী ঠিক করিয়াছে যে ১০০০ টাকা এবং ৫০০ গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া তবে কাজ আরম্ভ করা ; তন্মধ্যে ১০০০ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে কিন্তু গ্রাহক সংখ্যা কিছুই স্থির হয় নাই। তাহাদের নামও লিখা হয় নাই। সে কাজটি সকলের আগে।

২. তার পর পরিচালন সমিতির মত না পাওয়া পর্য্যন্ত আমাদের কয়েক জনের দায়ীত্বে কাগজটা বাহির করা সঙ্গত হইবে না। সুতরাং গ্রাহক সংখ্যা (৫০০) সংগ্রহ এবং পরিচালন সমিতির অনুমতি দুইই আবশ্যক।

৩. কাগজটি কোথায়, কোন প্রেসে ছাপান হইবে তাহাও কয়েকটি প্রেসের terms পাইয়া তবে ঠিক কবা বোধ হয় যুক্তিসম্মত হইবে।

৪. কেহ কেহ বলিতেছেন যে শীঘ্রই কলেজ ও স্কুল ছুটি হুইবে ; এ সময় পত্রিকার প্রকাশকার্য্য আরম্ভ করা সমীচিন হইবে না।

যাহা হউক এসব বিষয় আলোচনা আবশ্যক ; তাই আমার মনে হয় তোমার একবার আসা দরকার। বাড়ীতে মা মবণাপন্ন পীড়িত না হইলে আমার বাসায়ই তোমাকে থাকিতে বলিতাম। তুমি বোধ হয় পত্র পাইয়া যত শীঘ্র পার আসিলেই ভাল হয় নতুবা প্রফেসররা চলিয়া যাইবেন।

শুভাকাঙ্খী

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

পুঃ কাগজটা যদি আমার নিজের হইত—সম্মিলনীর মুখপত্র না হইত তবে নিজের দায়ীত্বেই সব কাজ কবিতাম।

মাতৃদেবীর সঙ্কটাপন্ন পীড়া, নিজের শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্যের অভাব তবু কর্তব্যনিষ্ঠ অতুলপ্রসাদ পত্র লিখেছেন নানা দিক বিশ্লেষণ করে। শুধু পত্র নয় একখানি চেকও পত্রে সংলগ্ন। সবদিকেই তাঁর সজাগ দৃষ্টি।

এখনই পত্রিকা-প্রকাশে কিন্তু অভিশঙ্কা। সম্মেলনের ধার্য প্রস্তাবের পরিপন্থী হতে পারেন না অতুলপ্রসাদ। পত্রে কাটাকুটি ও বানানের অসতর্কতা দোলায়মান চিত্তের অভিব্যক্তি।

লখনৌ যেতেই হবে।

৫

টানা-পড়েন সবে আরম্ভ। চক্রাবর্তের দিনগুলির শুনানি পরে পরে। ওয়ে রোড লখনৌ স্টেশন থেকে বেশ দূর। ড' রাধাকমলের সে-সময়ের বাসস্থান। নিরালা পরিবেশে সুন্দর দ্বিতল অট্টালিকা। সম্মুখে তৃণাচ্ছাদিত কতকটা খোলা জায়গা। সোজা হাজির হলাম তাঁর আবাসে। প্রাতঃকাল। পাঠকক্ষে ড' রাধাকমল। 'এই যে সুরেশ, এস, এস। কালই তোমার কথা বলাবলি করছিলাম। খুব ভাল হল তুমি এসে পড়লে।' তড়িঘড়ি আমায় নিয়ে দ্বিতলে এসে সহধর্মিণী শ্রীময়ী নলিনী দেবীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। ড' রাধাকমল কমলদা হলেন, তাঁর স্ত্রী স্নেহময়ী বৌদি। স্বামী-স্ত্রীর সংসার। তখন শিশু কাকলিতে গৃহপ্রাঙ্গণ কল্লোলিত হয়নি। 'জানো, সেন মশায় মানুষটি বড় মাতৃভক্ত। মার খুব অসুখ, সর্বদা তাঁর দেখাশোনা, পরিচর্যা। নিজেও তো অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।' চা পান করতে করতে আমাদের কথা হচ্ছিল। 'হ্যাঁ, অতুলদা চিঠিতে আমায় সব লিখেছেন। কেমন আছেন ওঁরা ?' 'সেন মশায় অনেকটা সুস্থ, তবে চেম্বারে যাতায়াত বন্ধ। আমরা তাঁর সঙ্গে বাড়িতেই দেখা করব।'

মানে ব্যাংকস্ রোডে নয়, আউটরাম রোডের বাড়িতে। কমলদা বললেন ; 'মা ও বোনেরা, তাঁদের ছেলে-মেয়েরা সেন মশায়ের কাছে রয়েছেন। ব্যাংকস্ রোডে এখন তাঁর অফিস, থাকেন আউটরাম রোডে।'

বেলা এগারোটা। স্নান সেরে একত্রে খেতে বসলাম। টেবিল-চেয়ারে নয়, নক্‌শা-আঁকা কার্পেটের আসনে। সম্মুখে ব্যজনী হস্তে নলিনী বৌদি। 'আমাকে য়ুনিভারসিটিতে বেরোতে হচ্ছে, ফিরব বেলা তিনটেয়। ওখানে দাদাকে (ড' রাধাকুমুদ) তোমার কথা জানাব। সেন মশায়কেও ফোনে খবরটা দিয়ে রাখব।' খেতে খেতে কমলদা বললেন।

দুপুরে কমলদার একতলার পড়বার ঘরে একখানা কৌচে শুয়ে-বসে, বই পড়ে সময়টা কাটালাম। চারদিকে ছড়ানো-ছেটানো অর্থনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান কত মোটা মোটা ইংরিজি বই। আমার নাগালের মধ্যেও কিছু বই-পত্তর ছিল। কমলদা শিল্পানুরাগী। সুদক্ষ শিল্পীর কয়েকখানি 'ওরিজিন্যাল' ছবিও দেওয়ালে দোলানো।

কমলদা এলেন। বৈকালিক চা-পর্ব সমাধা করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। মোটর তো দূরকে নিকট বন্ধুই করে তোলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছলাম সেন সাহেবের কোঠিতে।

লাইব্রেরি ও ড্রয়িংরুম একসঙ্গে। প্রতীক্ষমান অতুলপ্রসাদ!

'আসুন কমলবাবু, বাঃ সুরেশও এসে গেছ।'

নত হয়ে অতুলদার পদধূলি নিতে অগ্রসর হয়েছি, বাধা দিয়ে, তিনি দু' হাতে আমায় জড়িয়ে স্নেহসূচক কণ্ঠে 'কি যে কর। বস, বস।'

অল্প দিন পূর্বে দেখা কান্তিমান অতুলপ্রসাদ নন। কিছু শীর্ণ, মুখে একটা বিষণ্ণতার প্রলেপ।

'আপনি কেমন আছেন বলুন? মার কথাও শোনান।' 'আমি তো ভাল হয়ে উঠেছি। মাকে নিয়েই ভাবনা।' ক্লান্ত স্বরে কথা কয়টি উদ্‌গত হল।

গাড়ি-বারান্দায় মোটর থামার ঘসটানো শব্দ। শব্দের রেশ মেলাতে না মেলাতে রাধাকুমুদবাবুর প্রবেশ। 'বেয়ারা, চা লাও'। একটু জোরে আদেশ দিতে উঠে দাঁড়াতেই কাশির দমকটা যেন সামলে নিলেন।

এই পরিস্থিতি। অন্দরে মৃত্যুপথযাত্রী স্নেহময়ী জননী, বাহিরে সদ্য রোগমুক্ত অবসন্ন পুত্র।

অসোয়াস্তি ও সংকোচে আমি জড়সড়। কিন্তু আরব্ধ কার্য থেকে পশ্চাদপসরণ করতে পারেন না অতুলপ্রসাদ। চা ও আনুষঙ্গিক উপচার বেয়ারা পরিবেশন করে গেল। খাবারের প্লেটটা আমার হাতে তুলে দিতে দিতে অতুলদা—'সুরেশের আসাটা খুবই দরকার ছিল, কি বলেন কুমুদবাবু?' 'নিশ্চয়। সুরেশকে ধন্যবাদ, কাশী পৌঁছেই দুটো দরকারী কাজ সেরে ফেলেছে।' আমাকে বাহবা দিয়ে উৎসাহী করবার জন্যই সম্ভবত কথা কয়টির উৎপত্তি।

'হ্যাঁ। চিঠি দুখানি ছাপিয়ে পাঠানো সময়োচিত কাজ হয়েছে।' আমার প্রতি চোখ ফিরিয়ে অতুলদা বললেন: 'তোমাকে চিঠিতে আমার মতামত জানিয়েছি। এখন এস, আমরা সঠিক কার্যপন্থা অনুসরণের চেষ্টা করি।' কমল ও কুমুদ বাবুর দিকে চেয়ে: 'এঁরাও রয়েছেন।'

'আপনি যখন পরিচালন-সমিতির মত না পাওয়া পর্যন্ত পত্রিকা-প্রকাশের কাজে অগ্রসর হতে অনিচ্ছুক, তখন অপেক্ষা করাই যাক। চিঠি তো তাঁদের নামে পাঠানো হয়েই গেছে।' ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললাম।

অতুলদা আমার মনোহত ভাব দেখে হেসে: 'আমি অনিচ্ছুক, এটাই-বা ভেবে নিচ্ছ কেন। তবে পরিচালন-সমিতির অধিকার অস্বীকার করা যায় না। তারপর এক হাজার টাকা ও পাঁচশো গ্রাহক সংগ্রহ করে এ-কাজে হস্তক্ষেপ করতে বলা হয়েছে, তারই বা কি ?'

অন্তরায় অনেক কিছুর। পরিচালন-সমিতির প্রতিপোষণ বা অঙ্গীকৃত অর্থের কোষই কেবল নয়, আলোচনার ধাপে-ধাপে বহু পাখসাট, বহু শীলমোহর।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বন্ধ হতে চলেছে। উত্তর ভারতের দাবদগ্ধ এই ঋতুতে বাংলাদেশের সজল ঘন স্নিগ্ধতার মোহ অনেকেরই। 'প্রবাসী চলরে দেশে চল'—এ ডাক তাদের উন্মনা করে তোলে। না, এ অনুকূল সময় নয় কাগজ প্রকাশের।

অত:পর। উদ্দেশ্য যেখানে একই লক্ষ্যাভিসারী, সেখানে একটা আপস রফায় উপনীত হওয়া ছাড়া নান্য পন্থা!

এ-পর্যায়ে লখনৌতে থাকার পরমায়ু কয়েকটি দিন। দীক্ষাগুরু অবনীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য অসিতকুমার হালদারকে দিয়ে উত্তরকালের 'উত্তরা'র প্রচ্ছদপটখানি আঁকাবার ঝোঁক আমার প্রথম থেকে। কথায় কথায় অতুলদাকে বললাম, 'অসিতবাবুকে 'উত্তরা'র কভার এঁকে দেবার প্রস্তাবটা একটু আগেভাগে করে রাখলে হয় না? শিল্পীমানুষ তো, আঠারো মাসে বছর।'

'বেশ, চল না আজই বিকেলে আমরা অসিতবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি।'

একটু ইতিউতি করছিলাম। তিনি আমার মনোভাব অনুমান করলেন। 'নাগো না, শরীর অনেকটা ভাল। আমাকে একবার চেম্বারে যেতেও হবে। সেখানের কাজ সেরে অসিতবাবুর আর্টস্কুলে।'

অগত্যা তাই হোক! লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুঃসীমার বাইরে অথচ নিকট সংলগ্ন, গোমতী নদীর সাঁকো পার হয়ে, বাদশাবাগ বীথির কিছুটা পথ পেছনে ফেলে বামপার্শ্বে এক বিস্তৃত ভূখণ্ডে বিশ্রুতকীর্তি এই 'আর্ট অ্যাণ্ড ক্রাফটস্' অর্থাৎ সরকারি শিল্পবিদ্যালয়। শাসক ইংরেজের উত্তরাধিকার হস্তান্তরিত দেশীয়দের হাতে। অসিতকুমার প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ এই শিল্প শিক্ষায়তনের।

অধ্যক্ষের বাংলো তো নয়, যেন মনোরম উদ্যান-বাটিকা। অতুলদার মোটর থামতেই অসিতবাবু ব্যস্তসমস্ত হয়ে বাইরে এসে তাঁকে সংবর্ধনা করে শান্তিনিকেতনী প্রথায় সজ্জিত হলঘরে এনে বসালেন। সহগামী আমিও।

শিল্প-রসজ্ঞের রুচির প্রযত্ন কক্ষটির আষ্টেপৃষ্ঠে।

'অসিতবাবু, উত্তরার জন্য একখানা কভার এঁকে দিতে হবে যে। শুনেছেন তো আমাদের কাগজের কথা। আপনারা সব এগিয়ে আসুন।' আমার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে—'সুরেশকে নিয়ে এসেছি। আলাপটা করে রাখুন, ওর হাত ছাড়ানো সহজ হবে না।' অতুলদার হাস্য-মধুর কথা বলার আচরণ বড়ই হৃদ্য।

'শুনেছিলাম আপনার শরীর ভাল নেই। একটা খবর দিলেই পারতেন। এর জন্য এত কষ্ট করে, এতদূর—' অসিতবাবুর অপ্রতিভ কণ্ঠস্বর। কথা শেষ হতে দিলেন না অতুলদা—'না, না, এখন ভাল আছি। বেশ, ওই কথাই রইল।'

'আপনি একক শিল্পীই নন, বইও লেখেন এ-সম্বন্ধে। আপনার 'অজন্তা' 'বাগগুহা ও রামগড়' পড়েছি। 'ভারতী' মাসিকে তো প্রায়ই আপনার প্রবন্ধ বেরোতে দেখেছি। এখন থেকে আপনার উপর 'উত্তরা'র একাধিপত্য।' আমার কথা শুনে অসিতবাবু স্মিতহাস্যে সর্বপ্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন।

ঠাকুরবাড়ির সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিকট আত্মীয়, শিল্প ও সাহিত্যে সব্যসাচী, শান্তভাষী, দীর্ঘদেহী রূপবান পুরুষ এই অসিতকুমার আমার পরবর্তী জীবনে খুব কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন।

অসমাপ্ত কথার জের টেনে আমরা পুনরায় মিলিত হলাম অতুলপ্রসাদের বাসগৃহে। কুমুদবাবুর সঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদও এসেছেন।

মাতৃদেবীর অবস্থার ক্রমাবনতি, কিন্তু দুঃখজয়ী অতুলপ্রসাদ আমাদের নিরাশ করলেন না। পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে এসে আমাদের চর্চার উদ্বোধন করে ইতিকর্তব্য বিষয়ে অবহিত হলেন মুহূর্তেই। করণীয় বিষয়গুলির স্তরবিন্যাস করে বললেন, 'প্রথম কথা, প্রেস ঠিক করা। সুরেশ, এ কাজ তোমার। প্রেস উপযুক্ত হলে, কোন মাস থেকে পত্রিকা বেরোতে পারে, তার বিচার। প্রথম সংখ্যার রচনার বিধি-বিধান, কমলবাবু এ ভার আপনার।'

'রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী, আমাদের আরম্ভের স্বস্তিকচিহ্নটি এনে দিতে হবে আপনাকে।' অতঃপর আমার কথা ফুটল।

'লিখব বৈকি। আমি কবিকে নিশ্চয় লিখব।' একটু থেমে: 'এসব নয় হল কিন্তু কুমুদবাবু যে শূন্যভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষ, তার কি?'

'প্রকাশ্য-সভায় যাঁরা স্বীকার করেছেন তাঁরা নিজ নিজ সহরের মাননীয় প্রতিভূমাত্র নন, নিজেরাও বরেণ্য। স্মারকপত্র ত' পাঠানো হয়েছে

প্রতিজনের নামে। তাঁরা যে শুধু প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু নিশ্চয় জ্ঞানের সময় এখনও আসেনি।' আমার উচ্ছ্বাসপ্রবণ চারিত্রিক রহস্যটুকু এতদিনে অতুলদার আয়ত্তে।

'সুরেশ খুবই আশাবাদী।' অতুলদার প্রসন্ন হাস্য আমায় স্পর্শ করে গেল।

দু' একটি এ-প্রশ্ন, সে-প্রশ্নের মধ্যে কথার পালা শেষ করে আমাদের বিদায়-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। মোটর আমাদের বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছে। পথে যেতে যেতে নিরন্তর অতুলপ্রসাদের সেই গানখানি আবৃত্তি করতে মন চাইছে: 'মনোদুখ চাপি মনে, হেসে নে সবার সনে'।

এইমাত্র সেই মূর্ত গানটির কাছ থেকেই তো বিদায় নিয়ে এলাম।

৬

ক্ষুদ্র একটি কাঠের হ্যাণ্ডপ্রেস ও কিছু পুরনো টাইপ সম্বল করে যে 'ইণ্ডিয়ান প্রেসে'র আবির্ভাব উত্তরপুরুষে সেই 'ইণ্ডিয়ান প্রেস' মুদ্রণ-শিল্পে যুগান্তর এনেছিল। যেন রূপকথা! সেকালে বাংলাদেশেও এমন অনবদ্য মুদ্রণ সম্ভব ছিল না। সম্ভব ছিল না বলেই কি শিল্পী রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হয়েছিলেন মুদ্রণ শিল্পের এই বৈপ্লবিক সমারোহে! এই শতাব্দীর প্রথম তিন দশক রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের মুদ্রাকর ও প্রকাশক এলাহাবাদের এই ইণ্ডিয়ান প্রেস। এখান থেকেই রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর রাজসংস্করণ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়ে রবীন্দ্র-গুণগ্রাহী পাঠকমহলে সাড়া জাগায়। ললিতবাবুর অনুরোধ-পত্রখানি বহন করে প্রয়াগে এসে দেখা করলাম ইণ্ডিয়ান প্রেসের কর্মকর্তা হরিকেশব ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে।

সুপ্রসন্ন ভদ্রলোক অবহিত হয়ে আমার বক্তব্য শুনলেন। বরাভয় দিলেন। প্রেসের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। প্রত্যাবর্তনের অবসরে স্বয়ং ঘোষ মহাশয় আমাকে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন বিভাগ দেখালেন। কী বিরাট কর্মকাণ্ডের পিরামিড! প্রবাসে বাঙালির এ কীর্তি-মিনার আমার মনকে গর্বে রোমাঞ্চিত করে তুলল।

যখন আমার গতিবিধি অপ্রতিবন্ধ, অকস্মাৎ সব স্তব্ধ অতুলপ্রসাদের মাতৃ-বিয়োগের সংবাদে। এই ত' কয়েকদিন পূর্বের কথা। মৃত্যু যে

এত ত্বরান্বিত হয়ে মাতৃবৎসল পুত্রকে মুহ্যমান করবে এতটা ভাবতে পারিনি।

শুকতারা ও ধ্রুবতারা। এই দুই নক্ষত্রে আমার অন্তরীক্ষ দীপ্যমান। শুকতারা কেদারনাথ যাঁর বিকীর্যমান প্রভা জীবন-প্রত্যুষের পথপ্রদর্শয়িতা। ধ্রুবতারা অতুলপ্রসাদ, জীবনের লক্ষ্যে দিক্‌নির্ণয়ের দিশারী।

দাদামশায় কেদারনাথ তখন কাশীতে। অতুলপ্রসাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আমার বাঞ্ছিত সাহিত্যধর্মের অনুকূল—এ-সম্ভাবনায় তিনি আন্তরিক পরিতুষ্ট। ভাবী 'উত্তরা' সম্বন্ধে প্রতিটি তত্ত্ব ও তথ্য তাঁকে জানানো আমার কর্তব্যকর্মের অঙ্গীভূত। অতুলপ্রসাদের লোকান্তরিত মাতার কথা শুনে বললেন: 'তোমার মুখেই শুনেছি অতুলবাবু মাকে কত শ্রদ্ধা করতেন, ভালবাসতেন। তিনি যে এখন খুব কাতর হয়ে পড়বেন, এটা খুব স্বাভাবিক! এ-সময় কোনো কাজের কথা তুলে যেন পত্র দিও না।'

জানবার ও জানাবার জন্য অনেক ইচ্ছা সঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও অতুলদাকে পত্র লেখার পাট এ দুঃসময়ে স্থগিত রাখতেই হল।

একটা নিঃশব্দ নিবর্তন। অসুস্থতার নির্মোক মুক্ত হয়ে পত্র লিখলাম অতুলপ্রসাদকে। উত্তর পেতে যত দেরী, তত উৎকণ্ঠা। অল্প অল্প সংশয়।

সমস্ত অস্থিরতা অপনীত হল প্রত্যাশিত লিপিখানি পেয়ে। লিখেছেন:

Carlton Hotel
Simla
23. 6. 25

প্রিয় সুরেশ

আমি সিমলায় ছুটিতে এসেছি, এখানে আসবার পর তোমার চিঠি পেলাম। উত্তর দিতে দেরী হল তার কারণ আমি এক সপ্তাহের জন্য শিমলার বাইরে গিয়াছিলাম।

তোমার জ্বর হয়েছিল শুনে দুঃখিত হইলাম; তোমার পত্র এতদিন না পাওয়াতে আমি একটু বিস্মিত হইয়াছিলাম।

'উত্তরা' বাহির করিবার চেষ্টা এখন থেকে করতে হবে।

আমি তোমার প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে পরম্পরায় মত প্রকাশ করিতেছি।

১. আপাততঃ ইণ্ডিয়ান প্রেসে ছাপতে দেওয়াই সঙ্গত মনে হয়; বিশেষত যখন ১২ টাকা ফর্ম্মায় ছাপাবে। কাজটা বোধ হয় পাকা করে ফেলাই ভাল। তারপর যদি লক্ষ্ণৌতে ভাল বাঙ্গলা ছাপাবার বন্দোবস্ত হতে পারে তবে বিবেচনা করা যাবে।

২. অফিস লক্ষ্ণৌতে হওয়াই আমার মত; এবং তোমাকেও এখানে থেকেই কাজ করতে হবে। প্রুফ দেখা সম্বন্ধে তুমি একটা সুবন্দোবস্ত করে এসো।

৩. বেশ, ১লা আশ্বিন থেকেই কাগজটা বাহির হউক—মহালয়ার দিন। ততদিনে আশা করি প্রতিশ্রুত টাকাগুলি পাওয়া যাবে, আমাব বোধ হয় তোমাকে একবার টাকা ও গ্রাহক সংগ্রহ করবার জন্য বেরুতে হবে।

৪. আপাততঃ আমাব আফিসে অর্থাৎ 3 Banks Road, Lucknow-এ 'উত্তরা'র আফিস হউক। যদি বাঙ্গালার মাসিকপত্রিকায় 'উত্তবা'ব বিজ্ঞাপন দিতে চাও দিতে পার।

৫. লক্ষ্ণৌ ফিরে গিয়ে অসীতবাবুকে 'উত্তবা'র cover এর জন্য অনুরোধ করব। আমি 3rd July ফিরব।

৬. আমি রবীবাবুকে অনুবোধ কবব এবং আমি হয়ত জুলাই মাসের শেষে কলিকাতায় যাব তখন তাঁকে বিশেষ করে ধরব। কবিতা ও প্রবন্ধের জন্যে।

৭. শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিবাজ এবং শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েব সহায়তা পাইব শুনিয়া সুখী হইলাম।

৮. তুমি সবলা দেবীব কাছে তাঁর অভিভাষণটা চেয়ে পাঠিও, তাঁর কাছে আছে। আমার অভিনন্দনটা তোমার কাছে আছে ত? 'প্রবাসী বাঙ্গালী' ত সমস্তটা ছাপাল না। 'উত্তরা'র প্রথম সংখ্যায় দিব।

৯. বিজ্ঞাপন ও গ্রাহক সংগ্রহের চেষ্টায় কলিকাতা ও পরে অন্যান্য স্থানে যাওয়া আমি ভালই মনে করি।

আমি কায়োমনবাক্যে 'উত্তরা'র প্রতিষ্ঠা ও স্থায়ীত্ব কামনা করি সুতরাং আমার যত্ন ও চেষ্টা তুমি আশা করিতে পাব।

আমায় লক্ষ্ণৌর ঠিকানায় পত্র লিখিও।

শুভাকাঙ্খী
শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

আমার প্রতিটি জিজ্ঞাসার উত্তর এবং আমার কার্যক্রমের সমর্থনপুষ্ট এই পত্রপুট। চিত্তবিক্ষেপের নজীরও আছে, নইলে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কেদারেশ্বরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হতেন না, হতেন না অসিতবাবু অসীতবাবু বা রবিবাবু রবীবাবু। এই চিঠিতে কেবল কাজের কথা, শুধু শুষ্ক কর্তব্য নির্ধারণ। মনের গভীরে বেদনার যে ফল্গুধারাটি প্রবহমান তা এই পত্রে অনুপস্থিত।

সেদিনের সেই ক্লিশিত মনোব্যথার উৎসমুখের সন্ধান পেয়েছিলাম জীবনের প্রান্তে এসে।

অন্যত্র প্রকাশিত একখানি পত্র দেখে চমকে উঠেছিলাম। পত্রখানি তাঁর জ্যেষ্ঠতাতপুত্র ভ্রাতা ও সখা সত্যপ্রসাদ সেনকে লেখা। তারিখের ব্যবধান মাত্র একটি দিনের। লিখছেন:

Carlton Hotel
Simla, 22. 6. 25

দাদা

আমি ছুটিতে তিন সপ্তাহের জন্য সিমলাতে আসিয়াছি। শারীরিক ভালই আছি, কিন্তু মা হারা হওয়াতে মনটা মাঝে মাঝে বড় বিচলিত হয়। তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্য একরকম ভালভাবে হইয়াছে। কলিকাতা হইত প্রচারক গুরুদাস চক্রবর্তী অসিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণ আশ্রমে প্রায় ১৫০০ রুগ্ন আতুর ও বিপন্নদের খাওয়ানো হইয়াছিল। মার নামে সেবাশ্রমে একটি শুশ্রূষালয় নির্ম্মাণ করিবার জন্য ৩০০০ হাজার টাকা দিব প্রতিশ্রুত হইয়াছি। ফিরিয়া গেলে তার কাজ আরম্ভ হইবে। আরও ২৫০০ শত টাকা ব্রাহ্ম-সমাজে প্রচারের কাজে দিব বলিয়াছি।···

আমার জন্য ভাবিও না। যিনি দুঃখকষ্ট দিতেছেন তিনিই রক্ষা করিবেন। ···আমি ৩রা জুলাই লক্ষ্ণৌ ফিরিব। সেখানেই পত্র দিও।

তোমার ছোট ভাই
অতুল

অতুলপ্রসাদের এই দ্বৈত ব্যক্তিত্বরূপের প্রকাশ সমসাময়িক এই লিপি দু'খানির মাধ্যমে। প্রথম পত্রখানি—সংসারের পথে হাঁটা, কত ফুল, কত

কাঁটা—কর্তব্যতার নিদর্শন। দ্বিতীয়টি হৃদয়-সঞ্জাত একটি ব্যথাতুর কান্না। 'যিনি দুঃখকষ্ট দিয়াছেন, তিনিই রক্ষা করিবেন।' 'হালে যখন আছেন হরি' তখন 'সেইতো তরীর কর্ণধার।'—আত্মসমর্পণের চরম উৎকর্ষ।

যুক্তপ্রদেশের ভয়াবহ রূপ-পরিবর্তনের লক্ষণ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আষাঢ় গগনে বর্ষার নূপুরধ্বনির সংকেত। কোর্ট-কাছারি, স্কুল-কলেজ আবার নিয়মিত হতে চলেছে। প্রবাসীরা দলে দলে এসে পৌঁচচ্ছেন নিজ নিজ কর্মস্থলে।

লখনৌ এলাম প্রথম শ্রাবণে। এবারও কমলদার স্নেহনীড়ে। দেখা করতে গেলাম মাতৃবিয়োগ-বিধুর অতুলদার বাসভবনে।

মুখ দেখে অনুমান করছি তাঁর শরীর এখন ভালই। প্রফুল্লতার ঝিলিক চোখের প্রান্তে। কিন্তু মানুষের মুখেই তো মুখোশ। মুখোশের অন্তরালেই স্বরূপের লীলা-বৈচিত্র্য। সেখানে অনধিকারীর প্রবেশ নিষেধ। এর জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করবার প্রয়োজন হয় না।

এহ বাহ্য আগে কহ আর।

'উত্তরা'র গ্রাহক-শিকার, স্বীকৃত অর্থ আহবণের সুরাহা—এ দুটি নিশানা সামনে রেখে এটা আমার দ্বিতীয় অভিযান।

'প্রবাসজ্যোতি'র প্রথম পর্বের অভিজ্ঞতালব্ধ প্রত্যেকটি পথানুগমন 'উত্তরা'র ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে পূর্বাপেক্ষা অনেক সাবালক, অনেক মার্জিত। এবার আমার গন্তব্যপথ সহজ ও সুগম। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ললাটিকা আমার ললাটে। অতুলদার অফিস-রুমের ঝিকিমিকি বেলার আসরে আমরা কয়েকজন। কর্মক্লান্ত মানুষটির বিশ্রামের সময়টুকুও 'উত্তরা'র প্রাণপ্রতিষ্ঠায় উৎসৃষ্ট। আমার সহরে সহরে পরিভ্রমণের প্রাক্কালে অতুলপ্রসাদ একটু খলখল কণ্ঠে বললেন: 'কোন ক্লাসে বেড়াবে ঠিক করেছ?' তাঁর সহানুভূতিপ্রবণ মানসিক অনুরাগের উত্তাপে আমার চিত্ত উৎসাহে, উদ্দীপনায় আলোড়িত। বললাম: 'কেন অতুলদা, থার্ড ক্লাসে।' 'না, না, ইণ্টারেই যেও।' দরদী কণ্ঠের উক্তি।

আমি হেসে কুমুদদার প্রতি: 'আমাদের কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের তবিলে ক-টা টাকারই বা সঞ্চয়।'

এ পি সেন হল, লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়

আলোকচিত্র । শ্রীচিত্রজিৎ ঘোষ

লখনৌতে অতুলপ্রসাদের নামাঙ্কিত রাজপথ

আলোকচিত্র ।। শ্রীচিত্রজিৎ ঘোষ

৭

সকলের বয়ঃকনিষ্ঠ কিন্তু প্রীতিভাজন। চাপল্যটুকু ক্ষমার কোঠায়।

উত্তর ভারতের কয়েকটি সহর প্রদক্ষিণ সমাধা। আর্থিক অনুদানে কেহ করুণায় বঞ্চিত করেছেন, কেহ দাক্ষিণ্যে উদাত্ত হয়েছেন। গ্রাহক হবার অঙ্গীকারপত্র তো কলমের কারসাজি। কার্পণ্যের টানাটানি ছিল না।

'উত্তরা' প্রকাশের সন্ধিক্ষণে প্রতিদিনই তো আমাদের মিলন। কখন অফিস সংলগ্ন বিশ্রামকক্ষ অথবা আউটরাম রোডের বহির্বাটিতে।

পত্রিকার উদ্ভব নিয়ে স্বভাব-গম্ভীর অতুলপ্রসাদের উৎসাহী প্রতিচ্ছায়াটি আজও আমার মনের দর্পণে মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে। সৃষ্টিসুখের উল্লাসে আবেগের উচ্ছ্বসন তাঁর চলনে, কথনে, হাস্যে-পরিহাসে।

'উত্তরা'কে শিখণ্ডী করে একটি সাময়িক সাহিত্য-আবহাওয়া অতুলদার ড্রয়িংরুমে। কজনই বা আমরা। কমলদা ও আমি। ধূর্জটিপ্রসাদকে সাথী করে মোটরে আসতেন ড' রাধাকুমুদ। পরিধানে ট্রাউজার্স ও সার্ট। হাতে র‍্যাকেট। দুজনেই টেনিস-কোর্টের ফেরতা। অসিতকুমারের দর্শন মাঝে-সাঝে। দুঃখ করে বলতেন: 'প্রিন্সিপালের চাকরি তো কেরানিরও বেহদ্দ। 'অ্যাডমিনিস-ট্রেশন' নিয়েই কাটে দিন-রাত। রং ও তুলি যে যার নিজের নিজের কোটরে।'

মক্কেলদের নথিপত্রের নিরবচ্ছিন্ন ব্যস্ততার মধ্যে বৈকালিন এই ক্ষণেক অবকাশটুকুর জন্য অতুলদা যেন উন্মুখ। কিন্তু 'দিন মোর দিনু তোরে, আবার আহ্বান?' হ্যাঁ, আবার আহ্বান।

আড্ডা জমজমা। অবশ্য মূলতন্ত্র 'উত্তরা'। ও কে? অতুলদার খাস মুনশী মক্কেলের আগমন-সংবাদ নিয়ে বিনীতভাবে এসে দাঁড়িয়েছেন কক্ষদ্বারে। কোনো সময় আগন্তুককে অপেক্ষা করতে বলেছেন, কখন-বা তখুনি উঠে একবার মোলাকাত করে, মুনশীজীকে তৎপর হতে আদেশ দিয়ে আবার ফিরে এসেছেন পূর্বাবস্থায়। মুখে সলজ্জ হাস্যের কৈফিয়ৎ: 'ওঁরা মধুভাণ্ড বহন করে এনেছেন, দেখা না করে পারি!'

জুনিয়র সহকর্মীরা জরুরী পরামর্শ করতে এসে আমাদের নাটমহলের প্রান্ত ঘেঁষে বসে থেকেছেন নিথর দর্শক সেজে। কোঠিতে সংগীতের মহফিল বসেছে,

ছুটি-ছাটায় বন্ধুদের আপ্যায়িত করেছেন সেনসাহেব, বহিরাগত মান্য মেহমানদের আসা-যাওয়া দেখেছেন তাঁরা কিন্তু সাহেবের এ নবজাত প্রতিরূপটির সঙ্গে মুখোমুখি এই প্রথম।

এই তো অসিতকুমার উপঢৌকন নিয়ে এলেন 'উত্তরা'-র প্রচ্ছদপটটি রঙিন পাতলা কাগজের মোড়কে। 'অসিতদা, 'উত্তরা'-র অলঙ্করণের জন্য আরও যে কিছু চাই।'

মহাজনদের প্রিয় নামের সম্বোধন। একাধারে শ্রদ্ধা ও অনুরক্তি। 'বেশ তো, চলে এস না আমার বাংলায়।' হালদার সাহেবের হার্দিক সম্ভাষণ।

'এবার সিমলায় থাকার সময় সোলন যাই। রত্ন আবিষ্কার করে এনেছি সেখান থেকে।' আমরা উৎকর্ণ অতুলদার কথায়।

'অবিনাশবাবুর সঙ্গে দেখা হল। অবিনাশবাবু, অবিনাশচন্দ্র মজুমদার। শিখ ভাষা ও শিখ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। গুরু তেগবাহাদুরের বাণীর অনুবাদ করেছেন বাংলায়। কাগজের চিন্তাটা তো মাথায় ঘুরছে। 'উত্তরা'-র জন্য সেটা সংগ্রহ করে এনেছি।'

'ধূর্জটি, তোমার লেখার কি হল, কবে দিচ্ছ?' রাধাকমলবাবুর তাগিদ। 'ও তো কবেই শেষ! সুরেশকে শুনিয়েও দিয়েছি। লেখাটা পড়ে কিন্তু অতুলদা, আমায় গালমন্দ দেবে অনেকে দেখবেন।' ধূর্জটিদার সাফ সাফ কথা।

'লখনৌ সম্মেলনে অনেক ভাল ভাল প্রবন্ধ এসেছিল, সেগুলি ঘেঁটে কিছু বেছে রেখেছি; আমার সম্পাদকীয় লিখে ফেলছি। সে আর কতক্ষণ, একবার বসতে পারলে হয়।' কমলদার আত্মতৃপ্তি।

'অতুলদা, 'উত্তরা'-র জন্য নতুন গান কি লিখলেন, শোনান না?' ধূর্জটিপ্রসাদের বিনম্র বিনতি। মাথা দুলিয়ে অতুলদা 'না হে ধূর্জটি, নতুন গান কিছু লেখা হয়ে ওঠেনি। ছুটির পর ফিরে এসে কাজের বড় চাপ। দেখছ না, একটু গল্প করব তারও মধ্যে কত ঘর-বার। আমার স্বাগত অভিনন্দনটা আর স্বরলিপিসহ 'তাহারে বলিব বল কেমনে' গানখানা প্রথম সংখ্যা 'উত্তরা'য় দেব। স্বরলিপি সাহানার।'

একই চিত্র-কাব্য প্রতিদিনের। অবশ্য কথকের পরিবেশনার বৈচিত্র্যে ও কলা-কৌশলে স্বাদ কমবেশী।

আজকের বৈঠকী মজলিস একটু উদ্বেল। কক্ষমধ্যে প্রবেশের অপেক্ষা।

অতুলদার হাস্য-রঞ্জিত আনন। 'এই নাও রবিবাবু কবিতা পাঠিয়েছেন। 'উত্তরা'-র আশীর্বাণী।' রবীন্দ্রনাথকে 'রবিবাবু' বা অবরে-সবরে 'কবি' এই নামে অভিহিত করতেন অতুলপ্রসাদ। যদিও 'গুরুদেব' আখ্যায় রবীন্দ্রনাথ তখন ব্যাপ্ত ও বন্দিত।

ততক্ষণে আমার কাছ থেকে কবিতার পাণ্ডুলিপি হস্তান্তরিত ধূর্জটিপ্রসাদ সমীপে। তিনি ধীরে ধীরে কবিতাটি পাঠ করলেন :

আশীর্বাদ

বঙ্গের দিগন্ত ছেয়ে বাণীর বাদল
বহে যায় শতস্রোতে রস-বন্যাবেগে,
কভু বজ্রবহ্নি কভু স্নিগ্ধ অশ্রুজল
ধ্বনিছে সংগীতে ছন্দে তারি পুঞ্জমেঘ ;
বঙ্কিম শশাঙ্ককলা তারি ঘন জটা
চুম্বিল মঙ্গলমন্ত্রে রচে স্তরে স্তরে
সুন্দরের ইন্দ্রজাল, রত্নরশ্মিচ্ছটা
ছায়ে দিনের অন্তে রেখে তারি পরে
আলোকের স্পর্শমণি। আজি পূর্বরাগে
বঙ্গের অম্বর হতে দিকে দিগন্তরে
সহস্র বর্ষণধারা একি না ছড়ায়ে
প্রাণের আনন্দবেগে পশ্চিমে উত্তরে ;
দেন বঙ্গবীণাপাণি অতুলপ্রসাদ,
চিত্তজাগরণী গানে নিত্য আশীর্বাদ।

আশীর্বাদ। উত্তরা না অতুলপ্রসাদ? 'কণিকা'-র দুটো পংক্তি মনে পড়ে গেল ;

'পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি
মূর্তি ভাবে আমি দেব হাসে অন্তর্যামী।'

অন্তর্যামীর হাসিই শাশ্বত। একদা রবীন্দ্রনাথ 'শ্রীমান অতুলপ্রসাদ সেন করকমলে' অতিরিক্ত এই লাইনটি সংযোজন ও দু'একটি শব্দ পরিবর্তন করে কবিতাটি সামনে রেখে 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থখানি উৎসর্গ করেন অতুলপ্রসাদকে।

১৩৩২ আশ্বিন। সময়টা শুভ। মহালয়া। ইণ্ডিয়ান প্রেসের কাশী-শাখার মুদ্রণালয় থেকে 'উত্তরা'র প্রকাশ—প্রকাশ নয়, আবির্ভাব। বারাণসী 'উত্তরা'র জনয়িত্রী। পালয়িত্রী লক্ষ্মণাবতী। সৃষ্টিসুখের যেমন বেদনা, তেমনি উল্লাস।

লখনৌ স্টেশনে নেমে একখানি দ্রুতগামী টাঙ্গায় আউটরাম রোডে অতুলদার বাংলো অভিমুখে। হাতে সযত্নরক্ষিত নবজাত 'উত্তরা' অপরাহ্ণ। শরতের অকাল বর্ষণে রাস্তাঘাট কদমাক্ত। ফটকের প্রবেশমুখে সারথি রথের গতি সংযত করে ভিতরে ঢুকছে। টাঙ্গা থেকে এক আশ্চর্য দৃশ্য আমার চোখে পড়ল।

গাড়ি-বারান্দার সম্মুখে অলিন্দে পায়চারি করছেন অতুলপ্রসাদ। গায়ে সুদৃশ্য রঙিন ড্রেসিং গাউন। টাঙ্গা থামার শব্দে তাড়াতাড়ি হাসি হাসি মুখে এগিয়ে এসে বললেন, 'এই যে, এসে গেছ। তোমারই অপেক্ষা করছিলাম। ট্রেন লেট করেনি দেখছি। কই, দেখি দেখি 'উত্তরা'।'

পত্রিকাখানা হাতে নিয়ে একেবারে বসবার ঘরে। কাগজখানির দু-চার পাতা উলটে, কোনো কোনো লেখা একজনের দেখে আবার অন্য পৃষ্ঠা।

'কাগজ আমাদের ভালই হয়েছে।' পরক্ষণেই সচেতন হয়ে 'নাও, নাও, বাথরুমে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে এস। চা একসঙ্গেই খাব। তা বলছি কি, এখন এখানেই থাক। পরের কথা পরে।'

হাত-মুখ ধুয়ে নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে বাথরুম থেকে বেরোতেই বেয়ারা সমীহ করে জানাল: 'সাহেব আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

ভিতর মহলে মাঝারি আকারের ডাইনিং-রুম। টেবিলের উপর চায়ের সমস্ত সরঞ্জাম প্রস্তুত। তাছাড়া কেক, বিস্কুটের নৈবেদ্য। বিবিধ ফলের সহাবস্থান। অগ্রবর্তী চেয়ারখানিতে বাড়ির কর্তা বসেছেন, হাতে একখানা বই। দু'পাশেই চেয়ার। দুজন ভদ্রমহিলা ও একটি ফুটফুটে ছোট মেয়ে বসে। বয়স কতই-বা। ছয় কি সাত। অপ্রতিভ মন্দগতিতে সেখানে প্রবেশ করে অতুলদার পাশের শূন্য আসনখানি দখল করলাম।

মহিলা দুজনের মধ্যে যিনি চা পরিবেশন করতে উদ্যত, অতুলদা তাঁকে উদ্দেশ করে: 'এই সুরেশ, তোমায় তো এর কথা আগে বলেছি।' আমার দিকে

দৃষ্টিপাত করে 'আমার বোন হিরণ।' অল্প থেমে একটু মুচকি হেসে—'আর ঐ যে ছোট্ট মহিলাটি তোমার পাশে বসে, উনি হচ্ছেন মাননীয়া সীতা, সীতা আয়েঙ্গার।' মেয়েটি তাড়াতাড়ি দু'খানি কচিহাতে চোখ-মুখ ঢাকবার চেষ্টা করছে।

অতুলদা প্রতিবেশটা সমৃদ্ধ করে তুললেন। অনন্তর হাতের গ্রন্থখানি আমায় সাদরে অর্পণ করে বললেন, 'আমার গানের বই বেরিয়েছে। এখানা তোমার জন্য।' হর্ষোৎফুল্ল হয়ে বইখানা হাতে নিলাম।

'কয়েকটি গান।' প্রথম পৃষ্ঠাটি উন্মুক্ত করতেই অতুলদার হস্তাক্ষর, 'স্নেহের সুরেশকে—অতুলদা'।

গানের বইটির সর্বাঙ্গে হাত বুলোতে বুলোতে বললাম, 'অনেক পূর্বেই এ-বই প্রকাশ হওয়ার প্রয়োজন ছিল অতুলদা। আপনার গান কত গায়কের কণ্ঠে অথচ তাঁরাও জানেন না কার লেখা এ-গান। রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত—যার যেমন ইচ্ছা ভেবে নেন।'

একটু যেন লজ্জিত। বললেন: 'ধূর্জটির কাণ্ড। না বলতে পারিনি। এখাতা, সেখাতায় ছড়ানো-ছেটানো গানগুলি নির্মল, নির্মল দে খুঁজে পেতে সব তুলে দিলে ধূর্জটির হাতে। কলকাতায় ওর এক বন্ধুর প্রেস থেকে ছাপিয়ে···এই ত ক'দিন আগের কথা।' দুজনেই একনিষ্ঠ। দুজনেই গুণগ্রাহী। দুজনেই সংগীত ও সাহিত্যপ্রেমী। এড়ানো শক্ত বই কি!

'চল, একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।' অতুলদার আহ্বান। 'চলুন।' তাঁর সঙ্গ-সুখ তো সুখাবহ।

মোটর চলছে তো চলছেই। এসে থামল চারবাগ স্টেশনের কাছ-বরাবর এক তেপান্তরে—প্রায় সমাপ্ত একটি অট্টালিকার সম্মুখে। মোটর থেকে নামতে নামতে: 'এখানে বাড়ি তৈরী হচ্ছে আমার।'

পতিত বিস্তীর্ণ ধূধূ ভূমিখণ্ড। মাঝখান দিয়ে এক দীর্ঘ পথ। পথের দুধারে নবরোপিত বৃক্ষশ্রেণী সতেজে উঁকি দিচ্ছে সযত্ন-বিন্যস্ত ইট দিয়ে ঘেরা আশ্রয় থেকে। দু'পাশের জমিতেই দু'একখানি নির্মীয়মান বাড়ির কাঠামো।

নিজস্ব বাড়ির চারপাশটা একবার চক্কর দিয়ে, কর্মরত লোকজনদের কিছু নির্দেশ উপদেশ বিতরণ করে, সামনের রাস্তা ধরে পায় পায় অগ্রসর হতে লাগলেন অতুলদা। একটু গুন গুন গুঞ্জন, কথা নয়, শুধু সুরের হিন্দোল। উন্মুক্ত নির্জন

প্রান্তরে গোধূলির স্বল্পালোকে উন্মনা অতুলপ্রসাদের এ রূপের সামনে কোনো কথার ঘটা যেন তপস্বীর ধ্যানভঙ্গের অপরাধ। ধ্যানভঙ্গ করলেন নিজেই। গুনগুনানি বন্ধ হল আপনা থেকেই।

হঠাৎ আমায় প্রশ্ন করে বসলেন। 'রবিবাবু ত তাঁর গানে সুন্দর সুন্দর নাম দিয়েছেন। যেমন মালবিকা, শেফালিকা, কাননিকা, তমালিকা, আরও কত কি! 'বিস্‌চিকাটা' দেননি, না?' খুক-খুক করে একটু হেসে নিলেন।

রাশভারী ব্যারিস্টার, ধীর স্থির জননেতা অতুলপ্রসাদ সেনের রঙ্গরসে ভরপুর খোসমেজাজের টুকটাক স্মৃতির সঞ্চয় আজও আমার অন্তরের মণিকোঠায়।

বইয়ের আলমারি ঘাঁটাঘাঁটি করার কুকর্মটি আমায় প্রলুব্ধ করে। পাশাপাশি দু' দুটো আলমারিতে ঠাসাঠাসি বই। আইনজ্ঞের অধিকার-ক্ষেত্রের বাইরে এসব বই। সাহসী হয়ে বইগুলো নাড়াচাড়া করছিলাম। মিতালি রাজভাষা ও বাংলা ভাষায়।

এখানে রবীন্দ্রনাথের অনেক ঐশ্বর্য। 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থখানি সদ্য প্রকাশিত। পুস্তকখানির প্রথম পৃষ্ঠায় কবির মুক্তাক্ষরে লেখা উপহার। অতুলপ্রসাদকে। 'পূরবী'খানি সযত্নে যথাস্থানে রেখে, আর একখানি, আরও একখানি।

'খাবে এস'। অতুলদা পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ত্রস্তে আলমারি বন্ধ করে তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আবার সেই ডাইনিং-রুমে। পুরোদস্তুর ডিনার টেবিল। ছুরি-কাঁটা-চামচ, ন্যাপকিন, কাঁচের গ্লাস, ছোট-বড়-মাঝারি সব প্লেট ডিস। প্রতিজনের জন্য পৃথক্ পৃথক সজ্জিত। টেবিলের মধ্যভাগে রুচিকর ভোজ্যসম্ভার। এরকম পরিবেশে অনভ্যস্ত। ঘাবড়াবার কথা। দুরু দুরু বক্ষে চেয়ারে উপবেশন করলাম। বয় অদূরে আদেশের অপেক্ষায়। অপাঙ্গে কারও মুখের দিকে নয়, হাতের দিকে। ছোট মেয়ে সীতা, সার্থক সেও।

অনুকরণ করতে গেলাম। ছুরি-কাঁটা-চামচ বিদ্রোহী হয়ে উঠল। অতুলদা আমার এ বিড়ম্বনা অনুধাবন করলেন। মার্জিত আচরণে নিজের ছুরি-কাঁটা একপাশে সরিয়ে রেখে হাত দিয়ে খেতে খেতে বললেন: 'না না, হাত দিয়ে খাও তুমি।'

পরাজিত কিন্তু স্বচ্ছন্দ।

'উত্তরা'র প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার বিজ্ঞপ্তি।

৩নং ব্যাঙ্কস রোড
লক্ষ্ণৌ

সবিনয় নিবেদন

আপনাদের সম্মিলিত আনুকূল্যে 'প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনী'র মুখপত্র 'উত্তরা' প্রকাশিত হইল।

'উত্তরা'র জন্ম ও জীবন-কল্পে আপনার গ্রাহক হইবার সম্মতি-পত্রই মূল।

উক্ত সম্মতি-পত্রানুযায়ী 'উত্তরা'-র প্রথম (আশ্বিন) সংখ্যা আপনাব নামে (ইহার বার্ষিক মূল্য স-ডাক ৩।০ আনায়) আজ ভিঃ পিঃ করা হইল ;—গ্রহণ করিয়া বাধিত ও উৎসাহিত করিবেন।

এই প্রকাশের পশ্চাতে আপনাদের যে এই সাহায্য ও শুভ ইচ্ছা রহিয়াছে, কেবল তাহাই প্রবাসী বাঙ্গালীর এই অনুষ্ঠানটিকে উদ্দেশ্য-পথে অগ্রসর করিয়া দিতে সক্ষম।

নিবেদক
প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন

তাং ....

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবের বাস্তব রূপায়ণ।

পত্রিকাব সূচনায় অতুলপ্রসাদের অভিপ্রায়ে তাঁর ব্যাংকস রোডের বাংলোয় 'উত্তরা'র গৃহস্থালী সাজিয়ে বসা হল নিঃসন্দেহ কিন্তু অচিরেই সে সংসার গুটিয়ে স্থানান্তরিত করতে হল অন্যত্র। পরিবর্তন করা হল ১০।১ লাটুশ রোডে। মডেল বুক ডিপো। নতুন ও পুরাতন গ্রন্থ ক্রয়-বিক্রয়েব বিপণি-গৃহ। তারই এক অংশে। নিজেব জন্য একটি মনোমত নীড়ও আবিষ্কার করা গেল হিউয়েট রোডে।

'উত্তরা'-র জয়ধ্বনি প্রবাস-ভূমির সীমা অতিক্রমণ করে বাংলার সাহিত্য-গগনেও অনুরণন তুলেছে।

' 'উত্তরা', উত্তমা হয়েছে'—সোনার কলম দিয়ে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ অসিত-কুমারকে। প্রশংসার ফুল পাঠিয়েছেন প্রবীণ সাহিত্যিক কবি ও সাংবাদিকরা। তরুণ সাহিত্যসেবী যে 'তুর্কি' গোষ্ঠী বাংলা সাহিত্যে নবযুগ আনয়নের দাবীদার,

তাঁরাও পিছপা নন। তাঁদের মুখপাত্র 'কল্লোল' পত্রিকার প্রধান শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখলেন :

Kallol Publishing House
Publishers & Book Agents.

Monthly Publication
Kallol
A Monthly Magazine
in Bengali.

27, Cornwallish Street.
Calcutta.
কার্তিক সাতই, তেরশো বত্রিশ

ভাই সুরেশবাবু,

উত্তর ভারতের প্রবাসী বাঙালীদের মুখপত্র 'উত্তরা' সেদিন কল্লোলের বিনিময়ে এসে যখন আমার হাতে পৌছল তখন সাগ্রহে সানন্দে এবং সগৌরবে তাকে মাথায় তুলে নিলেম। হাঁ, কাগজ বার করতে হয় ত এমন কাগজই বার হওয়া উচিত। প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে লেখকের অভাব কোনদিনই নেই, হবেও না। তবে এতদিন তাঁদের নিয়ন্ত্রিত হবার যথাযোগ্য সুযোগ আসেনি, আজ এসেচে, এ সুযোগ অবহেলিত না হ'লেই সুখী হব। অতুলপ্রসাদ, কমল ভ্রাতৃদ্বয়, কবিরাজ, ভট্টাচার্য, রায়, মুখোপাধ্যায় প্রমুখ রথীরা যে প্রতিষ্ঠানের পাণ্ডা, তার বৈভব যে কোনদিন হ্রাস হবে এটা অবিশ্বাসের কথা, তার উপর তোমার সহকারিতা যাকে প্রাণশক্তি দেবে তার সাফল্য সুনিশ্চিত। প্রথম সংখ্যা পড়ে ভারী খুশী হ'য়েচি। সব কটি লেখাই ভারী সুন্দর। বাঙলার কোন কাগজই একে প্রবন্ধ সম্পদে এড়িয়ে যেতে পারবে না।

সখ্যগর্বিত
শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

অতুলদা পুরাতন দু'খানি বাড়ির অধিকার বর্জন করে এখন অধিবাসী নবনির্মিত 'হেমন্ত-নিবাসে'। মার স্মৃতিপূত এই আবাসের একধারে চেম্বার। দূরত্ব বজায় রেখে সুপ্রশস্ত বনেদী ড্রয়িংরুম। সোফা-সেটি অপসারিত হলেই কার্পেটের আস্তরণে বৈঠকী জলসাঘর। লাহোরের চিত্রশিল্পী আবদার রহমান

চাঘতাইয়ের কয়েকখানি রঙিন মূল রচনা দেয়ালে দেয়ালে। দ্বিতলে অতুলদার শয়নকক্ষ। সম্মুখে ফুলের বাগিচা, পশ্চাতে ফলের উপবন। এই 'হেমন্ত-নিবাসে' আমার স্মৃতির অনেক কুসুম-স্তবক। সেই স্তবক থেকে খসে পড়া একটি কুসুম।

ঘটনাটি হয়ত তুচ্ছ। কিন্তু শিষ্টাচারের মানদণ্ডে যেন শুক্তির আবরণে একটি নিটোল মুক্তো। আমি তখন অতুলদার গৃহাগত। বেলা প্রায় দশটা। ছিমছাম ড্রয়িংরুমে একখানি কৌচে বসে প্রাভাতিক সংবাদপত্রের এ-পাতায়, সে-পাতায় চক্ষু দুটিকে উন্মুক্ত রেখে একাগ্র হবার চেষ্টায় তখন আমি তৎপর। তথাপি দৃষ্টি মাঝে-মাঝে বহির্গামী। অতুলদার কাছারী যাবার লগ্ন প্রত্যাসন্ন। অন্দরে প্রস্তুতির মহড়া। মুনশীজী নথিপত্র নিয়ে গাড়ি-বারান্দার একপার্শ্বে দণ্ডায়মান। অদূরে উর্দিপরিহিত সোফার মোটরের সাময়িক পরিচর্যায় কর্তব্যরত।

একজন মধ্যবয়সী সুবেশ ভদ্রলোক সুসজ্জিতা সঙ্গিনীকে নিয়ে ফটক পেরিয়ে ড্রয়িংরুমের অলিন্দে এসে মুনশীজীকে যেন কিছু প্রশ্ন করতে উদ্যত। আর প্রয়োজন হল না। কোর্টের রাজবেশে অতুলদা ততক্ষণে তাঁদের মুখোমুখি।

'আপনারা···'

থতমত খেয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'বড় অসময়ে এসে পড়েছি···' সঙ্গিনী মহিলা অসমাপ্ত কথাটির দাঁড়ি টানলেন এইভাবে : 'আপনার গান আপনার মুখে শোনবার বড় ইচ্ছে আমাদের বহুদিনের। ভেবেছিলাম, এবার সে সাধ মিটিয়ে যাব। তা আর হল কই ? আপনি তো বেরোচ্ছেন।'

'এখন তো বসবার সময় হবে না, আপনারা যদি অন্য সময়.

'আজই এখান থেকে চলে যাচ্চি আমরা। উপায় নেই থাকবার।' ভদ্রমহিলার অসহায় কণ্ঠস্বর।

'তাই ত।'

অতুলদা গলার টাইটা একটু নেড়ে-চেড়ে গুনগুন করে প্রথমে ধীরে, পরে আর-একটু উঁচু পর্দায় অল্প পংক্তির একটি গান দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে শেষ করে যুক্তকরে নমস্কার জানিয়ে, হেসে : 'আচ্ছা, চলি এবার।'

নিরাশার কুয়াশাঘন পর্দার ছিন্ন ফাঁকের মধ্য থেকে আশাতীত আলোকধারায় স্নাত হলেন আগন্তুক সংগীতপিপাসু শ্রোতা দুজন।

একটি স্বকীয় নীড় থাকলেও সে নীড় শূন্য থাকত প্রায়ই। এখানে সহৃদয়

এক আত্মীয়-পরিমণ্ডল আমাকে প্রদক্ষিণ করে। কমলদা, কুমুদদার পরিবারের সামিল যেন আমিও। তাঁদের বধুরা দেবর-স্নেহে প্রশ্রয় দিতেন অহরহ। অসিত হালদারের বাংলোটা আমার কি না, সন্দেহ জাগত মাঝে মাঝে। ধূর্জটিপ্রসাদের পাঠকক্ষে বিজলী বাতির সুইচটা টিপে আমাদের সাহিত্যপ্রসঙ্গ শুরু হত। গোটা সাহিত্য-সংসারটাই ততক্ষণে আমাদের মুঠোয়। চৌধুরী কথা, 'সবুজপত্রে'র জমাটি আড্ডার কথকতা শুনতে আমার যত উৎসাহ, ধূর্জটিদাও তত উদার।

নাঃ, এবার উঠতেই হবে, ঘড়িতে রাত এগারোটা। বিনয় দাশগুপ্তের সঙ্গ, তখনও নয়।

বিনয় দাশগুপ্তের পুরো নাম শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। হেড অব দি ডিপার্ট-মেণ্ট অব কমার্স এবং ডিন অব দি ফ্যাকাল্টি অব কমার্স আখ্যা নিয়ে বিলেত থেকে সিলেক্ট কমিটির সুপারিশে সোজা লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বিনয়দা তারুণ্যের আভায় সব সময় সবুজ। যেমন বুদ্ধিদীপ্ত, তেমনি স্মার্ট। স্বপ্নবিলাসী নন, বাস্তব জীবনশিল্পী। হরিমতী গার্লস স্কুলের পরিচালনা সুষ্ঠু হচ্ছে না, এগিয়ে এলেন বিনয়দা। অমুক প্রগতিমূলক কাজে বাধা আসছে—কেন বিনয় দাশগুপ্তই তো রয়েছেন। পদমর্যাদার উচ্চমঞ্চে অবস্থান নয়।

এখানেও গোমতী নদীর এপার-ওপারের সীমারেখা। ধূর্জটিপ্রসাদ ত একখানা বই-ই লিখে ফেললেন—'আমরা ও তাহারা।'

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে লখনৌর সাংস্কৃতিক জীবনধারা সাহিত্য শিল্প সংগীতকে আচ্ছন্ন করে আপন বেগে পাগলপারা।

বাংলাদেশের সংস্কৃতির একটা ভাগ বুঝি খাবল দিয়ে তুলে আনা হয়েছে এ নগরীতে। সংগীতে অতুলপ্রসাদ, ধূর্জটিপ্রসাদ, সান্যাল ভ্রাতৃদ্বয়, মনীষায় উপাচার্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ড. কমল ও কুমুদ, নির্মল সিদ্ধান্ত, বিনয় দাশগুপ্ত প্রভৃতি কত নাম। শিল্পে অসিতকুমার, বীরেশ্বর সেন, হিরন্ময় রায়চৌধুরী সদৃশ দিকপালদের সযত্ন প্রহরা।

এই দশকেই সুদূর বম্বে থেকে নবাগত সংগীতাচার্য পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী প্রিয়তম শিষ্য রতনঝনকরকে সহকারী করে এক অনাড়ম্বর সংগীত-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন কৈসারবাগের একটি প্রকোষ্ঠে। বহু বাঙালি সংগীত-প্রেমিক,

সংগীত-সাধকের তীর্থভূমি হয়ে উঠল এই নাতিদীর্ঘ কক্ষটি। নটী নগরীর নব জন্ম। নব রূপ। লখনৌ আজ মহাশ্বেতা।

·

১৯২৬-এর প্রারম্ভে লখনৌতে নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলন, কৈসরবাগের বারদুয়ারীতে। রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত। আমন্ত্রিত অনেক গুণী, সংগীতজ্ঞ, শিল্পী ও সমঝদার।

রবীন্দ্রনাথের অধিষ্ঠান ছত্রমঞ্জিল নবাব-প্রাসাদে। সহযাত্রী হয়ে এসেছেন অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু আরও কে কে!

ছত্রমঞ্জিল প্রাসাদের লম্বালম্বি চবুতরে এক চিত্রশিল্প প্রদর্শনীরও আয়োজন। এই মেলায় শান্তিনিকেতন শিল্পীদের বহু ছবি, অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালের অনেক চিত্রকলা। অন্যপক্ষে ওস্তাদ গায়ক, নিষ্ণাত তবলা বাদক, বিশারদ সেতারীরা এসে পৌচেছেন। আর আগত অতুলদার পরম স্নেহের সুরসাধক দিলীপকুমার রায়, আপনজন সাহানা দেবী।

সর্বজনীন সংগীতপীঠ এই লখনৌ। এখানে টাঙা-চালক টাঙা হাঁকাতে হাঁকাতে ঠুংরি ও গজলের সুর ভাঁজে। অতএব এ সহরে সংগীত-সম্মেলনের অধিবেশনে সংগীতাসক্ত রসিকজন যে স্বতঃস্ফূর্ত, এ ত স্বতঃসিদ্ধ।

সবার রঙে রঙ মিশিয়ে অতুলদাও ব্যস্তসমস্ত সর্বক্ষণ। একদিকে জীবিকা, অন্যদিকে জীবন।

এ চূড়ামণি যোগের সময়টায় আমি অসিতদার আতিথ্যে। 'চল, তোমায় অবনমামার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।' ছাড়পত্র ত আমার ছিলই, অসুবিধা হল না খুব একটা। ঠাকুরবাড়ির অভিজাত পরিবারের প্রতিভান্বিত পুরুষ অবনীন্দ্রনাথ। গায়ে জোব্বা, চশমাটি চোখে নয়, হাতে। মাথাটির সম্মুখভাগ কেশবিরল হওয়ার জন্য ললাট আরো চটালো। মুহূর্তেই উপলব্ধি করলাম, সম্ভ্রম দেখিয়ে দূরে রাখার মানুষ ইনি নন।

অবনীন্দ্রনাথকে পেয়েছিলাম ঘনিষ্ঠ কাছাকাছি। সে স্মৃতি আজও আমার মনে অম্লান। তাঁর সরস কথার টুকরোগুলো মণি-মাণিক্যের মত জ্বলজ্বল করে এক স্নিগ্ধ আলোকে চিত্তলোক উজ্জ্বল করে তুলত। নানা প্রশ্ন—'লখনৌ কেমন লাগছে, আর গোমতী।' অপূর্ব হাসিতে মুখখানি ভরে উঠত তাঁর। বলতেন: 'একটু ভাব করে নি। তোমায় বাড়ি গিয়ে লিখে পাঠাব।' ভোলেননি সে-কথা। পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এক পত্র-আলেখ্য।

সংগীত-সম্মেলন তখনও অসমাপ্ত। ছত্রমঞ্জিল প্রাসাদ-চত্বরে এক সভা। বক্তা রবীন্দ্রনাথ। বক্তৃতা ত নয়, 'কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।' অকস্মাৎ কবির এক পার্শ্বচর একখানি জরুরী 'তার' এনে তাঁর হাতে দিলেন। ক্ষণিক তালভঙ্গ। নিমেষপাত করে 'তার'খানি দক্ষিণ মুষ্টিতে আবদ্ধ রেখে আবার তদগত হয়ে উঠলেন ভাষণে। ভাষণ সমাপ্ত করে কবি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। আসনে বসেই অতুলপ্রসাদকে সম্বোধন করেন: 'অতুল, এখুনি আমাদের বিদায় নিতে হবে, এই দেখ—'

টেলিগ্রামখানি শান্তিনিকেতন থেকে এসেছে—অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু-সংবাদ বহন করে। মর্মান্তিক সংবাদেও চিত্রার্পিতপ্রায় অবিচল স্থৈর্যে বক্তৃতা শেষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

সংগীত-জলসা নয়—উচ্চাঙ্গ সংগীত-সম্মেলন। এই রসলোকে প্রবেশের বিলাস ও অভিলাষ দুই-ই ছিল। শুভাদৃষ্ট, হঠাৎ দুর্লভ চাবিকাঠিটি হাতে এসে গেল। 'সুরেশ, তোমার জন্য এখানা।' একখানা টিকিট দিলেন অতুলদা। তার দাক্ষিণ্য জীবনে এই প্রথম—বড় বড় গুণী সংগীত-সাধকদের একাসনে দেখবার ও গান শোনবার সৌভাগ্য।

অতুলদা ত এ সুরলোকের নিত্য যাত্রী। একদিন ত সাজসজ্জা দেখে চিনতেই পারি না। পরিধানে সেরওয়ানী, চুড়িদার পাঞ্জাবি, মাথায় নকশাদার টুপি—খাঁটি এদেশীয়। নিখুঁত উচ্চারণ, নির্ভুল ভাষা। কথা বলছেন একজনের সঙ্গে চোস্ত উর্দুতে।

সংগীত-সম্মেলন শেষ হল, কিন্তু শেষ হল না গানের ঘরোয়া আসর। তবে এসব আসরে নবাব-ঘরানার প্রভাব ছিল না। বাংলা গানের সুরধুনী বইতে লাগল গোমতীর তীর ঘেঁষে।

মাতিয়ে তুললেন মন্টুদা ও ঝুনুদি। দিলীপকুমার মন্টুদা, সাহানা দেবী ঝুনুদি। এঁদের মধুবর্ষী কণ্ঠে অতুলপ্রসাদের গানের সুর-মূর্ছনার বেশ লখনৌর আকাশে-বাতাসে রণন তুলতে লাগল।

১

দেবভাষায় একটা শ্লোক আছে 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধিভবতি তাদৃশী।' আমার সাহিত্য-ভাবনায় এই চলতি কথাটি আংশিক সত্য। আংশিক বলছি এইজন্য যে সিদ্ধির লক্ষ্যে পৌঁছতে কত দুর্গম গিরি প্রান্তর অতিক্রম করতে হবে—সেটা তো অনিশ্চয়তার তিমিরে।

অতুলপ্রসাদ অগ্রণী হলেন, মন্দির প্রতিষ্ঠাও হল। মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য ঋত্বিকের আসনখানিতে বসবার দায়িত্বটি আমার হাতে তুলে দিলেন অতুলপ্রসাদ। অথবা দায়িত্বটি অলক্ষিতে আমার উপর এসে পড়ল।

'উত্তরা'-র জন্মলগ্ন-আসরের রূপ-পরিবর্তনের নূতন গর্ভাঙ্ক।

পূর্বপক্ষ: 'অতুলদা কয়েক সংখ্যা 'উত্তরা' বার হল—'এ বনেতে বনমালী' গানটি ছাড়া আর একটি গানও তো লিখলেন না। এ সংখ্যার জন্য নতুন গান দিতেই হবে।' 'কমলদা, কই আপনার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ? প্রেসের দোষ দেব কি? এবারও দেখছি, বাগজ বেরোতে দেরী হবে। অসিতদার আঁকা একখানা চমৎকার ছবি পাওয়া গেছে, ব্লক করতে এলাহাবাদে পাঠিয়ে দিয়েছি। 'ধূর্জটিদা, বাঃ বেশ মানুষ। এই দেব, এই দিচ্ছি। আপনার লেখা পাবার আশা এ-মাসে ছেড়েই দিলাম।' 'কুমুদদা, ইণ্ডিয়ান প্রেস তো মোটা মোটা ক'খানা বিল পাঠিয়েছে। কিছু টাকা পাঠাতে হবে যে।'

উত্তরপক্ষ: 'নতুন গান লিখব কখন? এই তো একটা কেসে কালই আবার বাইরে যেতে হচ্ছে। স্বরলিপি-সহ একখানি পুরনো গান দেব। সাহানার স্বরলিপি নয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংগীতে যিনি আমার কিছু গানের স্বরলিপি করেছেন।' 'বুঝলে ধূর্জটি, একটা প্রবন্ধে হাত দিয়েছি।' 'দিলীপের লেখা পেয়েছ ত? ওকে লেখার জন্য তাগাদা দিয়ে যাও।' 'তোমার কাজকর্ম ভালই চলছে, কি বল। গ্রাহক বাড়ল কিছু?'

'না, না', আমার লেখা দু-একদিনের মধ্যেই পেয়ে যাবে। নলিনী গুপ্তর প্রবন্ধ ও কিরণধনের কবিতা তো তোমায় দিয়েই দিয়েছি। কেদারবাবুর লেখার কি হল? গোপীনাথ কবিরাজ মশায়ের 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন' এখন চলবে তো? বেশ মূল্যবান লেখা হে। ওঁকে ছাড়া হবে না।' 'বলেছিলে না, বিজ্ঞাপন সংগ্রহের জন্য কলকাতা যাবে। কবে যাচ্ছ?' 'এ মাসটায়

আমায় বাদ দাও ভাই, পরের সংখ্যায় নিশ্চয় লিখব। আমরা ত আছিই। তোমার ত অনেক সাহিত্যিক বন্ধু। লেখো না তাঁদের।' 'হ্যাঁ, এবার 'উত্তরা'য় মহেন্দ্র রায়ের 'তরুণ কবি প্রেমেন্দ্র' বেশ ভাল প্রবন্ধ। 'বুঝলেন অতুলদা, আমাদের কাগজের এর মধ্যেই বেশ নাম হয়েছে।' 'প্রেসের বিলগুলি নিয়ে আমার বাড়িতে একবার এস না। দেখে শুনে একখানা চেক লিখে দেওয়া যাবে।'

১৩২৬ এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে কানপুরে সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশন। নায়কত্ব স্বীকার করে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আসছেন কানপুরে। বাংলার সাহিত্য-গগনের নির্মল আকাশে তখন দুই জ্যোতিষ্ক। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের দর্শন বহুজনের। কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরিত শরৎচন্দ্রের প্রতি-মূর্তিটির সঙ্গেও অপরিচয় অনেকের। তিনি প্রকাশ্য সভা-সমিতি বা সম্মেলনে যোগদানে সততই অনিচ্ছুক এটা রটনা ছিল সর্বত্র। স্বভাবতই তাঁর আগমন-সংবাদ চাঞ্চল্যকর। এ-সময় আমি কাশীতে। পত্রিকা-সূত্রে মাসে মাসে না হক কাশীতে আসতে হত প্রায়ই। কর্মাধ্যক্ষকে তাগিদ দিয়ে বর্তমান সংখ্যাখানি প্রেস করলযুক্ত করে সোজাসুজি সম্মেলনে যোগ দেব এই ছিল বাসনা।

দাদামশায়ের সঙ্গে দেখা হতে প্রথম কথা: 'কি মুস্কিল হল বলত?' 'মুস্কিল! কেন, কি ব্যাপার?' জিজ্ঞাসার উত্তরে একখানা পত্র আমার হাতে দিয়ে বললেন: 'এই দেখ।' ডা সুরেন্দ্রনাথ সেনের পত্র। কানপুরে সম্মেলন অথচ প্রথম পুরুষ কেদারনাথ অনাগত, ডা' সেন সেটা স্বীকার করতে গররাজী। লিখেছেন 'আপনাকে আসতেই হবে।' একটু রসিকতা করে যোগ করেছেন আরও এক লাইন—'বাহনের অভাব হবে না, সুরেশ ভায়াই ত রয়েছেন।' পত্রখানি পড়ে হেসে: 'এই আপনার মুস্কিল। চলুন দাদামশায়, শরৎবাবু আসছেন, দেখাটা হয়ে যাবে। অতুলপ্রসাদ, ধূর্জটিপ্রসাদ, ড. রাধাকুমুদ, কমলবাবুরাও আসবেন, আলাপ-পরিচয়ে আনন্দ পাবেন। ভারতবর্ষে 'কোষ্ঠীর ফল' পড়ে এখন আপনার নাম লোকের মুখে মুখে। ধূর্জটিদা বৈঠকী রসিক মানুষ, আপনাকে পেলে ছাড়তেই চাইবেন না।' একটু থেমে কানপুরে আপনার গুণমুগ্ধ তো অনেক। তাঁরা আপনাকে যেমন ভালবাসেন, তেমনি শ্রদ্ধাও করেন। না গেলে ডা' সেন সত্যি দুঃখ পাবেন দাদামশায়।'

দাদামশায়কে রাজী করাতে বেগ পেতে হয়নি। কারণ তাঁর মনেও ইচ্ছেটা চুপিসাড়ে কাজ করছিল।

লখনৌ থেকে দলে ভারী হয়ে কানপুরে উপস্থিত হলেন অনেকে। লখনৌ থেকে কানপুর কতটুকুই বা পথ। এ পাড়া, ও পাড়া বলা অতিরঞ্জিত হবে না।

আমাদের জন্য প্রতিনিধি-নিবাস। সম্মেলনের কর্তাদের দৃষ্টিকোণে অতুলপ্রসাদ সেন ব্যক্তি নন, ব্যক্তিবিশেষ। তাঁর বসবাসের জন্য সুবন্দোবস্ত করা হয়েছিল অন্যত্র। কিন্তু সে সুখ-সুবিধা সবিনয়ে অস্বীকার করে তিনি বলে উঠলেন: 'না, না, তা হয় না। আমি সকলের সঙ্গে প্রতিনিধি-আবাসে থাকব।'

সম্মেলনের পূর্ব-পরিচিত মুখই তো দেখছি। তথাপি দু' একটি মুখের 'হারিয়ে যেতে নাই মানা।' ভিড়ের মধ্যে নতুন মুখও উঁকি দিচ্ছে।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রথম এ-সম্মেলনে সকলের সঙ্গে মিলিত হলেন। অতুলপ্রসাদ প্রমুখ সম্মেলন-প্রধানদের সঙ্গে একাত্মতা প্রথম দর্শনেই।

অধিবেশনের মহাক্ষণে কর্তৃপক্ষ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। শরৎচন্দ্র আসবেন না। সম্মেলন সম্পাদকের ভাষ্য—অসুস্থতা নিবন্ধন। অতএব প্রত্যক্ষ সুপাত্রটিকে সভাপতি-পদে বরণ করে মাল্যদান করা হল।

আচম্বিতে এভাবে সভাপতি-পদে বৃত অতুলপ্রসাদ বিভ্রান্ত হলেও অসম্মতি প্রকাশ করতে পারলেন না। প্রাণপ্রতিম এ-প্রতিষ্ঠানের গঠনভিত্তির প্রথম কর্ণিক-স্পর্শ তো তাঁরই।

সভাপতির ভাষণ নয়। স্বল্প দুটি কথা। একটু মনে পড়ছে। যেন বলেছিলেন ভরতের উপমা দিয়ে। 'রামের অবর্তমানে সিংহাসনে তাঁর পাদুকা স্থাপন করে ভরত যেভাবে রাজ্য পরিচালন করেছিলেন, শরৎচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে এ সভায় আমারও ঐ ভূমিকা।' এটুকু বলেই, অভিভাষণের বিনিময়ে 'ভারত ভানু কোথা লুকালে' দরদভরা কণ্ঠে গানের অর্ঘ্য দিয়ে সকলের চিত্তজয় করলেন। সভা নিস্তরঙ্গ। শুধু গানের একটি স্তবক দর্শকমনে ঘুরে-ফিরে যেন প্রশ্ন করে চলেছে:

'আছে অযোধ্যা, কোথা সে রাঘব ?
আছে কুরুক্ষেত্র, কোথা সে পাণ্ডব ?
আছে নৈরঞ্জনা, কোথা সে মুক্তি ?
আছে নবদ্বীপ, কোথা সে ভক্তি ?
আছে তপোবন, কোথা সে তপোধন ?
কোথা সে কালা কালিন্দী কূলে ?

কিন্তু সম্মেলনের পক্ষান্তরও আছে। কাজের কথার চুলচেরা-বিচারে অংশ নিয়ে 'উত্তরা'র জন্মকথা শুনিয়ে বললাম—'পত্রিকার শিশুত্ব চলছে, পোষণের জন্য চাই অর্থ। লখনৌ সম্মেলনের প্রতিশ্রুত অর্থ আশানুরূপ কোষাধ্যক্ষের ভাণ্ডারে জমা পড়েনি। চেষ্টা করেও আমরা অসম্পূর্ণ। এখন সম্মেলন কথাটা ভাবুন।' একটু আলোড়ন তুলে তরঙ্গভঙ্গ।

সভামঞ্চে এ দু'টি দিন অধিকাংশ সময় স্থাণুর মত উপবিষ্ট অতুলপ্রসাদ। প্রবন্ধপাঠ শুনেছেন, আলোচনার অংশভাগী হয়েছেন। সভাপতির রায় স্বাধীন। দু'পক্ষেই সন্তোষ।

বয়সে প্রৌঢ় কিন্তু প্রাণচাঞ্চল্যে যুবজনের দৃষ্টান্ত। পংক্তিভোজন সমাপ্ত করে দিনমানে সভা, রাত্রের মধ্যযাম পর্যন্ত প্রতিনিধি-মণ্ডপে গানের মজলিস। বিরামহীন গান আর গান। এ যেন গানের তরী ভাসিয়ে দিয়ে—গান গেয়ে যা, গান গেয়ে যা আজীবন। শ্রোতারা তাঁকে পেয়ে ধন্য। সম্মেলনে আসা তাঁদের সার্থক।

কানপুর সম্মেলন শেষে গ্রীষ্মাবকাশের দিনগুলি অতিবাহিত করতে অতুলপ্রসাদ বাঙ্গালোর যান। পত্রের শরবর্ষণ সেখানেও।

'গান ত লিখবেনই, প্রবন্ধ লিখতে হবে। ভ্রমণ-কাহিনী লিখুন না—এত বেড়াচ্ছেন যত্রতত্র।'

উত্তরও পাই। অতুলদা চিঠি লিখলেন বাঙ্গালোর থেকে। বিদেশে গিয়েও বার্তা পাঠিয়েছেন আমাকে। গ্রাহক সংগ্রহ করেছেন। গান লিখেছেন। মনের ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন—এবার ধারাবাহিক কিছু লিখবেন। যতটুকু সাধ্যমত আমাদের সাহিত্য-যজ্ঞে সমিধ আহরণে সচেষ্ট। পত্রখানি তো এই কথাই বলে।

Cloncllcy
Sumpegay Tank Road
Bangalore. 9.7.26

স্নেহাস্পদেষু,

সুরেশ, তোমার পত্র দুখানাই যথাসময়ে পাইয়াছি। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের 'উত্তরা'ও পাইয়াছি। তোমার উদ্যোগ ও পরিশ্রমের উপরই 'উত্তরা'র ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করে। আশা করি এতাবৎকাল 'উত্তরা'র উন্নতিকল্পে যেরূপ যত্ন করিয়াছ তাহা অক্ষুন্ন থাকিবে।

এখানে দু একজন গ্রাহকের জোগাড় করিয়াছি; দু একদিনের মধ্যেই তাহাদের নাম পাঠাইব; তাহাদিগকে 'উত্তরা' পাঠাইয়া দিও।

তোমার অনুরোধ মত একটি গান পাঠাইতেছি; কথাতেই বুঝিতে পারিবে সেটি ইদানিং লেখা। 'উত্তরা'র জন্য আরও কিছু সংগ্রহ করিয়াছি। সেগুলি এখনও লেখনীতে আসে নাই, তবে সরঞ্জাম মজুদ। এবার ধারাবাহিক কিছু লিখিতে চেষ্টা করিব। দক্ষিণ ভারতে অনেক দেশে ঘুড়িয়াছি।

আমি ২২শে জুলাই লক্ষ্ণৌ ফিরিব।

আশা করি তোমরা সকলে কুশলে আছ।

শুভাকাঙ্খী

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

পত্রের বর্ণাশুদ্ধি নিয়ে কত-না রঙ্গ করতাম অতুলদার সঙ্গে। ব ও ড়-এ সমান প্রীতিবিশিষ্ট অতুলপ্রসাদ হাসতেন। 'এবার দেখছি বর্ণ-পরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগটা পড়িয়ে ছাড়বে তোমরা।'

১০

এক বছরের জীবনেই 'উত্তরা' সমালোচনার নিকষে নির্বিকল্প সাহিত্য-পত্রিকার শিরোপা পেয়েছে। 'উত্তরা'র আভিজাত্য আছে, অহংকার নেই। সাহিত্যমার্গের সার্থকনামা প্রবীণ ও প্রতিশ্রুতিবান নবীন কথা-সাহিত্যিক কবি প্রবন্ধকার 'উত্তরা'র আমন্ত্রণ স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রতিষ্ঠিত পাঠাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সমূহে 'উত্তরা'র স্বাকৃতি। বহু পরিবারিক সংগ্রহে 'উত্তরা'র সমাদর। বিজ্ঞাপনের বাণিজ্যলক্ষ্মীও অপেক্ষাকৃত সদয়।

অপরন্ত 'উত্তরা'র প্রতিটি সংখ্যার জন্য মূল্যবান আইভরি কাগজ, আর্টপেপারে ত্রিবর্ণের প্রচ্ছদপট, বহুবর্ণের চিত্র। প্রবন্ধ বা ভ্রমণ-কাহিনীর জন্য ফটোচিত্র। উচ্চহারে মুদ্রণ-মাশুল। অনুক্ত অন্যান্য ফিরিস্তি।

এখন আয়-ব্যয়ের সংগতিশূন্য দর-কষাকষি। দুর্মনায়মান চিত্তে অতুলদার 'হেমন্ত-নিবাসে।' 'সুরেশ যে, এস, এস। খবর বল। দেখ, 'উত্তরা' দেখছি কতকটা অনিয়মিত হয়ে পড়ছে।' 'হ্যাঁ। প্রেস কাজে একটু ঢিল দিয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁরা হিসেব দাখিল করে এক পত্রে এ-ও জানিয়েছেন,

তাঁদের পাওনা টাকা অবিলম্বে শোধ করে না দিলে পত্রিকা-ছাপানো বন্ধ করে দেবেন।'

অতুলদা উদ্বিগ্ন হলেন, বললেন: 'রাধাকুমুদবাবুকে সব জানিয়েছ? কি বলেন তিনি?' 'তাঁর উত্তর 'উত্তরা'র ফাণ্ডে টাকা কোথায়? কথা ত অনেকে রাখলেন না, যা টাকা পাওয়া গিয়েছিল, যেমন তোমরা বলেছ, চেক কেটে দিয়েছি।'

অতুলদা গম্ভীর হয়ে পড়লেন। আবহাওয়া'টা আদৌ সুখকর নয়।

'উত্তরা'র গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনের আয় থেকে মাঝে মাঝে প্রেসকে 'পেমেণ্ট' করা হয়েছে। প্রতিমাসে কাগজপত্র কেনাকাটা, অফিস পরিপোষণ—সেও মোটা টাকার খরচ। এখুনি 'উত্তরা' স্বয়ম্ভব হবে এতটা আশা করতে পারি না। অঙ্গীকৃত টাকাগুলি সব পাওয়া গেলে পরিস্থিতি এতটা অসহ্য হত না।'

অতুলদা নিঃশব্দে আমার কথা শুনে গেলেন। 'তুমি ভেবেছ কিছু এ-সম্বন্ধে?' অতঃপর প্রশ্ন। 'এখন শ' পাঁচেক টাকা পাঠিয়ে দিলে মুখরক্ষা হয়। বছর ত শেষ হয়ে এল। নতুন বছরের 'উত্তরা'র গ্রাহকের টাকাগুলি এসে পড়বে। বিজ্ঞাপনের বিলও কিছু অনাদায়ী। এতটা টানাটানি থাকবে না।' আমার আশ্বাসূচক কণ্ঠস্বর। দ্বিরুক্তি করলেন না অতুলপ্রসাদ। পাঁচশত টাকার একখানি চেক লিখে আমার হাতে তুলে দিলেন।

কিন্তু শেষ এখানেই নয়। অশনি-সম্পাতের প্রথম সংকেত।

'উত্তরা'র এই ত' সবে উঠতি জীবন। মাত্র হাঁটি-হাঁটি, পা-পা। এরই মধ্যে তার প্রাণশক্তি অর্থনৈতিক পীড়নে থরথর।

ইণ্ডিয়ান প্রেসের কর্মকর্তা এবার একটি পূর্ণাঙ্গ হিসাব পাঠিয়ে তাঁদের প্রাপ্য দু'হাজার তিনশত টাকা দাবী করে বসলেন। আংশিক নয়, পুরো টাকাটা না পেলে পত্রিকা আর প্রকাশ করবেন না। শুধু কথাটা জানিয়েই নিরস্ত হননি, প্রেসে 'উত্তরা'র কাজও বন্ধ রাখেন। এ ত' সমস্যা নয়—সংকট। সমস্যা নিরাকরণের নানা পথ। কিন্তু অর্থঘটিত সংকটের নিরসন-সূত্র একমাত্র ঐ অর্থ।

এই ত' সেদিন অতুলদা পাঁচশো টাকা দিলেন। আর যে কেউ উদারহস্ত হবেন, সে সম্ভাবনার ছোট একটু আলোকরেখাও যে দৃষ্টিবহির্ভূত। 'সম্মেলন তো ফতোয়া দিয়ে দায়মুক্ত। কর তোমরা পত্রিকা-প্রকাশ। গা ঢাকা দিতে তার কতক্ষণ।' পত্রিকাখানি যে যৌথ উদ্যোগের ফলশ্রুতি এ চেতনাও যেন আজ সকল মহলে অনুপস্থিত। প্রতি সংখ্যা কাগজখানি হাতে নিয়ে—'বাঃ, বেশ হয়েছে এ সংখ্যাখানি'। এর বেশি ভারাক্রান্ত হতে কেউ চান না।

একমাত্র সৃষ্টিছাড়া অতুলপ্রসাদ। অতুলদা ইণ্ডিয়ান প্রেসকে দ্বিতীয়বার পাঁচশত টাকার একখানি চেক পাঠিয়ে 'উত্তরা'র কাজ যাতে ব্যাহত না হয়, অনুরোধ করে পত্রও লেখেন।

তখনকার মত প্রেস একটু চুপচাপ। তিরোভাবের প্রতিবন্ধ থেকে আপাতত 'উত্তরা'র উত্তরণ।

কিন্তু 'উত্তরা' ত' মুমূর্ষু। এত টাকা ঋণ।

পরিচালন-সমিতির সভ্য-সুজনদের সচেতন করতে ও 'উত্তরা'র ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা অবধারণের জন্য আহ্বান করা হল এক আলোচনা-সভা সেন মহাশয়ের বাসভবনে।

যথানিয়মে আলোচ্য-সূচি-সম্বলিত পত্র পাঠান হল সদস্যবৃন্দ সকাশে। ঘরে-বাইরের সভ্যরা কেউ এলেন, কেউ বা পত্র লিখেই নিঝঞ্ঝাট। 'উত্তরা'র ঘট-স্থাপনার উৎসাহমুখর আসর নয়। নিরুৎসব ম্রিয়মাণ কক্ষে কয়েকটি মানুষের নির্বিকার উপস্থিতি।

উপস্থিত তর্কিত-বিষয় 'উত্তরা'র হিসাব-পত্র। এখানে বিনয় দাশগুপ্ত আগুয়ান। লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের হেড অব দি ডিপার্টমেণ্ট অব কমার্স। তন্ন তন্ন করে প্রতিটি 'ডেবিট-ক্রেডিট' মিলাতে গিয়ে আশ্চর্য। প্রেসই শুধু টাকা পায় না, পায় সুরেশও। নিয়োগ-পত্রে তাকে যে-টাকাটা মাসে মাসে দেবার উল্লেখ ছিল খতিয়ানে তা অনুদ্দিষ্ট।

পরামর্শ তো হিং টিং ছট্। কথার ফুলকি গরময়। সকলের ভাবখানা—'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন,—এস্থলে অতুল সেন।'

'উত্তরা'র অনাদায়ী বিলগুলির স্বত্ব নিয়ে প্রেস তৎপর হয়ে উঠল।

কর্তৃপক্ষ এবার আমায় পাশ কাটিয়ে সেন মহাশয় বরাবরেষু। প্রেসের অধিনায়ক হরিকেশব ঘোষ মহাশয় পত্র লিখলেন নিজস্ব এমবসকরা সুমুদ্রিত লেটার-প্যাডে :

22nd April 27

Dear Mr. Sen

I am sorry to bring to your attention that our letter regarding payments of Uttara bill has not so far been replied to.

I hope you will please see that payment be made immediately so that we may not be inconvenienced.

Yours sincerely.
H. K. Ghose

A. P. Sen Esq.
Lucknow.

পত্রের ভাষা প্রাঞ্জল কিন্তু তাগাদা-সমৃদ্ধ।

বিব্রত অতুলপ্রসাদ। বিব্রত আমিও। এই পত্রের মর্যাদা-মূল্য না পাঠালে পত্রিকা-মুদ্রণ আবার স্থগিত।

এলাহাবাদ। ইণ্ডিয়ান প্রেস। হৃষিকেশববাবুর খাস-কামরা।

'এই যে সুরেশবাবু! এলেন তাহলে। আমাদের যে অনেক টাকা পাওনা। কত টাকা এখন দিচ্ছেন?' প্রথম আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হলেও কুশল প্রশ্নের অন্তরালে একটু স্থিতধী হবার প্রয়াস।

প্রধান বক্তব্যের উপক্রমণিকাতেই হৃষিকেশববাবুর ঈষৎ উত্তেজিত প্রতিবাদ। 'না, না, সমস্ত বিলের 'পেমেণ্ট' না হ'লে 'উত্তরা'র কাজে আর হাত দেব না।' বলতে যাচ্ছিলাম—'আসছে সম্মেলনে…' কথার আগডালেই আমায় নিবৃত্ত করে সজোরে: 'আমরা আপনাদের ওই সম্মেলন জানি না। আমরা জানি মি. সেনকে।'

'উত্তরা'র সংস্রবে মাঝে-মাঝে আমার এলাহাবাদ আসা এবং কার্যব্যপদেশে হৃষিকেশববাবুর কাশী আগমন এ দুটি ঘটনাক্রম নিষ্ফলা নয়। সুভদ্র, সুপুরুষ, কর্মবীর ভদ্রলোকটির গুণমুগ্ধ হতে কালবিলম্ব হয় নি। আমার সাহিত্য-প্রীতি ও কর্মনিষ্ঠায় সম্ভবত তিনিও অন্তরিক সহানুভূতিশীল। দুর্বলতা একটু ছিল বৈ কি!

বাতিল একেবারে হলাম না। 'বেশ, এখন হাজার টাকা দিন। দুই। প্রতি সংখ্যার 'উত্তরা'র ছাপানোর টাকা অগ্রিম দিতে হবে। শেষ কথা। শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়কে এক পত্র দিতে হবে এই মর্মে—যে-টাকা বাকী রইল তার জন্য তিনি দায়ী।'

দৌত্যের ফলাফল পরিবেশন করলাম অতুলপ্রসাদকে।

যুক্তপ্রদেশের মধ্যমণি লখনৌ অতুলপ্রসাদের কর্ম-সাধনার আস্তপীঠ।

তাঁর ইউনিভারসিটি আছে, মিউনিসিপ্যালিটি আছে। মিশন আছে, দরগা আছে। রাজনৈতিক তৎপরতা আছে, আছে কোর্ট-কাচারি-বার-এসোসিয়েশন। দানের বহর আছে, গানের আসব আছে। আতিথেয়তা আছে, আছে সামাজিকতা। শরীর আছে, শৌখিনতা আছে। সর্বোপরি আছে সম্মান, আছে প্রতিপত্তি।

নেই কি? নেই স্বাস্থ্য। এখন সেই সদা-প্রচলিত প্রবাদটির মত 'বোঝার ওপর শাকের আঁটি।' আমি 'উত্তরা'র কথা বলছি।

এই পঞ্চাশ অতিক্রান্ত প্রাণময় পুরুষটি প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সূচনা থেকেই এর শীর্ষস্থানে। এই সদ্য অঙ্কুরিত প্রতিষ্ঠানটি প্রবাসী বাঙালির নব জাগরণের দিশারী হবে এ-ভাবশুদ্ধি তাঁর ছিল।

প্রতিষ্ঠান একক সংগঠন নয়। বহুজনের মিলিত উপক্রমের ভাব-রূপ। সেই ভাব-রূপ-সমুদ্রোত্থিতা 'উত্তরা'। এক হাতে সাহিত্যের আলোকবর্তিকা, অন্যহাতে আশ্বাসের কবভঙ্গী। কিন্তু আশ্বাস তো ছত্রভঙ্গ।

পরিচালন-সমিতির বৈঠকের পুনরাবর্তন। 'এক হাজার টাকা, মুদ্রণের অগ্রিম দাদন, সেন মহাশয়ের ব্যক্তিগত প্রতিজ্ঞাপত্র।' উত্ত্যক্ত অতুলপ্রসাদ। চাপা বিরক্তি ওষ্ঠপ্রান্তে। 'আমি এ টাকার জন্য দায়ী হতে পারি না। 'উত্তরা' সম্মেলনের কাগজ, দায়িত্ব সম্মেলনের।'

বিক্ষুব্ধ আলোচনার ঘনঘোর। অন্যদের মতে: 'কাগজ বন্ধ করে দেওয়া হক এবং সকল গ্রাহককে জানান দিয়ে নোটিশ পাঠান হোক।'

বললাম: 'প্রবাসী বাঙালিরা নয় আমাদের সংকট বুঝলেন কিন্তু তাঁরা ছাড়াও তো অনেক গ্রাহক আছেন। একন, বাংলাদেশ। 'উত্তরা'র দ্বিতীয় বর্ষের এই তো কয়েক মাস। মোটে তো তিনটি সংখ্যা বেরিয়েছে। পরের ক'মাস কাগজ না পেলে এঁরা আমাদের সম্বন্ধে কি ভাববেন?' এ প্রশ্নের জবাব পেলাম না।

'তারপর প্রেস?' 'আসছে সম্মেলনে এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা হবে।' 'প্রেস তাতে রাজী নয়। তাঁরা টাকাটা আদায় করবেন আমাদের কাছ থেকেই।'

সেন সাহেবের স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান। 'আমি তো অনেক টাকা দিয়েছি, অন্যরা এবার যা হয় করুন।'

হোমরাচোমরা অনেকেই তো সভাসীন। বাক্‌স্ফূর্তি নেই কোন কণ্ঠে।

অনুমানে বুঝলাম—কেউ আর এ নিয়ে শিরঃপীড়া ঘটাতে প্রস্তুত নন। 'উত্তরা'র অন্তিম-বাসরের বন্ধুরা উশখুস করতে লাগলেন।

আলোচনার গতি-প্রকৃতির অন্তর্বর্তী সময়-সীমার ধাপে ধাপে একটা দুঃসাহসিক প্রতিজ্ঞা ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয়ে উঠছিল মনের অন্তঃপুরে। এবার তার প্রকাশ্য বিস্ফোরণ। 'উত্তরা'কে বাঁচিয়ে রাখবার একটা সুযোগ দিন আপনারা। অন্তত বাকী ন-মাস কাগজখানার পরিচালনার ভার দিন আমাকে।'

সকলের বিস্ময়-চকিত দৃষ্টিতে বিদ্ধ হলাম। ততক্ষণে আত্মপ্রত্যয়ে আমার সংকল্প আরও দৃঢ়। তৈরী হল একখানা সর্তকণ্টকিত খসড়াপত্র। সম্মেলনের স্বার্থ, সম্পাদকদ্বয়ের ভূমিকা যথাযথ। সর্তের কোনো কোনো ধারায় মৃগতৃষ্ণিকার অনেক ছলনা। মূল হেরফের অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্বে। সেই চুক্তিনামায় সম্মেলনের প্রতিভূরূপে স্বাক্ষর দান করলেন সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ। অর্থাৎ অতুলপ্রসাদ, ড. রাধাকমল ও ড. রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়রা।

নিজের সম্বন্ধে মূল্যায়নটা একটু বেহিসেবী হয়ে থাকবে। অথচ আমার আবাল্য তপস্যা প্রবাস থেকে একখানা উচ্চকোটীর সাহিত্য-পত্রিকার অভ্যুত্থান। সাহিত্য-সাধনার কৃচ্ছ্রতায় দু-দুবার যত্নবান হয়েও ব্যর্থকাম।

ব্যর্থতার তিমিরান্ধকার ভেদ করে আশার আলোকচ্ছটা আবার ঝলমল। সম্মেলন সহায় হলেন, সহায় হলেন অতুলপ্রসাদ। 'উত্তরা'কে মনের মত সাজিয়ে, বঙ্গবাণীর চরণে অর্ঘ্য ডালি দিয়ে এই ত' পুনশ্চরণের প্রথম পদক্ষেপ। এখনই ভূলুণ্ঠিত হব!

অতুলদার অবসর সময়টুকু আমার চিহ্নিত। প্রাতঃকাল। অতুলদার পরিধানে ঢিলা পায়জামা ও পাঞ্জাবি। একখানি ছোট কাঁচি হাতে নিয়ে তিনি গুনগুন করে আপন মনে একটি গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে উদ্যানের ফুলগাছ-গুলির শুকনো, শীর্ণ ডালপালার সম্মার্জন করছিলেন। আমায় দেখে চিরাচরিত সহাস্য সম্ভাষণ। আমার অধরে শুষ্ক হাসি।

'চল, চা খাবে।' চায়ের টেবিলে চা খেতে খেতে কেবল একতরফা কথার আত্মনিবেদন। 'অতুলদা' কাগজখানি বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। 'উত্তরা' আপনার মানসকন্যা। অনেক তো করেছেন। সময় দিয়েছেন, অর্থ দিয়েছেন। আরও কিছু করুন। আমায় পাঁচশো টাকা দিন এই শেষবারের মত। বাকী পাঁচশো-র যোগাড় করে নেবো। অন্য সব ঝক্কি তো সাধ করেই নিয়েছি।'

অতুলদা'র তুষ্ণীভাব। আমার মনে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব। ফিরে এলাম নিজস্ব কোটরটিতে। দুশ্চিন্তার বিষবাষ্পে সমস্ত মন সমাচ্ছন্ন। মনশ্চক্ষুতে ভেসে উঠল প্রতি মাসে দেয় মুদ্রণদক্ষিণা, নগদ সহস্র মুদ্রার সংগতি, উদবৃত্ত টাকার স্বীকারনামা।

কিন্তু আমায় নিরাশ করেন নি অতুলপ্রসাদ। 'সাহেব এখানা আপনাকে পাঠিয়েছেন।' অতুলদার খাস মুনশিজী দেখা করতে এসে আমার হাতে একখানি বন্ধ খাম দিলেন।

খামখানি উন্মুক্ত করতেই দেখি শুধু পত্রই নয়, আরও কিছু। আমার প্রার্থনা-পূরণ। তবে চিঠিখানির প্রতি ছত্রে ক্ষোভিত মনের বহিঃপ্রকাশ।

H. mantanibas
Charbagh
Lucknow
1 5 27

প্রিয় সুরেশ,

'উত্তরা'র জন্য আমাকে খুব ক্ষতিগ্রস্থ হতে হচ্ছে, যদি জানিতাম আমার উপরেই সমস্ত দায়ীত্ব ফেলবে তাহলে এ কাজে হস্তক্ষেপ করতাম না। যাহা হউক আমি আর একখানা ৫০০ টাকার Chequc Indian Pressএর নামে দিচ্ছি—যদিও এর জন্য আমি নিজে দায়ী নই। তুমি এ চেকখানা দেবে না যদি Indian Pr ss আমাকে তাদের টাকার জন্য personally দায়ী করতে চান। আমি Indian Pressকেও একখানি চিঠি দিলাম। ভবিষ্যতে তুমি যে সাও কাগজখানি আগামী আশ্বিন পর্য্যন্ত চালাইতে প্রতিশ্রুত হয়েছ ঠিক সেরূপভাবে কাজ করিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

পুঃ সবশুদ্ধ আমি উত্তরার জন্য প্রায় ১৫০০ টাকা দিলাম।

'উত্তরা'র পালা-বদলের নতুন সর্গ।
আয়-ব্যয়ের ছাঁট-কাটের সামঞ্জস্য চাই, চাই নিজের আসন।
লখনৌ থেকে 'উত্তরা অফিস' স্থানান্তরিত বারাণসীতে।

সম্পাদকীয় দপ্তর ?

না, ওটি আপাতদৃষ্টিতে লখনৌতে সম্পাদক মহাশয়দের হেফাজতে।

সর্তনামা মান্য করেই এ সংবিধান।

প্রেস ?

হ্যাঁ, 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' অতটা নয়।

বাগ্‌বাদিনী এখানে অধিষ্ঠিত লেখনীতে নয়, রসনায়। এরই সুপারিশে সওয়াল-জবাবের কৃত্যটুকু সাফল্যের সঙ্গে পবিশুদ্ধ।

সংশয়-দোলায় দুল্‌তে দুল্‌তে প্রেসের সর্বেশ্বর ঘোষ মহাশয়ের আত্মসমর্পণ: 'তবে তাই হোক।'

'উত্তরা'র পট-পরিবর্তন হলেও অতুলদার হৃদয়-পরিবর্তন হয়নি। স্নেহে, আশ্বাসে, শুভেচ্ছায় বারবার দায়গ্রস্ত।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকটা তো বাংলা সাহিত্যের 'পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা'র যুগ। সেই যুগের পত্রিকা 'উত্তরা'। সাহিত্যের নব কলেবরে অনেক অস্বীকার, অনেক অসন্তোষ, অনেক বিদ্রোহ-বহ্নি। সেই বিদ্রোহ বহ্নির আঁচ 'উত্তরা'র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। আমৃত্যু 'উত্তরা'র শিরোদেশে 'সম্পাদক' অভিজ্ঞানটি বহন করে অনেক উত্তাপ সহ্য করেছেন অতুলপ্রসাদ।

এ আশির দশকে সে-সব কথা ও কাহিনী তো স্মরণাতীত। সাধ্য-সাধনায়, মন্ত্র-উচ্চারণে অতীতকে আবাহন করতে হবে:

> কথা কও, কথা কও।
> কোনো কথা কভু হারাওনি তুমি, সব তুমি তুলে লও—
> কথা কও, কথা কও।
> মানবজীবনের যত পাতায় অদৃশ্য লিপি দিয়া
> পিতৃপিতামহদের কাহিনী লিখিছ মজ্জায় মিশাইয়া।
> যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
> তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
> বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী স্তম্ভিত হয়ে বও।
> ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতীত, কথা কও, কথা কও।

স্তবে তুষ্ট 'অতীত' যদি কখনো মুখর হয়, কথা কয়, তবে শ্রাবকের অবিদ্যমানতায় তাকে স্তব্ধ হতে হবে না।

ক বি অ তু ল প্র সা দ

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শুনেছি নিজের কবিতার সম্বন্ধে অতুলপ্রসাদের বিশেষ কুণ্ঠা ছিল। প্রতিভাবান গায়কদের কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরছে তাঁর গান, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর গুণমুগ্ধ, সেই সহস্ররশ্মি সম্ভাবনার পাশেও নতুন স্বমহিম একটি বৈচিত্র্য জেগে উঠেছে তাঁর রচনায়, এবং তা শব্দবিক্ত বিমূর্তিরও বৈচিত্র্য নয় কারণ রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ সামনে ঐ পশ্চাদ্‌গতি বা অতিপ্রগতি ঐতিহাসিকভাবেই দুঃসাধ্য ছিল। শুনেছি সেই অমুদ্রিত-অধ্যায়ে অতুলপ্রসাদের কোনো কোনো গান অনেকেরই ভুল হয়েছে রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে। তবু 'কয়েকটি গান' পাঠ্য রূপে প্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথেরই সনির্বন্ধ প্রণোদনা প্রয়োজন হয়েছিল, সেই সঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদের উৎসাহ। তার পরেও লেখকের অলিখিত আবেদন যেন পড়া যায় সেই প্রথম সংস্করণে—গান যে কবিতা নয়, গান যে গানই; পড়বার নয় শুধু শোনবার—ছাপার শৈলি দিয়ে যতটা পারা যায় লেখক যেন তা বলতে চেয়েছেন। 'গীতিগুঞ্জে'র আধুনিক সংস্করণের পাশে মিলিয়ে পড়লে গীতপরিচয়প্রয়াসী এই ছাপার বিশেষত্বটুকু চোখে পড়ে। একটু নমুনা উদ্ধৃত করি

১ দীনের দুঃখ কর হে মোচন—দীনের অভাব নাই এ দেশে,

—দীনের দলেও ধনী তোমরা;

—দীনবন্ধু হবেন সখা;

দীনের দুঃখ কর হে মোচন—পুণ্য হবে ধন অর্জনে।…

এ আঁধার ঘুচাতে হবে—নইলে এ দেশ এমনি রবে।

—দানেই এ জ্ঞান দ্বিগুণ হবে;

—এরাও তোমার মায়ের ছেলে;

এ আঁধার ঘুচাতে হবে—যতনে, অতি যতনে।…..

সেই দেশেব ছেলে তোমরা—যেথা বাজাব ছেলে হত ফকির!

—যেথা পরের তবে ঝবত আঁখি!

—যেথা ধন হতে প্রেম ছিল বড়!

—যেথা ধনী ছিল দীনেব অধীন!

সেই দেশের মানুষ তোমবা—সে কথা কি আছে মনে?……

সবাকাব মান হোক তব মান, অপমান পব লাজে।

(সে দিন কবে বা হবে?)

জাতিকুল-অভিমান, দ্বেষ-নিন্দা-ভেদজ্ঞান, ভাবতে আনিল মবণ!

(ভাই হে);

কবে হবে এ সুমতি, সবাব উন্নতি হইবে সবাকি সাধন।

(হেন সাধন আব নাই হে।)..

মোরা পূজিব তোমায়—সেবাব কুসুম কুড়াইয়া;

—নিজেব পূজা ঘুচাইয়া;

—পবেব দুঃখ ঘুচাইয়া;

—ভাবতেব আশা পুবাইয়া।

—প্রথম সংস্কবণ।

দীনেব দুঃখ কব হে মোচন, দীনেব অভাব নাই এ দেশে।

দীনেব ধনেই ধনী হে মোবা দীনবন্ধু হবেন সুখী।

দীনেব দুঃখ কব হে মোচন, পুণ্য হবে ধন-অর্জনে।...

এ আঁধাব ঘুচাতে হবে— নইলে এ দেশ এমনি ববে।

দানেই এ জ্ঞান দ্বিগুণ হবে — এবাও তোমাব মায়েব ছেলে।

এ আঁধাব ঘুচাতে হবে যতনে, অতি যতনে।...

সেই দেশেব মানুষ তোমবা—

যেথা বাজাব ছেলে হত ফকিব, যেথা পবেব তবে ঝবত আঁখি;

যেথা ধন হতে প্রেম ছিল বড়ো, যেথা ধনী ছিল দীনেব অধীন।

সেই দেশেব মানুষ তোমবা— সে কথা কি আছে মনে?……

সবাকাব মান হোক তব মান, অপমান পব-লাজে।—

সে দিন কবে বা হবে?

জাতিকুল-অভিমান, দ্বেষ-নিন্দা-ভেদজ্ঞান,

ভাবতে আনিল মবণ—ভাই হে।

কবে হবে এ সুমতি, সবাব উন্নতি হইবে সবাসই সাধন—

হেন সাধন আব নাই হে।……

মোরা পূজিব তোমায়
সেবার কুসুম কুড়াইয়া, নিজের পূজা ঘুচাইয়া,
পরের দুঃখ ঘুচাইয়া, ভারতের আশা পূরাইয়া।

—পরবর্তী সংস্করণ।

২ ভেবেছিনু নাই বা এলে, (ওহে ভবনদীর মাঝি!)
যাব চলে আপন পালে
অবহেলে।
এখন মাঝ-গাঙেতে টুটল দাঁড়, ভাঙা নায়ে উঠল বারি।
(হে কাণ্ডারি! ভাঙা নায়ে উঠল বারি)
(আমি দেখি নাই কে ভাঙা নায়ে উঠল বারি)

আজি এই বিপদকালে, (ওহে কাল-খেয়ার মাঝি!)
এস তুমি আমার হালে,
আমার পালে।
তোমার টানের জোরে নূতন গানে— আমি শুধু গাইব সারি।
(হে কাণ্ডারি! আমি শুধু গাইব সারি)
(তুমি নাও চালাবে, আমি শুধু গাইব সারি)
(ডাকি ঢেউয়ের পানে অ[illegible]নে গাইব সারি)

—প্রথম সংস্করণ

ভেবেছিনু নাই-বা এলে
ওহে ভবনদীর মাঝি,
যাব চলে আপন পালে
অবহেলে।
এখন মাঝ-গাঙেতে টুটল দাঁড়ি,
ভাঙা নায়ে উঠল বারি।
হে কাণ্ডারি,
ভাঙা নায়ে উঠল বারি!
আমি দেখি নাই কে,
ভাঙা নায়ে উঠল বারি

আজি এই বিপদকালে
ওহে কাল-খেয়ার মাঝি,
এসো তুমি আমার হালে
আমার পালে।

তোমার টানের তানে নূতন গানে
আমি শুধু গাইব সারি।
হে কাণ্ডারি,
আমি শুধু গাইব সারি।
তুমি নাও চালাবে,
আমি শুধু গাইব সারি।
চাহি ঢেউয়ের পানে
অভয় প্রাণে গাইব সারি।
—পরবর্তী সংস্করণ।

৩ উঠ গো ভারত-লক্ষ্মি।.....

(সকলে) জননি গো, লহ তুলে বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে ;
কাঁদিছে তব চরণতলে
ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো।
—প্রথম সংস্করণ।

উঠগো ভারত-লক্ষ্মী, উঠ আদি-জগত-জন-পূজ্যা,......

জননী গো, লহো তুলে বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহো তুলে চক্ষে ;
কাঁদিছে তব চরণতলে
বিংশতি কোটি নরনারী গো।
—পরবর্তী সংস্করণ।

পংক্তি সাজানোর কৌশলে, বন্ধনী-চিহ্ন বসিয়ে, অথবা যৌথ কণ্ঠের সমবায় নির্দেশ করে যে কুললক্ষণটুকু প্রত্যক্ষ করে তোলার যত্ন ছিল সঙ্গতভাবেই সেই বাহুল্য পরে মুছে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঐ বিন্যাস বা বন্ধনীর ঈষৎ বাহুল্যের মধ্যে ধরা ছিল না কি রচয়িতার কুণ্ঠা? যেন নিতান্তই দ্বিধায়, প্রত্যেকটি লেখায় ব্যক্তিপরিচয়ের বদলে রাগ-তালের শিরোনাম, আবার সেগুলি দেবতা প্রকৃতি স্বদেশ মানব ইত্যাদি গুচ্ছে গুচ্ছে পর্যায়বদ্ধ যেমন তোড়া-বাঁধার প্রথা একালের কবিতাসঙ্কলনের, তারই মধ্যে আবার 'ছয় রাগ ও ছয় ঋতু'র রূপবর্ণনা —ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নয়, তা রাধামোহন সেনেরই অনুসারী।

তরুণবয়সে যাঁরা তাঁকে জানতেন, জানতেন কবিপরিচয়ে। ভারতী পত্রিকায়

কবিতা লিখেছিলেন একদা। তাঁর প্রথম লেখা বলে প্রসিদ্ধ পুরোনো ঢঙের লঘু ত্রিপদীতে লেখা

তোমারি উদ্যানে তোমারি যতনে
উঠিল কুসুম ফুটিয়া।
এ নব কলিকা হউক সুরভি
তোমার সৌরভ লুটিয়া।

—ইত্যাদি পংক্তিতে কবিশিক্ষার পরিচয় আছে। যে স্বদেশী গানগুলির জন্য তাঁর প্রথম দিকের জনপ্রিয়তা, গানের চেয়ে কবিতাংশেই যেন তারা দপ্ততর। 'বলো বলো বলো সবে, শত-বীণা-বেণু রবে' 'হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর' 'আ মরি বাংলা ভাষা'—এই সব রচনা কেবলমাত্র ভাবনায় ঋদ্ধ নয়, অচ্যুত পদবন্ধে বাঁধা।

তবু পরিণত দিনে দরবারী গানের ঐতিহ্য-ভরা এক পশ্চিমা শহরে অতুলপ্রসাদের নতুন উন্মেষ ঘটেছিল। তাঁর এক আত্মীয়া লিখেছেন—'লখনৌ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-চর্চার জন্য বিখ্যাত। সেখানে গিয়া তাহার সঙ্গীত-চর্চার বিশেষ সুযোগ ঘটিল এবং তাহার অন্তরের সঙ্গীত নানাভাবে ও নানা ছন্দে নব নব সুরে উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল।' ঐ দূর লখনৌ ছেড়েই একদিন বাঙলায় নির্বাসিত হয়ে এসেছিলেন নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ, সঙ্গে এসেছিল তাঁর নিত্যসহচর হিন্দুস্থানী গানের এক পুরোনো ঘরানা। এখানে তার সাদর স্বাগতের অভাবও ছিল না, তবু স্বপ্রভাবেই সে আসন করে নিয়েছিল এখানে। আর বাঙলাদেশের কবিতার্দ্র মাটির থেকে অতদূরে রাগসঙ্গীতের সেই নিজস্ব রাজধানীতে বসে তাঁর আমন্ত্রণ মাথা পেতে নিয়ে একজন প্রবাসী কবির পুরোনো কাব্যপ্রত্যয় যদি কিছু টলে গিয়ে থাকে, যদি সুর-ছাড়া কথাগুলিকে শুধু তার নিজের মূল্যে ততখানি স্বমহিম ভাবতে কিছু সংশয় এসে থাকে, তা খুব অস্বাভাবিক নয়। সমসাময়িক অগ্রজদের মধ্যে, অন্তত রজনীকান্তের তুলনায় তাঁর নিজের গানের উপর হয়তো তিনি বেশিই প্রত্যয়ী হতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেই [illegible] ই, রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলালের মতো তিনি যে সার্বাক্ষণের কবিতাব্রতী হতে পারেন নি সেই সঙ্কোচ বোধ করি তাঁকে তাঁর গানের কবিতার সম্বন্ধে তারও বেশি বিনীত করে তুলেছিল।

২

উত্তরভারতীয় মার্গসঙ্গীতের প্রাণস্পন্দন ছুঁয়ে অনুভব করতে পেরেছিলেন অতুলপ্রসাদ। সুরগ্রস্ত হয়ে পড়তেন, কখনো সেই নিরালম্ব সুরকে বাঁধতে বসতেন ভাষার ভূমিতে। তাঁর প্রবাসের অন্তরঙ্গজনেরা অনেকেই সবিস্তারে বলেছেন তাঁর ব্যস্ত হয়ে পড়ার বিবরণ, তাঁর সুর থেকে গানে নেমে দাঁড়ানোর বিশেষ পদ্ধতির কথা। নিছক গায়ন-সিদ্ধির দিকে নিশ্চয় তাঁর ঝোঁক ছিল না, হয়তো প্রত্যন্তবর্তী নিজের আঞ্চলিক ভাষাটিতে ঐ সঙ্গীতের বিশেষত্বগুলি প্রবর্তিত করে নেবার উৎসাহ ছিল তাঁর। কালের দূরত্ব যতটাই থাক, নিধুবাবুর দৃষ্টান্ত থেকে কতই বা এর অন্তর। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে জানিয়েছেন, নিধুবাবু 'শিক্ষাদান বিষয়ে শিক্ষকের কার্পণ্য জানিতে পারিয়া মিয়া সাহেবকে সেলাম করিয়া কহিলেন 'আমি তোমারদিগের জাতীয় যাবনিক গীত আর গান করিব না, আপনিই বঙ্গভাষায় হিন্দি গীতের অনুবাদ পূর্বক রাগ রাগিণী সংযুক্ত করিয়া গান করিব" ততখানি অবিকল অনুবাদ ঠিক নিধুবাবুও করেন নি—কথা তো নয়ই, বোধ করি সুরও নয়। তাঁর গাওয়া বা শেখা গীতগুলির তুলনায় নিধুবাবু নিঃসন্দেহেই বড় কবি, শোরী মিঞার থেকে নিধুবাবুর টপ্পাও কিছুটা স্বতন্ত্র। একটা সময় ছিল যখন রবীন্দ্রনাথও তো হিন্দুস্থানী সুরের ছকে কথা বসিয়েছেন, হিন্দী ভেঙে কথাও এনেছেন বাঙলা করে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের গান সব সময়েই রবীন্দ্রনাথেরই গান। তথাপি রবীন্দ্রনাথের গান নিজের শক্তি সঞ্চয় করেছে হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের থেকে, এবং ধূর্জটিপ্রসাদের ভাষায়, রবীন্দ্রসঙ্গীতও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতেরই অঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা-সূত্রে দিলীপকুমার রায় একদা বলেছিলেন, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের, সম্পূর্ণ না হোক, অনেকখানি সৌন্দর্যই যে বাঙলা গানে আমদানি করা সম্ভব, এবং শুধু সম্ভব নয় সেটা যে হবেই, অতুলপ্রসাদ সেনের গান শুনে সে কথা তাঁর আরো বেশি করে মনে হয়েছে। দিলীপকুমারের প্রধানত বলবার ছিল সুরবিহার বা তানবিস্তারের প্রসঙ্গ। কিন্তু সুরেন্দ্র মজুমদারের মতো শিল্পীর কণ্ঠ-সৌকর্য সত্ত্বেও তাতে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন খুব একটা আসেনি। হয়তো অতুলপ্রসাদও ঠিক অতখানি সুরবিহার তাঁর গানের উপযোগী বলে মানতে পারেন নি বলেই দিলীপকুমারের কণ্ঠের

অমন ইন্দ্রজাল দেখেও তাঁর ঈষৎ অস্বস্তির কথা মুখ ফুটে বলেছিলেন। অতুলপ্রসাদের গানের সৌন্দর্যও শান্ত অপ্রগল্‌ভ কণ্ঠে বেশি ফুটে ওঠে, যদিও অলঙ্কারের অবকাশ সেখানে অনেকখানি। শুধু ভিতরের কবিতাটিকে তিল তিল করে উদ্‌ঘাটিত করে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথের গান যেভাবে নিয়োজিত, অতখানি কবিতা তাঁর আছে কি না, হতে পারে সেই সংশয়ে অতুলপ্রসাদ স্বরসঙ্গীতের আরো সন্নিহিত। তবু কবিতাটিকে অমান্য করবার উপায়ও তাঁর ছিল না। তাঁর নিজের গাওয়া সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এইরকম—'গান গাইবার সময়ে প্রত্যেক কথাকে অবসর দিতেন। বাক্যের সঙ্গে তার সম্বন্ধটি উপলব্ধি হত। নীরবতার আশ্রয়ে গানটি মিলিয়ে যেত, যেন মায়ের কোলে ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে।'

আসলে, হয়তো কাল-নির্বন্ধেই, অতুলপ্রসাদের বাসনা ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রবণতার সঙ্গে একইরকম। দুজনেই চেয়েছিলেন বাঙলা গানের দিগন্তকে প্রসারিত করে তোলার স্বার্থে তাকে উত্তর ভারতীয় রাগসঙ্গীতের বাঁধা সড়কে এনে তুলতে। সিদ্ধি যতটাই তাঁরা লাভ করুন, শুরু এর আরো খানিকটা আগে। দুজনেই তাঁদের আরো কোনো কোনো পূর্বসূরির মতো হিন্দুস্থানী গানের রীতনীত ঢুকিয়ে এনেছেন বাঙলা গানে, আইন লঙ্ঘন করে নতুন আদল দিয়েছেন তার, তাতে মিশিয়েছেন দিশি মাটির রস, সর্বোপরি তার তলায় বিছিয়ে দিয়েছেন বহুদিনকার যা বাঙলা গানের বিশেষত্ব—সেই কাব্যকথার স্বর্ণ উপল। সবগুলিই তাঁরা আগের তুলনায় করেছেন অনেক ভালোভাবে, হয়তো শেষটি করেছেন অতুলনীয়ভাবে। 'গীতাঞ্জলি'র মরমি লেখাগুলিও যে সুনির্ধারিত রাগ-তাল আশ্রয়ী, আবার স্পষ্ট রাগানুগ গানের মধ্যেও যে অতুলপ্রসাদ বলতে চেয়েছেন সুনির্ধারিত আত্মবেদনা—তাতেই বোঝা যায় একই কাললগ্নের ব্রতচারী দুজনে। শুধু একজন অন্যজনের ঈষৎ অনুযাত্রী। রবীন্দ্রনাথের উপর অচলা ভক্তি ছিল অতুলপ্রসাদের। এবং মনে হয় স্থূল কারণ ছিল তার। রবীন্দ্রনাথের পথ তাঁরও পথ-নির্ধারণ করে দিয়েছিল। যাঁরা দুজনকেই জানতেন প্রত্যক্ষভাবে তাঁদের অনেকেরই অভিযোগ শুনি, অতুলপ্রসাদের গানগুলিও আজকাল কেন গাওয়া হচ্ছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ঢঙে। খানিকটা অনভিনিবেশ, খানিকটা গায়কের সরলীকরণ তো বটেই, তবু মনে হয় এই ভবিতব্যের একটু বীজকণা ছিল অতুলপ্রসাদের গানেই। তাঁর নিজের কালে স্বকীয়তাটুকু জীবন্ত রেখেছিলেন তিনি দরবারী স্বরশিল্পের অনেকখানি শরণাগতি

গ্রহণ করে। সম্ভবত তাইতেই, সঙ্গীতরসজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেছেন,, মার্গসঙ্গীত শুনে যে কান তৈরী সেই কানে অতুলপ্রসাদের গান রবীন্দ্রনাথের চেয়েও ভালো লাগবে। তাইতেই, বাঙলায় যাকে বলে রাগপ্রধান গানের ধারা, সেই ধারার প্রথম সার্থক স্রষ্টা অতুলপ্রসাদ। শুনেছি 'রাগপ্রধান' নামটিও তাঁরই পরিকল্পিত।

তবু নিজেকে সুররচয়িতার বেশিই নিশ্চয় তিনি জেনেছিলেন। শুধু গানই যদি তাঁর আশ্রয় হতো, কথা তো অনায়াসেই তিনি নিতে পারতেন খ্যাতিমান কবিদের লেখা থেকে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কি সাড়া দিতেন না তাঁর ইচ্ছায়?—এমন কি ফরমায়েসে? তাঁর সামনেই দিলীপকুমার তা নিয়েছেন—দ্বিজেন্দ্রলাল অতুলপ্রসাদ কাজী নজরুলের গান গেয়েছেন, নিজের সুরে অন্য কবির কবিতাও গেয়েছেন। অন্য কবির কবিতা নিয়ে সুররচনা করার দৃষ্টান্ত আছে রবীন্দ্রনাথেও। দ্রষ্টব্য: শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী প্রণীত 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসঙ্গম' বইয়ের তেরো থেকে ষোল পৃষ্ঠা।

এদেশে প্রথাটি যতই অনভ্যস্ত হোক, সেই বিদেশীদের মধ্যে বহু-আচরিত আধুনিক বাঙালি গীতিকারেরা যাঁদের জানতেন অপরোক্ষভাবে। রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল অতুলপ্রসাদ সবাই বাইরে গিয়ে সেই সব আধুনিক সুরস্রষ্টাদের রচনার সাক্ষাৎ সন্ধান নিয়েছেন। 'য়ুরোপের দেশবিশ্রুত সঙ্গীতশিল্পী গ্লুক'-এর গান বা 'ওড' গুলির কথা ছিল কবি ক্লপস্টকের। শুবার্ট নির্ভর করেছিলেন গ্যেটের কবিতার উপর। হাইনের বিয়াল্লিশটি কবিতা গানে ব্যক্ত করেছিলেন শুমান। আর সেগুলি হয়ে উঠেছিল তাঁদের নিজেদেরই অভিব্যক্তি, তাঁদের অন্তর্গত আত্মপ্রকাশের আলম্বন। দৃষ্টান্ত শুধু স্বজাতেই গণ্ডী দেওয়া নয়। বিলিতি গানের সুরটুকু শুধু নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, গোড়ার দিকে। দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙলায় তার কথাগুলি অবাধ তুলে নিয়েছিলেন অবিকল, এবং তারই উপর ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল স্বপ্রতিষ্ঠ দ্বিজেন্দ্র-গীতির সৌধ। পরানুকৃতি বা পরনির্ভরতার কথা নয় এ, কিংবা এটুকু পরকীয়তা সব স্রষ্টাকেই ভিতর থেকে সমর্থ করে তোলে। যে টমাস মূরের সুর গানে বসিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সেই টমাস মূরের কবিতা স্বরচিত সুরে বসিয়েছিলেন শুমান। শেলির একটি বিখ্যাত কবিতা লেখা হয়েছিল হিন্দুস্থানী গানের সুরে বসাবার আগ্রহে। অতুলপ্রসাদের একটি গানেও বোধহয় বসেছে ইতালীয় সুর।

অবশ্য অতুলপ্রসাদের অবসর ছিল না নিজেকে অমন বহুলভাবে গড়ে

তোলার। শিল্পকে দেবার মতো সময় তাঁর খুব বেশি ছিল না, তাঁর সতীর্থদের তুলনায় ছিল খুবই অকিঞ্চিৎকর।

তবু, অতুলপ্রসাদের খ্যাতি যে কারণেই হোক—বর্ণময়ভাবে রাগমিশ্রণের জন্য, বাঙলায় ঠুংরির চাল নিয়ে আসার জন্য, উর্দু গজলের অন্তরঙ্গ বিন্যাসটুকু বাঙলায় প্রবর্তনের জন্য, অথবা গানের মধ্যে টপ্পার রম্য করুণ তান স্বচ্ছন্দভাবে দুলিয়ে দেওয়ার জন্য—যে কারণেই হোক, তার চেয়ে প্রণিধানযোগ্য, বাঙলা গানের আধুনিক যুগান্তরের ইতিহাসস্বাক্ষরটুকু তাঁর গানেও আছে—বহুলভাবে না থাকলেও পূর্ণ যত ভাবেই আছে। সেই যুগান্তরের সবচেয়ে দীপ্ত দিকটি মনে করি গানের অ-পূর্ব কবিতাশ্রয়িতা। সেই কবিতা যেমন সুর-আবৃত্তির অপরিহার্য পদপংক্তি নয়, তেমন ফরমায়েসী কবিপ্রসিদ্ধিরও গ্রন্থনা নয়। আমাদের পুরোনো কবিতাকল্প গানগুলির মতো ধর্মসম্প্রদায়ের ভজগীতি নয়, লীলাকীর্তন নয়। রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল রজনীকান্ত অতুলপ্রসাদ—যাঁর কথাই বলি, তাঁদের নিষ্ঠিত ভক্তিমূলক গানগুলিও মূলত তা নয়। আসলে আধুনিক যুগান্তরের পর্বে যে সব আকৃতি ছিল বহতা কবিতার, সেই একই বাসনায় সে বিদ্ধ হয়েছিল, সেই গানের কবিতা। বিদেশে আধুনিক সুরকারেরা সবাই ছিলেন কবিপ্রাণ, সমকালীন কবিতার সঙ্গে তাঁরা সরাসরি যোগস্থাপন করেছিলেন, অন্তত কণ্ঠসঙ্গীতকে তাঁরা সেই কাব্যমূল্যে অধিষ্ঠিত করতে যত্ন নিয়েছিলেন। কবিতার অন্তঃসত্তাকে গানে প্রকাশ করতে ব্রতী হয়েছিলেন। গানের সেই অভিপ্রায়ের কথা একলা রবীন্দ্রনাথ শতমুখে আমাদের শুনিয়েছেন। আমাদের যেটুকু বিশেষত্ব তা হলো তৎসত্ত্বেও গানের পরোয়ানার বাইরে বেরোয়নি আমাদের গান। আমাদের আধুনিক প্রসিদ্ধ গীতিকারেরা সবাই সাহিত্যসেবী। তার ফলে তাঁদের গান যদি কেবল গায়কের মনোযোগ পেয়ে থাকে, অন্য রচনাগুলির জন্য তাঁরা লাভ করেছেন গভীরতর পর্যবেক্ষণ। দুর্ভাগ্য, অতুলপ্রসাদের রচনার সবটুকুই রয়ে গেছে গায়কের স্বরলিপিতে। তাঁর গানগুলির কাব্যমীমাংসা কখনো হয়নি। অথচ, যতই রাগানুগ হোক, শুধু স্বরচর্চা নয় তাঁর গান। বরং সঙ্গীতাতিরেকী স্পৃশ্য কিছুকে ধরে রাখতে সে উন্মুখ। দেশ কাল বা ব্যক্তি—গান কারও পাঞ্জা বয় না। কিন্তু কবিতা যত শুদ্ধ শাশ্বতই হোক, তার গায়ে লেগে থাকে একটি ঐতিহাসিক সময়ের ছাপ, একটি ব্যক্তিমানুষের দুঃখসুখ। অতুলপ্রসাদের গানে সেই কবিতা খুব অস্পষ্ট নয়।

•

আবার বলি, এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি উজ্জ্বল অতুলপ্রসাদের গানে। তা না হলে গানের মধ্যে কেন দু-চোখ ভরা সুন্দর প্রকৃতির ছবি। কেন নিজের ব্যক্তিগত ছোট ছোট দুঃখ-ব্যর্থতার জ্বালা। সেই বারজগৎ তো পটের ছবিটিও নয়, কবির মনের আকুলতায় স্পন্দিত

> যাব না, যাব না, যাব না ঘরে,
> বাহির করেছে পাগল মোরে।
>
> বনের বিজনে মৃদুল বায়,
> ফুলে ফুলে ফুল বলে অমায়,
> 'ঘরের বাহিরে দুটিবি আয়
> পুলক-ভরে।'

অথবা অতি নিভৃত এই স্বগত কথা

> আমার বাগানে এত ফুল, তবু কেন
> চলে না যায়

এই একান্ত বেদনাটুকু তো কোনো পুরোনো গানে মিলবে না।

যাকে স্বদেশী গান বলি তাও একেবারে আধুনিক মুহূর্তের অবদান। 'উঠ গো ভারত-লক্ষ্মী, উঠ আদি-জগত-জন-পূজ্যা' 'বলো বলো বলো সবে, শত-বীণা-বেণু-রবে' 'হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর' 'মোদের গরব মোদের আশা' 'পরের শিকল ভাঙিস পরে, নিজের নিগড় ভাঙ রে ভাই'—অতুলপ্রসাদের এই সব গান এক সময়ে আমাদের জাতীয়তার অভিব্যক্তি হয়ে উঠেছিল।

দেবতা-পর্যায়ের গান লিখেছিলেন অতুলপ্রসাদ—হার্দ্য উদগত কয়েকটি গান, হয়তো তাঁর শ্রেষ্ঠ নির্ভর—কিন্তু আগেই বলেছি তা কোনো ভক্ত বৈষ্ণবের লেখা হতে পারতো না। তাঁর নির্ভরতা নিবেদন করেছেন হরি, দীনবন্ধু, জগবন্ধু, দর্পহারী মধুসূদন—পুরাণসিদ্ধ এই সব নামরূপের প্রতি, তেমনি বেদনা জানিয়েছেন শিবমহেশ্বর, শাক্ত জননীর পাদমূলে—কিন্তু সে জন্য বলছি না একথা। তাঁর সারাদিনের হরি সন্ধ্যাবেলা তাঁর জন্য জননীর কোল বাড়িয়ে বসেছেন, ঐ নির্দ্বন্দ্ব বিশ্বাসটুকুও এদেশের সুপরিচিত। রামপ্রসাদী মালসি লিখেছেন,

একই সাবলীলতায় লিখেছেন তদ্গত ভজন: 'ও নাম গাও মোর বীণ, গাও নিশিদিন, গাও হরিগুণগান'। এমন অন্তরঙ্গ বাউল লিখেছেন যে নিজেরই বাউল আখ্যা জুটেছে তাঁর। কেবল প্রাণবস্তুও নয়, নিপুণভাবে আয়ত্ত করেছেন কীর্তনের আঙ্গিক। সেই কীর্তনাশ্রয়ী গানও মহাজন-কৃত কীর্তন গান নয়। প্রভু, স্বামী, নাথ, অখিল নিরঞ্জন ব্রহ্মকেও তো জানিয়েছে বিনতি। তা যতখানি ব্রহ্মসঙ্গীত, তার চেয়ে কম অকপট ভজন-কীর্তন-মালসি-বাউল তাঁর নেই। কেবল প্রকরণ-চর্চাও নয় সেসব, সবই তা উৎসারিত একটি স্পষ্ট, মিশ্র ব্যক্তিত্বের থেকে, —যা নিতান্তই একালের বস্তু। মর্মের যে গভীর আঘাত এই সব গানে ফুটে উঠেছে তার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে আছে একজন নিরালম্ব আধুনিক মানুষের সহায় সন্ধানের বৃত্তান্ত, সনাতন বহু-পরীক্ষিত বিশ্বাসের দৃঢ় বেদির উপর উঠে দাঁড়াবার প্রয়াস।

প্রকরণের দিক দিয়ে দেখলেও, পুরোনো দেবতাদের উপর কিংবা বাউল-কীর্তন-আদি দিশি সুরের মাটিতে দাড়াবার এই তীব্র বাসনা, এর চেয়ে স্পষ্ট মুহূর্তাচার আর আছে কিনা সন্দেহ। ঐতিহ্যের গভীর তলার থেকে জীবন টেনে উজ্জীবিত হয়ে ওঠার যত্ন আধুনিক শিল্পকবিতার ইতিহাসের সবচেয়ে উজ্জ্বল ঘটনা। জাতির জীবনোৎসব খুব কাছাকাছি হলো লোকসঙ্গীত। অনিশ্চিত যুগান্তরের পর সাম্প্রতিক কবিতা ও গান তার কাছ থেকে যতখানি নির্ভরতা পেয়েছে, তার ক্ষীণাংশ অতুলপ্রসাদের রচনাতেও প্রতিফলিত।

তাঁর লেখার থেকে এই গানসংকলনগুলির পাঠোদ্ধার যদি তেমন না হয়ে থাকে তার জন্য দায়ী যোগ হয় কবিতা-পাঠকের সঙ্গে তার অগভীর পরিচয়। তার একটি কারণ নিশ্চয় তার লেখার নীতি রীতি। আরো একটি কারণ হয়তো তার লেখার স্বল্পতা। 'কয়েকটি গান' বেরিয়েছিল একশো সাতচল্লিশটি-মাত্র পদ নিয়ে, 'গীতিগুঞ্জ'র হাল সংস্করণের পদসংখ্যা দুশো চার। গান অবশ্যই ঘটনারিক্ত, শারীরিক ইতিহাসের ঠাই তাতে নেই। কয়েকটি শুধু স্থায়ী হৃদয়ভাব, নিসর্গের কয়েকটি অবিচলিত সংকেত, অথবা ভক্তিনিবেদনের কয়েকটি প্রথায়ত সূত্র—গানের বিষয় এর চেয়ে বিচিত্রগামী হওয়া কঠিন। তবু, পাশে চাইলে, তাই নিয়েই রবীন্দ্রসঙ্গীত সাগরতরঙ্গের মতো অপরিমেয়। সামান্য একটি গাছ বা মঞ্জরিকে নিয়ে, পুনরাবৃত্তিমন্থর দিনরাত্রির গমনাগমনের পিছু নিয়ে, কোনো একটি ঋতুর আসাযাওয়ার পথে দাঁড়িয়ে, হাজার ফুলের-পাপড়ির মতো ক্লান্তিহীনভাবে ফুটে উঠে ছড়িয়ে গেছে অজস্রোৎসারিত তাঁর

গান। তার পাশে 'গীতিগুঞ্জে'র সামান্য কথা কটি বড়োই অনুচ্চার। প্রকৃতি আর প্রিয়জন—নিজেকে আবিষ্কার করাব এই যে সহজ দুটি নির্ভর, নিজেকে ব্যক্ত করার সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ দুটি উপলক্ষ—যাদের নিয়ে কবির কথা ফুরোয় না, অতুলপ্রসাদের সংগ্রহেও তারা অনেকখানি সন্দেহ নেই, তবু কতটুকু! প্রকৃতির কথা বলি। অতুলপ্রসাদেব প্রকৃতিগীতি মিলছে মোট সতেরোটি। আকাশ-বন-নদী, বর্ষা-বসন্ত, সন্ধ্যা-প্রভাত—এরই মধ্যে আছে সব। পটের চেয়ে বেশি, জীবন্ত দৃশ্যের মতোই আছে। কিন্তু এত ছোট সেই দেশ। দু-পা না চলতেই পথ ফুরিয়ে আসে। আর সেই মুহূর্তেই পাঠকেব স্মৃতি মথিত করতে থাকে রবীন্দ্রনাথের সমাপ্তিহীন ঋতুচিত্রের গান। বনেব সবকটি গাছ পাট বলতে থাকে একে একে, জলেব সব কটি ঢেউ। এক চাঁদকে নিয়েই কত রকম রঙে, কত সুখে, কত বিচিত্র বেদনায় সাজিয়ে তোলা। তার পাশে 'গীতিগুঞ্জে'ব

সন্ধ্যাতারা জ্বলিছে গগনে—
আয় আয় চাঁদিয়া।

বা

চাঁদিয়া-রঞ্জিত জ্যোৎ-রজনী,
দূরে চমকিত পুলকিত তারা।

-এর চাঁদিয়া'—এই সরল সোহাগটুকু যেন মনে দাগ কাটে না।

অতুলপ্রসাদেব কবিতাব আরো একটি আপাতপরিচয় যে প্রসিদ্ধি পেয়েছে—তা এই সরলতা। তাঁর গানে যতই ভূষা থাক, কবিতা বড়োই সাদামাটা। আধুনিক পাঠকেব চোখে ধরতে যেটুকু রূপালঙ্কাব না হলেই নয়, তাও নেই। দৃষ্টান্ত তুলি বসন্তের কবিতা থেকেই, সহজাত রূপভূষা যে ঋতুর গায়ে

১ নব রূপ হেরি' আজি বিশ্ব বিমোহিত;
তরু নব পত্র ফুলে পুষ্পে বিশোভিত।

কুহরিছে পিককুল, মুকুলে নীপ অকুল,
নন্দিত জীবকুল হরষেতে ব্যাকুল।

সুরভি-অনিলে আজ মৃদুল পরশ,
হেরো বসন্ত পীত-বসন-পরিহিত।

২ আইল আজি বসন্ত মরি মরি,
কুসুমে রঞ্জিত কুঞ্জমঞ্জরী।

অলি আনন্দিত নাচে গুঞ্জরি,
পিক পুলকিত গাহে কুহরি।

নৃত্য করে কত বাল-বালিকা,
কণ্ঠে শোভে নব কুন্দ-মালিকা;
আনিছে সুন্দরী শূন্য গাগরি,
সুখে লহে প্রেমবারি ভরি ভরি।

দুটি লেখাই সরল, প্রথম-উনিশ-শতকী ঐতিহ্যে পরিবৃত্ত। প্রথমটি নিতান্তই স্তব, রূপবর্ণনার বেশি প্রত্যাশা করি না। দ্বিতীয়টিতে কবিপ্রসিদ্ধির বেশি যেটুকু কাব্যসৃষ্টি আছে, তা ঐ শূন্য গাগরি কাঁখে নিয়ে সুন্দরীর প্রেমবারি ভরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষীণ রূপকাভাসটুকু। ঐটুকু বাদ দিলে অল্পই তফাত নিধুবাবুর

আইল বসন্ত (সখিরে)
সঙ্গে লইয়ে আপন সকল সামন্ত।
একে একে শত, সৈন্যগণ যত,
কাহব হ কত দুরন্ত॥
দ্বিজরাজ, অলিরাজ, মলয়ানিলরূপে,
শশধর, বিষধর বৃক্ষ স্বরূপে,
ভ্রমর-গুঞ্জর হলাহল শর,
কুটিল কোকিল কৃতান্ত॥

এই পদের সঙ্গে। রবীন্দ্রস্মৃতি পরিহার করি, পাশে রাখি এই সহজ স্বাগত, দ্বিজেন্দ্রলালের

আয় রে বসন্ত, ও তোর কিরণমাখা পাখা তুলে
আমি শুধু দাঁড়াইয়া আছি নদীর উপকূলে

তারপর, তুচ্ছত্র বাদেই।
বর্ণময় একখণ্ড ছবি আর তার মধ্যে কবির মর্মরিত চলাফেরা মুহূর্তে আমাদের অধিকার করে ফেলে। 'জাগো বসন্ত'—এই অপরোক্ষ বসন্ত-আহ্বানের পদেও বসন্ত বোধ হয় এমন প্রভাবময় নয়।

কিন্তু এইখানেই থামলে আধখানা মাত্র বলা হবে। কাজেই আরো একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করি 'গীতিগুঞ্জে'র

ডাকে কোয়েলা বারে বারে,
'হা মোর কান্ত, কোথা তুমি হা রে';
চিত্ত-পিক চিতনাথে ফুকারে।

বাজিছে বংশী মন-বন-মাঝে,
এমন সময়ে সে কোথা বিরাজে ?
পুষ্পে পরিমল ফুলবঁধু যাচে,—
এসো বঁধুয়া নিভৃ[illegible] রে।

কবিতার ছন্দ নেই এখানে, গানের ভাষা আগাগোড়া। এর সূত্রের দাগটুকুও নিধুবাবুর এই পদ

বিরহ-বা[illegible], সখি রে, অতি বিষম হইল,
আইল বসন্ত।
কুসুম সৌরভ, রে বি[illegible],
সহে না [illegible] নিতান্ত।
[illegible]
ঘ্রাণ [illegible] মন্দ মলয়-পবনে,
[illegible] বসন্ত।।

তবু এক পলকেই বোঝা যায়, অতুলপ্রসাদের গানে জমেছে অনেকখানি দূরত্ব, বড় একটা পালাবদলের স্বাক্ষর। কাব্যভাষার হানি সত্ত্বেও, কেবলমাত্র ব্যঞ্জনার কিরণজালের উপর সমস্ত কবিতাটিকে স্থাপন করে যে লোকাতিগামী দ্যোতনা এখানে তৈরি হয়েছে তা প্রৌঢ় কবিতাশক্তির দান। সুরসাগর হিমাংশুকুমার দত্ত এই গানের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন। হয়তো কবিতা বলে কেউ কখনো পড়েন নি।

কবিতা-পাঠকের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের পরিচয় গাঢ় না হবার এইটিই বোধহয় বড় কারণ। এদেশে কবিতার গীতসম্বন্ধ যতই সনাতন হোক, কিংবা একালেও গানের কবিতাশ্রয়িতা যতই সুপ্রতিষ্ঠিত হোক, এমন কি—সাহস করে বলি, রবীন্দ্রনাথের পরেও, গানের কবিতাকে কবিতার চোখে দেখার রেওয়াজ খুব একটা গড়ে ওঠে নি। মহাজন-পদাবলিকে কীর্তনীয়ারা যে ভাবেই জানুন, একালে আমরা অধিকাংশই গোড়া থেকে তা পড়েছি কবিতা বলে। নিধুবাবুর কবিপরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কাল অতিক্রম করতে হয়েছে।

গান যেমন সঙ্গীতের তেমনই যে কবিতারও, অন্তত তথ্য হিসেবে তা আমাদের সুপরিচিত। এর দার্শনিক তাৎপর্যটুকু বাদ দিলে, ষোল-সতেরো শতকের বিলিতি কবিতার সংগ্রহগুলি থেকেই সুগম সংবাদ মিলতে পারে এ বিষয়ে, মূলত যা গানের বইয়ের পদসংকলন করেই তৈরি। আমাদের পুরোনো

কবিতার স্বরূপও আমাদের অজানা নয়। এক দিন গ্রন্থ গড়াগড়ি দিয়ে গানে ব্যস্ত হয়েছিলেন কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন। বোধ হয় সেই একই সময়ে আমাদের কবিতাও গানে জলাঞ্জলি দিয়ে বিশদ বক্তব্য বইবার শক্তি অর্জনে উৎসাহী হয়ে উঠেছিল। রামপ্রসাদ অথবা শ্রীধর কথকের লেখা থেকে ভক্তি বা রাগিনী মুছে নিলে আজ আর তেমন পাঠ্যতা হয়তো দিতে পারে না।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকেই আমাদের কবিতা ছেড়ে এসেছিল গানের কবিতাকে, কবিরা হয়ে উঠেছিলেন গীতনিস্পৃহ। আবার নিধুবাবু জুড়তে চেয়েছিলেন দুটিকে: নিজের কাব্যভাব দিয়ে গান বেঁধে, বিশুদ্ধ বাউল গান না করে, এমন কি স্বলিখিত একখানি মহাকাব্য বাগেশ্রী রাগিনীতে রজনী দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করে। সেই রোমান্টিক ইচ্ছার স্ফুলিঙ্গই উড়ে পড়েছিল রবীন্দ্রচিত্তে। কিন্তু ঐ বৃত্তের বাইরে তা ব্যাপ্ত হয়নি। প্রাক মধুসূদন থেকে উত্তর-রবীন্দ্র—এই দীর্ঘ সময় কবিরা গান বাঁধেন নি, আর যাঁরা গান বেঁধেছেন কবিতার তাঁরা বিশেষ কেউ নন। তারই ফলে গান-লিখিয়ে রবীন্দ্রনাথকেও আমরা পৃথক জনে জেনেছি আরো একটি পৃথক পরিচয়ে। তাঁর একশো প্রবণতার কবি-ব্যক্তিত্ব আবরিত পরিচয়ে। দ্বিজেন্দ্রলাল সনেট 'আমোর টেনে না মেনাতে' গানে মূর্ত করেছিলেন তাঁর বন্দ কামনা, আর রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর 'কড়ি ও কোমলে'র চতুর্দশপদী 'এ শুধু অলস মায়া, এ শুধু মেঘের খেলা' গানে বেঁধেছিলেন, গান আর কবিতার অর্ধনারীশ্বর রূপ তাতেও খুব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বলা চলে না। যদি সেই প্রধান্য তা পেত, সিন্ধু-কাফির সুরজাল ছিন্ন করে

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
নিজেরে লুকায়ে তুমি রেখো আবরণে।
পাইনি ধরিতে তোমায় শত আহরণে।

দস্যুবেশে এলে গৃহে ভাঙিয়া দুয়ার—
এবার পড়িলে ধরা হে বন্ধু আমার।

—অতুলপ্রসাদের এই অসংশয়িত চতুর্দশপদীটির কাব্যরূপ আমাদের কাছে প্রতিষ্ঠা পেত।

অথচ কবিতা আন্তরিকভাবেই আলীঢ় হয়ে চলেছিল গানের অঙ্কে। একদিন কবিসম্রাট ভারতচন্দ্রের সিদ্ধি পরিহার করতে হয়েছিল মধুসূদনকে—সময়ের দাবিতে। রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে যেতে হয়েছিল দুরূহনারই সুকীর্তিত প্রবণতা। বৈদগ্ধ্য বা বক্রোক্তি তো নয়ই, এমন কি কবিতায় যে ঠাঁই নেই স্থাপত্য বা উপচিত ওজস্ এরও, কবিতা প্রকৃতপ্রস্তাবে নেই শব্দেরও মধ্যে—আছে শব্দবণিত অগম সুরের মণ্ডলে, যত পিছুটানই থাক এই নিষ্পত্তি রবীন্দ্রনাথকেই করে যেতে হয়েছিল। শেলির লেখায় যে পক্ষবান শব্দের কথা আছে তার চেয়ে রোমান্টিকাতীত দ্যোতনায় তাঁর কবিতা অর্থবদ্ধ ভাষাকে পক্ষবান অশ্বরাজ-সম মানবের দেবপীঠস্থান ভাবের স্বাধীন স্বর্গে নিয়ে যেতে যাত্রা করেছিল। বিষ্ণু দে যখন লিখেছিলেন 'জানি সব সাধ শিল্প সব সাধনাই / সাধ্যের সন্ধান করে গানে গানে'—তাঁর স্মৃতিতে নিশ্চয় ছিল বিলিতি কলাবিপ্লবীদের কার্যকলাপ, ভের্লেনের 'আর্ং পোএতিক', প্রত্যক্ষত ছিল রবীন্দ্রনাথেরই দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথের পরে কবিরা সবাই কবিতাকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন গানের বিভূতি মাখিয়ে, যদিও আদত গানের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা ছিল না।

আসলে সেই বিনিময় তাঁদের মধ্যে ঘটেনি, যে-বিনিময়ের দৃষ্টান্তে তাঁরা সবাই উদ্বুদ্ধ ছিলেন। ওদেশে গানের রোমান্টিক-পর্ব শুরু হয়েছে গ্যেটের কবিতায় অনুপ্রাণিত হয়ে, কবিতাব সিম্বলিস্টদের যুগ শুরু হয়েছে হ্বাগনারকে কবিপ্রতিষ্ঠা দিয়ে। 'মনে হলো ঐ সঙ্গীত আমার নিজেরই উন্মোচন'—বোদলেয়র লিখেছিলেন রিচার্ড হ্বাগনারকে। তাঁর ভাষ্যে যতখানি অভ্যর্থিত হয়েছিলেন হ্বাগনার তার গুরুত্ব অ্যালান পো-র চেয়ে কম নয়। সিম্বলিস্টরা চেয়েছিলেন গান তুলে নিক মানুষের সবটুকু মনোভাব ভাষার মতো নিপুণভাবে, তারপর ব্যক্ত করুক সেই অনুভবের আত্যন্ত বিকিরণ ভাষায় যতটা কিছুতেই বলা যায় না। যে পার্সিফাল অপেরায় সুর ও সাহিত্যের সুপরিণয় ঘটেছে বলে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, তার মধ্যে অবিকন্তু তাঁরা দেখেছিলেন আধুনিক নিরাশ্রয় মানুষের নিয়তি। মালার্মে ও তাঁর সহযোগীরা মিলে হ্বাগনার-চর্চার রিভিয়ু পত্রিকা বের করেছিলেন, তাতে মালার্মের যে হ্বাগনার-বন্দনা প্রকাশিত হয়েছিল,

সেই সনেটের একটি কথা, : গ্রন্থ ও গানের মিলন ঘটিয়েছেন দেবতা হ্বাগনার—বেশ স্মরণীয়। শুধু যে একলা মালার্মেই কবিতায় সেই গীতদ্যুতি জ্বালাতে ব্রতী হয়েছিলেন তা নয়, সমগ্র সিম্বলিস্ট কবিতারই যা পরমার্থ—সেই 'ব্যঞ্জনা'-শব্দটি তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন সঙ্গীতের পরিভাষা থেকে।

মালার্মের সবচেয়ে কাছের বাঙালি আত্মীয় সুধীন্দ্রনাথ 'শ্রাব্য ঐকতানের অতিশ্রুতি ব্যঞ্জনা' মুদ্রিত করতে চেয়েছিলেন কবিতায়। যতখানি অনুভব থাকলে তা টের পাওয়া যায় তার চেয়ে গোচর ও কান্তিমান সুরের উপরেই স্থাপিত ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতা, তাঁর গানের কবিতা। অন্তত আর একটি গানে তাঁর গানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন অতুলপ্রসাদ : সারাদিনের সুখদুঃখের সাথী তাঁর সঙ্গীত, বাক্য যা বলতে পারেনা, তানে তানে বিস্তার করে সেই অন্তরটি সে ব্যক্ত করে। অর্থবদ্ধ বাক্যের কঠোর বন্ধন ছিন্ন করে জাগ্রত হয় তাঁর গান

যাহা বাক্য কহিতে নাহি জানে,
অন্তরে কত কহে তানে;
মুক্ত কর তুমি, ছিন্ন কর গানে,—
বন্ধন কঠিন কঠোর।

৪

অতুলপ্রসাদের সময়ে পুরোনো ঘরানাগুলির নিয়ন্ত্রণ হয়তো কমে এসেছিল। গানেও তৈরি হয়ে উঠেছিল আলাদা আলাদা স্ব-তন্ত্র প্রস্থান। অতুলপ্রসাদের গানের স্বাতন্ত্র্য অবিসংবাদিত, কবিতার অনন্যতা তার তুলনায় নিশ্চয় কম। আর তার জন্যও দায়ী করতে হয় রবীন্দ্রনাথকে। 'আসলে তাহার গানের পসরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গানের টুকরা দিয়া সাজানো।' সুকুমার সেন যে কটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, ঋণ তার চেয়েও নিশ্চয় বেশি। ঐ দৃষ্টান্তগুলির অনুসরণে আরো একটু সূত্র খোঁজা যেতে পারে। যেমন 'বলো সখী, মোরে বলো বলো, / কেন গো নয়ন ছলছল'—তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের 'ওকে বলো সখী, বলো, কেন মিছে করে ছল'। 'বিরহশয়নে ছিনু আঁখি ছলছলিয়া'—তুলনায় রবীন্দ্রনাথের 'তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি নয়ন ছলছলিয়া'। 'বঁধুয়া, নিদ নাহি আঁখিপাতে'—তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের 'আজি নাহি নাহি নিদ্রা আঁখিপাতে'। 'আজ আমার শূন্য ঘরে আসিল সুন্দর'—তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের 'সুন্দর

তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে'। 'হালে যখন আছেন হরি, তোর যেমন ফাগুন তেমনি আষাঢ়'—তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের 'হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পা'র'। রবীন্দ্রনাথের 'আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে, / আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো' এই ভাবনার একেবারে পাশ থেকে উঠেছে 'দীর্ণ মম বক্ষ যত, আঘাত যত খর, / শস্য সুফল তত, ততই শ্যাম মনোহর'— অথবা কঠিনে হৃদয় পিষে, নয়নের জল মিশে, যে চন্দন পেষিলি রে তুই' এই রূপক। কিন্তু এই খোঁজার খুব একটা অর্থও হয় না, যখন না খুঁজতেই জানা যায় বহুবার-বলা তাঁর গানের তরীটি রবীন্দ্রনাথেরই সেই সোনার তরী।

শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, পুরো ঐতিহ্যটিই তো আয়ত্ত করার যত্ন নিয়েছিলেন এই প্রবাসী কবি, সেই সব লেখাতেও যেটুকু স্বকৃতি তাঁর ফুটেছে তার মধ্যে অস্বীকৃত নয় রবীন্দ্রচ্ছায়া। যেমন 'এসো হে, এসো হে প্রাণে, প্রাণসখা'র গুরু দ্বিজেন্দ্রলাল-কৃত 'এস প্রাণসখা এস প্রাণে, এস দীর্ঘ বিরহ অবসানে', কিন্তু কবিতাটি স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রপ্রতিম হয়ে উঠেছে বলে। 'তাহারে ভুলিবে বলো কেমনে' এবং 'বলো গো সজনী কেমনে ভুলিব তোমায়?' যতন খাতেন বাড়ার —পদগুটির সাক্ষাৎ পিছনে নিধুবাবুর এই দুটি গান 'কেমনে বলো তারে ভুলিতে প্রাণ সঁপেছি যারে অতি যতনেতে' আর 'তারে ভুলিব কেমনে'। কিন্তু অতুলপ্রসাদের

> [illegible] বহে জল;
> সেথা [illegible] গগনে।

ভাষা-ছন্দের এই শিল্পের ভিতরে আরো যা স্পষ্টই জেগে ওঠে তা চিত্রা-র 'দিনশেষে' নামক কবিতাটির স্মৃতি। মদন বাউলের সঙ্গে রবীন্দ্রকণ্ঠ যুক্ত করে মূর্ত হয়েছেন তার 'নিঠুর দরদী'।

খুঁজলে এই তালিকাও বড় হবে। কিন্তু এই রাবীন্দ্রিকতার ফলে অতুলপ্রসাদের নিজস্ব স্থান কুণ্ঠিত হয়েছে মনে করা সঙ্গত নয়। রবীন্দ্রনাথের একবয়সী বা অনুযাত্রীদের মধ্যে এমন কে ছিলেন যিনি রবীন্দ্রপ্রভাব অস্বীকার করতে পেরেছেন সম্পূর্ণভাবে? সেটুকু সত্ত্বেও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বা বুদ্ধদেব বসুর স্বাতন্ত্র্যের যদি বাধা না ঘটে থাকে, বা তাদের রচনায় আমাদের মনোযোগ যদি খণ্ডিত না হয়ে থাকে, অতুলপ্রসাদেরও একটু দাবি আছে ইতিহাসের কাছে।

সেই প্রাপ্য কবির সমকালীনেরা যদি কেউ পর্যালোচনা করে দেখতেন,

তোর পায়ে পড়ি
তুই আমারে ছাড়িস নে গো।

—এই নিরাবৃত বিনতি এখন আর কিছুতেই মুখে আসে না, যেন সেই কারণেই আমাদের কাছে অসামান্য নস্টালজিয়ায়-ভরা।

কিন্তু এই বিশ্বাসটুকুর বিত্তেই আমাদের কাছ থেকে একটু দূর হয়ে গেছেন কবি। লোরকা-র কানথিয়োন-এ গাছটি নিজেকে নিস্ফল দেখার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চেয়েছিল অল্পিত এক কাঠুরিয়ার কাছে। অতুলপ্রসাদের গানটি বৃক্ষচ্ছেদ-চর্যার মতো উপাধি-বিয়োগের কৃচ্ছ্রে নিয়োজিত নয়, কিন্তু কবি জানেন স্বয়ং শ্রীহরি সেই শুকনো অমঞ্জরিত কাঠ তার শিকড়বাকল-সমেত উপড়ে নিয়ে রৌদ্র-জ্বালায় উত্তীর্ণ করে তা দিয়ে গড়ে নেবেন সুঠাম তরণী, মাঝ-নদীতে ভরাডুবি হলেও যার ভাঙা কাঠগুলি আবার পাবে তাঁর সৃজনস্পর্শ। যখন লিখেছেন দাবদহনের জ্বালা

বাহিরের উষ্ণ বায়ে মালা যে যায় শুকায়ে
নয়নের জল বুঝি তাও, বঁধু মোর, যায় ফুরায়ে।

তার পাশে যদি মনে পড়ে কবেকার রাজা লীয়ার

But I am bound
Upon a wheel of fire, that my own tears
Do scold like molten lead,

মনে হয় বংশানুক্রমী প্রত্যয় কেড়ে নিয়েছে আমাদের কবির দুঃখ-নিরাশার গভীরতা, যখন নিরাশায় ডুবছে তাঁর সর্বস্ব, লিখেছেন

আমারে এ আঁধারে
এমন করে চালায় কে গো?
আমি দেখতে নারি, ধরতে নারি,
বুঝতে নারি কিছুই যে গো।

—এত আঁধারেও সেই অতল কালো তাঁর মধ্যে মুদ্রিত হয় নি যা আমাদের আরো কাছের চরিত্র। তেমন despair তাঁর মধ্যে নেই, তার বদলে আছে বিষণ্ণ ব্যর্থতা—আশরীর রোমান্টিক বেদনা। কোনো নন্দনী শিল্পরেখা দিয়ে নয়,

কুসুম দু-দিনে শুকায়ে যায়,
থাকে শুধু কাঁটা তার বোঁটায়;

—এই সহজ অনুভূতি থেকেই তিনি পৌঁছেছেন ঐ রোমান্টিক-বৃত্তে।

বলা যায়, এই আতুর রোমান্টিকতাই তাঁকে করেছে সন্ধ্যাবেলার, করুণ রাগিণীর কবি। সে বিষয়ে কয়েকটি আত্মপরিচয় উদ্ধৃত করি

১ মোর সাঁঝের গান, মোর করুণ তান,

২ বুঝি মোর করুণ গানে ব্যথা তাঁর বাজল প্রাণে,

৩ আমার করুণ গানে
যদি দুঃখস্মৃতি আনে
ফুরাইয়া গেলে গান মুছিয়া ফেলিয়ো আঁখি।

৪ করুণ সুরে ও কী গান গাও?

৫ তার গোপন কথা প্রাণের ব্যথা করুণ গানে গাঁথা রে।

৬ যার আঁখি ছলছল, আয় রে এ নায়।

৭ বেদনে বাধা জীবনবাণা
বংশরি বাজাও গো!—

এই রোমান্টিক দুঃখই কবিকে ছুটিয়েছে অন্ধকারে, 'সুদূর গানে বঁধুর পানে', 'ঘুম-ভাঙানো রাত-জাগানো' অজানার খোঁজে, গানের তরী ভাসিয়ে ঘাটে ঘাটে তাকে তিনি খুঁজে বেড়িয়েছেন। আরো স্পষ্টত, তীব্র এই টান চেনা যায় 'মন বলে তাই চাই গো যারে নাহি পাই গো'—এই না-পাওয়া বাসনার, বা অনিকেত দূরত্বের

১ বাতাসে তাহারই কথা, তরঙ্গে তারই বারতা,
জোছনা পথ তার দেখায়, দেখায় দূরে।

২ যাহারে দেখতে নারি তারেই আমি চাই গো।
যাহারে ধরতে চাহি তারেই নাহি পাই গো।

৩ আরও কি মোর গাইতে হবে? নয়ন-জলে নাইতে হবে?
আরও কি মোর চাইতে হবে—দিলে না যা তাই?

এই রম্য দুঃখই সবটুকু ভাবলে ভুল হবে, যদিও তার চেয়ে ধারালো তীক্ষ্ণতাগুলি কবি সহজ প্রসন্নতায় ঢেকে দিয়েছেন। 'দুখের মাঝেই পাবি রে তুই সুখের দেখা'—এই আস্থা কি পেয়েছেন বাউল-মারফতি-কর্তাভজার

গানে? যেখানেই পান, অতুলপ্রসাদের প্রকৃতিগীতির মধ্যেও পশ্চিম ভারতীয় সেই রুক্ষতার কোনো ছায়া পড়েনি।

অবশ্য তাঁর কোনো কোনো লেখায় ঈষৎভাবে আছে ছায়াতরুরিক্ত দগ্ধ বিস্তারের ছবি, বাইরের তপ্ত হওয়া, 'গাঁথি নি মালিকা, যদি শুকায়', কোথাও এঁকেছেন দাবদগ্ধ নিষ্ফল বৃক্ষের উপমা। রিক্ততা প্রকাশ করেছেন: 'ঝ'রে গেছে সকল আশা, / ফোটে না আর ভালোবাসা'—এই ভাষায়। কোনো গানের মধ্যে আছে চিররাত্রির মধ্যে দীপ্তিহারা দৃষ্টির আতুরতা। কিন্তু সেই রাত্রির মধ্যে নিঃসহায় বন্দীত্বও নয় তাঁর। রোমান্টিক বিশ্ব নিরীশ্বর নয়। সেখানে দুঃখের তলায় আছে নির্ভর—স্বপ্নাহৃত, বা কবির স্বোপার্জিত। গানই তো কবির সেই অচ্ছেদ্য কবচ, তাঁর 'অকূলের তরী': 'হানো যদি খর বাণ, আমারও তো আছে গান'; গান সেই বহ্নিপ্রতিরোধী সঞ্জীবনী

১ দগ্ধ যবে চিত্ত হবে এ মরু সংসারে,
স্নিগ্ধ করো মধুর সুধাধারে।

২ ভুলে যা দুঃখের দাহন
ডুব দিয়ে গান-সুধার রসে।

এই গানের ও-পারে তাঁর উপাস্য দাঁড়িয়ে আছেন। নয়নজলে ভেসেছে তাঁর গানের তরীটি, কিন্তু একটি আবির্ভাবের স্বপ্নে সে স্বচ্ছন্দ। বিজন একাকি একটি তরুর ডালে নবীন শাখী, কাঁটার বনে ঘেরা ভাঙা দেউলে দীপ-হাতে সুকুমারী, শূন্য ঘরে সুন্দরের পুনরাগমন, ভাঙা কুঞ্জে শিহরবিসারী চরণরণন—এই ছবিগুলি পুনরাবৃত্ত তাঁর গানে। কবির সে রঙ্গরাণী, হৃদয়বিলাসিনী স্বপননিবাসিনী সুহাসিনী। যার সঙ্গে ক্ষণিক দেখা, আর যার জন্য অনন্ত বিরহ। 'বারেক উজলিয়া' সে মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে।

কবির এক লক্ষ্যে এই মানসসুন্দরী, আর এক দিকে তাঁর অন্তর্যামী। অতুলপ্রসাদের ঈশ্বর ঈশোপনিষদ্ থেকে প্রাপ্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঈশ্বর নন, আগেই বলেছি, আমাদের বহুপুরুষের কুলদেবতা। তাঁর সঙ্গে কবির জননী-সন্তানের সম্বন্ধ

১ তোর কাছে আসব মা গো
শিশুর মতো;

২ মা, তোর শীতল কোলে তুলে নে আমায়,

তিনি তাঁর লুকোচুরি খেলার হরি

> আমার চোখ বেঁধে ভবের খেলায়
> বলছ হরি, 'আমায় ধর।'

তাপিতের সব ভাবনা তিনি বহন করেন নিজে

> ১ তোমার ভাবনা ভাবলে আমার ভাবনা রবে না,
> আর আমার ভাবনা রবে না।
> ২ আমার ভাবনা নিয়ে, তুমি ভাবিয়ো।

যখন তিনি ধর্মের নন, দর্শনের দেবতা, মহৎ ব্যবধানে উচ্চাসীন, তখনো কবির তিনি কাছের জন : প্রাণসাথী। তিনি নিষ্ঠুর, তবু দরদী। দর্শনে রুদ্র কিন্তু অন্তরে শিব। তাঁর কাছে কবির প্রার্থনা, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্, 'তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।' কবির কাছে তিনি আরো এক ধাপ স্বতন্ত্র, তিনি শিল্পী

> বিহগের পাখায় পাখায়, বিটপের শাখায় শাখায়
> এমন [illegible] করি ?

আবার তিনি নিজেই প্রমূর্ত শিল্প : 'পীত-জ্যোৎস্না-বসন-শ্যাম-মুরতি অতি সুন্দর।' সর্বোপরি, তিনি অধৃত হননি যোগীর যজ্ঞচক্রে, তিনি ধরা পড়েছেন কবির ফুলের ফাঁদে।

দেবতা বা মানব—যখন যিনিই আরাধ্য হোন, অতুলপ্রসাদের অনেক লেখাই নিঃসক্ত বৈরাগ্যে ছোপানো। আবার ঐশী আকুতির থেকে সহজেই তিনি নেমে এসে ছুঁয়েছেন মানবজমিন, লিখেছেন গার্হস্থ্য ভক্তির কথা যা নিতান্তই সাংসারিক সুনীতি। 'দেখাও সুপথ হে পথের পতি', 'কাটো হে আমার স্বার্থের পাশ', 'বিশ্বের হিতে দাও হে শকতি'—এই প্রার্থনার থেকে পৌঁছেছেন অপরোক্ষ আত্মবিবেকে : 'সবারে বাসরে ভালো', 'মুছাও দুঃখীর আঁখির জল', 'দীনের দুঃখ করো হে মোচন, দীনের অভাব নাহি এ দেশে', 'নিন্দা দ্বেষ স্বার্থ প্রেমেতে করো ব্যর্থ'—এইসব সুনীতি-সচেতনতা আরেকদিক থেকে বাস্তবতার প্রতিও অবধান। এই অবধানের ফলেই শ্রাবণ-সুষমার ছবিতেও—বিরহী মানিনী সুলোচনা যূথবালিকা বিটপীতলের ঝুলা ইত্যাদির ভিতরে 'কৃষক হলে হলে' এই সুপরিহার্য বাস্তব অংশটির উপরেও তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে।

মনে হয়, আবহমান বিশ্বাসের উত্তরাধিকার আর এই বাস্তবতার বোধ কঠিন দুঃখেও কবিকে স্বস্থ রেখেছে,

> ভয়ে যবে ভাঙবে পরান,
> কণ্ঠে যেন থাকে রে গান;
> ঝড়ের হাওয়া লাগলে পালে
> আরও বেগে যাবি তরি'।

সহজ কণ্ঠে তিনি বলতে পেরেছেন। এক-আধটি নিঃসহায় আতুরতা যদি ফুটে থাকে, যেমন ফুটেছে

১
> এ ফুলে হল না মালা,
> শুধু তাহে ভরে ডালা;
> মিছে তুই কাঁটার ঘায়ে হাত বাড়ালি।
> মিছে তুই বঁধুর আশে দিন খোয়ালি।

২
> ঘরেতে পরবাসী থাকিতে আর পারিনে।

৩
> আমি তিক্ত বিরহ করিব পান আকুল মিলন-তিয়াষে।

—এই সব তিক্ত উচ্চারণে, অব্যবহিতভাবেই তা তিনি নির্জিত করতে পেরেছেন। জীবন-বিজনে তিনি দিশা খুঁজে পেয়েছেন আবার, অনুভব করতে পেরেছেন

> আজি সেই তিক্ত বিষ মধুর পীযূষে মিশা।

ফলে, খুব রিক্ত প্রহরেও তিনি মিলিয়ে নিতে পেরেছেন সব—মরমিয়া জাদুদণ্ডে, আর তাঁর রচনায় প্রস্তুত হয়েছে বর্ণময় বিষাদ, দুঃখ আর মাধুরি মিলেছে পাশাপাশি। অন্তর্লীন ভাবে, কখনো বা প্রস্ফুট ছবির রেখাতেও ব্যক্ত হয়েছে সেই বিপ্রতীপ সন্নিবেশ, কখনো 'ঘন মেঘে ঢাকা সুহাসিনী রাকা'র তুলনায় আরো অপ্রচ্ছন্নভাবে। যেমন

১ তোমার কাঁটায় ভরা বন তোমার প্রেমে ভরা মন।

২ তব নয়নে জল, ফুলে-ভরা আঁচল।

৩ চরণে বেদনা, কুসুম করে

৪ পথে ঝড়, ঘরে ডর, হাতে প্রেমফুলহার।

সুর বাদ দিয়ে, শুধু শব্দ দিয়েই ফুলের মতো রুচিরা এক বেদনা জাগিয়ে তোলার কিছু সাধ্য যে তাঁর লেখায় সঞ্চিত আছে, তা ভুল নয়।

হিসেবেও সুরচিত। শুধু প্রথম পংক্তির 'মম' শব্দটি পরিহার করলে 'গীতিগুঞ্জ' হাল সংস্করণের ১১৯-সংখ্যক পদ অচ্যুত অক্ষরবৃত্ত, শুধু শেষ পংক্তিতে 'পারত কি [সে] চলে যেতে' এই 'সে'-শব্দটুকু জুড়ে নিতে পারলে ১৩৩-সংখ্যক পদটি অসামান্য তেরজা রিমা।

কে গো গাহিলে পথে 'এসো পথে' বলিয়া?
দুয়ার খুলিনু যবে কেন গেলে চলিয়া?

এর প্রথম ছত্রটি 'কে-গো গাহিলে পথে' এই দীর্ঘমাত্রিক প্রণালীতে না পড়ে 'কে ওগো গাহিলে পথে' এই ঈষৎ যোজনা করে নেওয়া যেতো। সমগ্র কবিতাটিতে তা হলে আর একবার মাত্র একটি বর্ণের অভাব থাকতো— তৃতীয় পংক্তিতে। অন্তত দুটি কবিতার উল্লেখ করতে পারি, ভাব-ভাষা-ছন্দে নিটোল বলয় রচিত হয়েছে যেখানে। কবিতাদুটি পূর্ণ উদ্ধৃতির যোগ্য।

গীতিগুঞ্জ ৪১

যবে মানবের বিচারশালায় অবিচার পাব দান
যখন লুকানো নিন্দা আমারে হানিবে তীক্ষ্ণ বাণ
সহিব নীরবে, কহিব তখন—
তুমি জান, নাথ তুমি জান।

ভবের সভায় যশের মুকুট দেয় যদি তারা শিরে
পারি যেন দিতে সকল বিনয়ে তাদের চরণে ফিরে
বলি যেন সবে, জান না আমার
তুমি জান, নাথ, তুমি জান।

লক্ষ্যের দিকে যদি আসে মেঘ বিপদের পাখা খুলে,
যদি ভবপারে সবে ডাকে মোরে, 'চলে যাও তরণী কূলে',
চলিব আঁধারে, বলিব তখন
তুমি জান নাথ, তুমি জান।

ফুরায় যে সুখ, ফুরায় সে দুখ, না ফুরায় শুধু আশা;
ভাঙে যতবার গড়ি ততবার ধুলায় ধূলির বাসা।
কেন এ যতন? কোথা সে রতন?—
তুমি জান, নাথ, তুমি জান।

গীতিগুঞ্জ ১৮৭

এত হাসি আছে জগতে তোমার, বঞ্চিলে শুধু মোরে।
বলিহারি বিধি, বলিহারি যাই তোরে।

হাসিব হাসাব এই মনে লয়ে রচিলাম কত গান ;
সেই গানে আমি কাঁদিলাম কত, কাঁদালেম কত প্রাণ।
যে ডোরে সবার হয় মালা গাঁথা, দিল ফাঁসি সেই ডোরে।—
বলিহারি বিধি, বলিহারি যাই তোরে!

আমিও তো কত সুখের আশায় আশার ভেলায় ভেসেছি ;
আমিও তো কত সহ বাঁশি শুনি' যমুনার কূলে এসেছি।
কোথা শ্যামরায়, যার লাগি হায় রহিতে নারিনু ঘরে ?—
বলিহারি বিধি, বলিহারি যাই তোরে।

বুঝেছি তোমার মধুর মুরলী বাজিবে না মোর তরে।
এসো ঘনশ্যাম, তোমার রুদ্র দণ্ড লইয়া করে।
লয়ে যাও মোরে হে চিরবিরাম, তোমার রথের 'পরে।—
বলিহারি বিধি, বলিহারি যাই তোরে।

৬

এক নিভৃত রাতে সঙ্গোপনে কবির ঘরে এসে ঢুকেছিল ঘুম-ভাঙানো মন-ভাঙানো চাঁদ, বধূর রূপে। অন্ধকার ঘরে জ্বেলে দিয়েছিল পুরোনো দীপ, জাগিয়ে তুলেছিল পুরোনো বেদনা। গুঞ্জন করে বলেছিল পুরোনো কথা। একটি কবিতায় আরো স্পষ্ট ভাষায় কবি সে কথা লিখেছেন—

সবাই কত নূতন কথা কয়।
আমার পুরোনো কথা এখনো তো বলা হল না।
সবাই করে নূতন পরিচয়
আমার আপনজনে এখনো তো জানা হল না।

ঐ লেখার শেষ পংক্তিতে

আমার নিত্যনূতন সেই পুরাতন এখনো তো আপন হল না।

—ধরা পড়ে গেছেন কবি অতিনির্ধারিত একটি মুহূর্তের কাব্য-ঈপ্সায়। রবীন্দ্র-বিশ্বাসের বিকিরণ লেগে নূতন-পুরাতনের ঐ বিনিময় অথবা নিত্য উজ্জীবন-পাওয়া শাশ্বত পুরাতনের ঐ আবেদন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল একদিন। একখণ্ড চেনা ইতিহাস সুপরিচিত হয়ে উঠেছিল আমাদের কবিতায়।

বাঙলা কাব্যসংসার থেকে অনেকখানি ব্যবহিত দূরত্বে বাস করেছেন অতুলপ্রসাদ। হয়তো কবিতার প্রত্যক্ষ শিল্পৈষণাতেও বিচলিত হননি। কিন্তু রবীন্দ্র-পর্বের কবিতায় তিনিও ছিলেন অবিস্মরণীয় একজন অংশীদার, এটুকু স্বীকৃত না হলে আমাদের ইতিহাস অসম্পূর্ণ হবে।

অতুলপ্রসাদের রচনা

অতুলপ্রসাদের গদ্যরচনা ও অভিভাষণ এ-সব এ পর্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। তাঁর রচিত কিছু কবিতা ও দু-একটি গান এখনো গ্রন্থভুক্ত নয়। এগুলি বিভিন্ন সাময়িক পত্র থেকে যথাসাধ্য এখানে সংকলিত হল।

ভৈরবী

ওগো, সুখ নাহি চাই,
তোমার ভালবাসা দিও মোর ঠাঁই।

তুমি যদি থাক সুখে
আমারও থাকিও সুখে,
তুমি যদি পাও দুঃখ মোর দুঃখ নাই।

নাহি তুমি ভালবাসি
দাঁড়িয়ে অশ্রু-রাশি
তোমার হৃদয় সুখ দুঃখ সকলি নাশাই।

গান

মিশ্র খাম্বাজ

আজি বাঁধিনু তোমার তীরে তরণী আমার,
একাকী বাহিতে তারে পারিনে যে আর।

প্রভাত-হিল্লোলে ভুলে, দিয়েছিনু পাল তুলে,
ভাবিনি হবে সহসা এমন আঁধার।

ঝড়েতে বাঁধন টুটে, দিশাহারা এনু ছুটে,
তাই তরী তব তটে লাগিল এবার।

এখনও যা কিছু আছে, লহ তুলে তব কাছে,
রাখ এই ভাঙা নায়ে চরণ তোমার।

শৈলবনের সরসী তটে

সুর ভৈরবী, তাল একতালা

তোর শীতল কোলে তুলে নে আমায়।
তোর মেঘে-ঢাকা, পাখি-ডাকা শ্যামল শাখায়।
হেথা তোর নির্জন বনে, হাসে ফুল আপন মনে
কেউ তারে দেয় না ব্যথা বিচ্ছেদ-ব্যথায়।
হেথা নাই খাঁচার বাধা, নাই পরের বচন সাধা,
হেথা গান গাহে পাখি সুখের হেলায়।
পাষাণের বক্ষ-ঝরা, সরসী স্নেহভরা
কূলেতে ফুলের বিথান বিটপীর ছায়;
হেথা তোর বনের গাওয়া এদিন ঐ পাখির নাওয়া
হেথা তোর মৃদুল হাওয়া—মোর সকল ভুলায়!
সুন্দরের কুঞ্জবনে, নীরব বেণু-গুঞ্জনে
কে যেন ডাকে আমায়—আয়, আয়, আয়!
তারই সনে থাকব হেথা, ঘুচাব মোর সকল ব্যথা,
চুপি চুপি কতই কথা কব দুজনায়!

প্রত্যাবর্তন

খোল মা খোল মা দ্বার বহুদিন পরে
আজি এ তামসরাতে উল্কার আলোকে
পথ চিনি পুরাতন মাতৃগৃহে পুন
ফিরিয়া এসেছি ; মোরা কোটি পুত্র তোর,
নহি মা অতিথি : স্নেহে ডেকে নে গো ঘরে।
নাহি সুখশয্যা পর্ণগৃহে তোর ?—তাহে
ক্ষতি কি মা ? আজি ধর্মদ্বেষ জাতিগর্ব
ভুলি, কণ্ঠে কণ্ঠে মিলি সহোদর সবে
তোর ক্রোড়ে সব ব্যথা জুড়াতে এসেছি ;....
মুষ্টিঅন্ন যাহা আছে তাই দেগো আজ
কোটি হস্তে বাটি লব মায়ের প্রসাদ
মিটাইব পূর্ণ করি প্রবল এ ক্ষুধা।
কোটি হস্তে ভরা শস্যে করিব শ্যামল
অচিরে প্রান্তর তোর কোটি পুত্র মিলি।
স্বেচ্ছায় ফেলিয়া দূরে মহার্ঘ বসন
ভিক্ষুকের বেশে মা গো এসেছি আমরা ;
খুলে দে খুলে দে দ্বার, অয়ি স্নেহময়ী।....
ঐ যে খুলিল দ্বার, মার মৌনমুখে
ঈষৎ হাসির রেখা ; হস্ত প্রসারিত
স্নেহে ; দে মা পদধূলি অধম সন্তানে।
আয় ভাই ত্যাগমন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত
স্বার্থ করি বলিদান মার পদাম্বুজে,
তুলিয়া বঙ্গের পুষ্প বঙ্গ জননীরে
অর্ঘ্য করি দান ; ঘুচাই দুর্গতি :
গগন ভরিয়া বলি 'বন্দে মাতরম্',
'বন্দে মাতরম্'—পুনঃ 'বন্দে মাতরম্'।

ভারতী
কার্তিক ১৩১২

অর্ঘ্য

এনেছি, হে বিশ্বনাথ, এ সুপ্ত নিশীথে
গুপ্ত অর্ঘ্য মোর ; অন্ধ আঁধারে সঞ্চিত
সুগন্ধ কুসুম, লক্ষ নাগ-সুরক্ষিত
কণ্টক-কেতকী—লহ তারে নাগ-নাথ !
একি বিশ্বেশ্বর ! কেন বহে অশ্রুধার
ত্রিনেত্রে তোমার ? পড়েছে কি মনে
শিবশূন্য দক্ষযজ্ঞে সতীর ক্রন্দন
লাঞ্ছিত প্রেমের সেই চরম আহুতি ?
জেগেছে কি পূর্বস্মৃতি, হে রুদ্র সন্ন্যাসী
তোমার সে প্রণয়ের প্রলয় নর্তন ?
জাগিল কি মনে পার্বতীর প্রেমালাপ
মানস-সরসী-তটে নির্জন কৈলাসে ?
লহ তবে, হে বৈরাগি, জাহ্নবীর তীরে
এ দীনের মহাদান পূত নেত্র-নীরে ।

সাগর-বক্ষে জ্যোৎস্না সুন্দরী

এল গো আজ চাঁদ-বদনী স্বর্ণ-উজল সাজে।
ঢেউগুলি তাই নাচে;
উল্লসিয়া কল্লোলিয়া ঢেউগুলি তাই নাচে।
নীল সাগরের বক্ষে আজি লক্ষ ঘুঙুর বাজে।

সোনার নায়ে সোনা-গায়ে কে এলে গো রানী!
ঘোমটাখানি টানি,
মাঝে মাঝে নীলাম্বরীর ঘোমটাখানি টানি।
তোমার মনে কি আছে তা জানি ওগো জানি।

ঘরের বাহির করবে মোরে এই ত আছে মনে?
তাই ত সংগোপনে,
হাওয়ার সনে কানা-কানি তাই ত সংগোপনে,
মেঘের আঁচল পড়ছে খসে তাই ত ক্ষণে ক্ষণে!

আমি যদি আপন হতেই দিই তোমারে ধরা?
মিথ্যে যতন করা।
অমন ক'রে মন ভোলানোর মিথ্যে যতন করা।
তোমার তরেই বসে আছি, ওগো স্বয়ম্বরা।

পুরী ১২. ৬. ২৭

মুসায়েরা

অনেক দিনের কথা। তখন সবে মাত্র লখনৌতে আসিয়াছি। সৌভাগ্যক্রমে অল্পদিনের মধ্যেই এদেশীয় কয়েকটি সুকবির সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গেল। তন্মধ্যে একজন—হামিদ আলি খাঁ। খাঁসাহেব এক সময় ব্যারিস্টারি করিতেন, কিন্তু অগত্যা সে ব্যবসায়টা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছি:লন। আমার সঙ্গে যখন তাঁহার পরিচয় হয়, তখন তিনি উর্দু কবিতা ও হোমিওপ্যাথি চর্চায় ব্যস্ত। উর্দু ভাষায় তিনি একজন সুকবি বলিয়া জনসমাজে বেশ যশ লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজি কবিতা সম্বন্ধেও তাঁহার একটু খ্যাতি ছিল; তবে সেটা বন্ধুবর্গ উপহাসচ্ছলেই উল্লেখ করিতেন। যৌবনাবস্থায় বিলাতে অবস্থানকালে তিনি নাকি রমণীগণের মুখমণ্ডল লক্ষ্য করিয়া নানাবিধ প্রেম-কবিতার সৃষ্টি করেন। তাঁহার সমসাময়িক একজন বন্ধু, তাহার দুই একটি নমুনা আমাকে শুনাইয়াছিলেন; সেগুলি শুনিলে আদিরসের উদ্রেক হউক বা না হউক, হাস্যরসের উদ্দীপনা যথেষ্ট পরিমাণে হয়। বোধ হয় খাঁসাহেব একই কারণে ব্যারিস্টারি ও ইংরাজি কবিতা রচনা উভয় চেষ্টা হইতে বিরত হন। আমি তাঁহাকে আচকান, দোপল্লি টুপি ও চুড়িদার পায়জামা ছাড়া অন্য কোনো পরিচ্ছদে দেখি নাই।

একদিন তিনি আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত। বলিলেন, 'সেন, চলো' ম্যয় তুমকো মুসায়েরা মে লে চলুংগা'। তখন আমার উর্দুবিদ্যা নিতান্ত প্রাথমিক, বিহার অঞ্চলের চাকরদের কাছে শেখা বাংলা-ভাঙা বিকৃত হিন্দী তখনও অতিক্রম করিতে পারি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম—খাঁসাহেব, মুসায়েরা ব্যাপারটা কি? হয়ত বলিয়া থাকিব 'খাঁসাহেব মুসায়েরা ব্যাপার ক্যা হায়?' তিনি উত্তরে হাসিয়া বলিলেন—'লখনৌ আসিয়াছ, আর, এমবৎসর, এও জান না মুসায়েরা কাকে বলে?' তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, মুসায়েরার অর্থ কবি-সম্মিলন, যেখানে আমন্ত্রিত কবিগণ তাঁহাদের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন। আমার শুনিয়া লোভ হইল; বলিলাম—'চল, কিন্তু খাঁসাহেব একটু কাছে বসাইও, বুঝাইয়া দিতে হইবে।' তিনি বলিলেন—'আচ্ছা তাহাই হইবে, কিন্তু শোন, যেখানে যাইবে সেখানে ইংরাজি সভ্যতা এখনও প্রবেশ করে নাই, সে-স্থানটি প্রাচীন লখনৌর কেন্দ্রস্থল, সেখানকার লোকদের বেশ-ভূষা, ভাষা, আচার-ব্যবহার ঠিক নবাব আসফাদ্দৌলার সময়ে যা ছিল তাই, তাহারা

ইংরাজি কহে না, ইংরাজি জানে না, বস্তুত তাহারা ইংরাজি ভাষাকে ও ইংরাজি সভ্যতাকে ঘৃণা করে।' এসব শুনিয়া আমি একটু ইতস্তত করিতে লাগিলাম; ভাষা ও বেশ সম্বন্ধে মনে নানা প্রকার দ্বিধা ও আশঙ্কার সঞ্চার হইল। খাঁসাহেব বলিলেন—'শীঘ্র চল, বেশ পরিবর্তন করিয়া লও।' তাড়াতাড়ি হিন্দুস্থানী ও বিদেশী মিশ্রিত এক অপূর্ব বেশ ধারণ করিয়া খাঁসাহেবের সঙ্গে চলিলাম। তখন পর্যন্ত একেবারে খাঁটি খাঁসাহেবটি সাজিতে একটু সংকোচ বোধ করিতাম। আমার বন্ধুটি হিন্দুস্থানী পোশাকের সপক্ষে অনেক অকাট্য যুক্তি দর্শাইলেন। আমাকে স্বীকার করিতেই হইল যে হিন্দুস্থানী বেশ ইংরেজি পোশাক অপেক্ষা অধিকতর শোভন, সহজ ও সংগত। তদবধি কার্যত কখনও কখনও এ মতের পোষকতা করিয়া থাকি।

লখনৌর একটি পুরাতন পল্লীর পার্শ্বে বড় রাস্তার ধারে আমাদের গাড়ি থামিল। আঁকা-বাঁকা অনেকগুলি সংকীর্ণ গলির মধ্য দিয়া পদব্রজে চলিলাম, কেন না সে গলিতে গাড়ি চলিতে পারে না। দুদিকে জীর্ণ ইমারৎ, জন্মাবধি কখনও তাহার সংস্কার হয় নাই, দুই পার্শ্বে সেই সনাতন আবর্জনা; আবার সেই অপরিষ্কার গলির দুই ধারে দধি, 'বালাই', (লখনৌতে মালাইকে বালাই বলে) কবাব, রুটি, জিলেবি, বরফি ইত্যাদি খাদ্য ও অখাদ্য দ্রব্যের দোকান ও তৎসঙ্গে যথেষ্ট মাছি। মাঝে মাঝে দু-একটি ভাঙা ও ছাড়া বাড়ির ভাঙা কামরায় ছিন্ন-বসন বা বিবসন আফিমসেবিগণ নানা প্রকার অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া স্তিমিতনেত্রে বিশ্রাম করিতেছেন। পানের দোকানের অবধি নাই; দু-পা হাঁটিলেই এক একটি পানের দোকান। এখানকার মুসলমানেরা পান করেন না বটে কিন্তু পান খান অজস্র। এরূপ গলির ভিতর দিয়া প্রায় আধ মাইল হাঁটিয়া অবশেষে একটি প্রকাণ্ড ফটকের মধ্য দিয়া একটি প্রকাণ্ড বাড়ির আঙিনায় প্রবেশ করিলাম। গৃহের দ্বারেই গৃহকর্তা করযোড়ে দাঁড়াইয়া। খাঁসাহেবকে দেখিয়াই তিনি 'তসলিমাত্ আরজ খাঁসাহেব, তসরিফ্ লাইয়ে' বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন। আরও অনেক ফারসি-বহুল উর্দু ভাষায় তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। খাঁসাহেব সৌজন্যের রাজা, তিনি প্রত্যুত্তরে ভূয়সী সৌজন্য প্রকাশ করিলেন এবং দাঁড়াইয়া মাথা একটু নত করিয়া দুই হাতে একসঙ্গে তিনবার সেলাম করিলেন। আমি পড়িলাম মুস্কিলে, পূর্বে কখনও দুই হাতে কিংবা একসঙ্গে একবারের বেশি সেলাম করি নাই। আমি অতি সন্তর্পণে খাঁসাহেবের অনুকরণ করিলাম। পরিচয়ের পর নিমন্ত্রাতা আমাদিগকে ঘরের ভিতর লইয়া গেলেন।

যাহা দেখিলাম তাহা অদ্ভুত! দেখিলাম, সেখানে কবিবৃন্দ গোলাকারে বসিয়া আছেন। খাঁসাহেবকে দেখিবামাত্র তাঁহারা সকলে হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং সৌজন্য প্রকাশের একটা কলরব পড়িয়া গেল। এক সঙ্গে এতগুলি হস্তযুগলের উত্তোলন ও আন্দোলন আমার কাছে একপ্রকার ব্যায়াম বলিয়া ঠেকিল। সকলে আমাদিগকে খুব আদর করিয়া বসাইলেন। খাঁসাহেবের এরূপ প্রভূত সম্বর্ধনা দেখিয়া বুঝিলাম যে তিনি একজন যশস্বী কবি। খাঁসাহেব কবিদের পংক্তিতে বসিয়া গেলেন, আমি তাঁহার পশ্চাতে বসিলাম। তাঁহাদের বসিবার প্রণালী ঠিক আমাদের বাঙালিদের মতন নয়। তাঁহারা হাঁটুর উপর ভর করিয়া একটু অগ্রদিকে হেলিয়া হাত দুটি জানুর উপর রক্ষা করিয়া বসেন। পিছনে তাকিয়া নাই; প্রত্যেকের সামনে একটি করিয়া মৃৎভাণ্ড, তাহাতে পান রাখা। কিছু দূরে দূরেই একটি করিয়া উগালদান, তাহার কারণ, লখনৌর পানে তাম্বুলের মাত্রা একটু অধিক। কিন্তু মুসায়েরার আসরের একটি বিধি এই যে, গজল পাঠের সময় কেহ ধূমপান করিতে কিংবা পান খাইতে পারিবেন না। মাঝে মাঝে যখন পাঠের বিরাম হয় সে অবসরে তামাকু ও পান খাইয়া লইবেন।

আগত কবিবিশেষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'খাঁসাহেব, ঐ ফরসা সুপুরুষটি কে?' উত্তরে জানিলাম উনি একজন কাশ্মীরী হিন্দু কবি— তাঁর খুব প্রতিষ্ঠা। ঐ রোগাপানা, আচকান গায়ে, দোপাল্লি টুপি উল্টোভাবে পরা, বিষণ্ণবদন মুসলমানটি কে?—উনি একজন প্রসিদ্ধ মারসিয়াখান্; অর্থাৎ তিনি মারসিয়া শোক-সংগীত খুব ভাবের সহিত সুন্দরভাবে পাঠ করেন, আর উত্তম কবিতাও লেখেন। উনি কে? ঐ যে লম্বিতকেশ, কুঞ্চিত কুন্তল, প্রকাণ্ড মাথার অগ্রভাগে একটি অতি ক্ষুদ্র টুপি, ঢুলু ঢুলু অর্ধনিদ্রিত (হয়ত অহিফেন সেবন করেন) স্থূলকায় পুরুষটি? উনি? উনি একজন বিখ্যাত কবি; সাহীযুগের শ্রেষ্ঠ কবি আতসের বংশধর, ইঁহার সমকক্ষ কবি এখন লখনৌতে নাই। আর ঐ যে তাঁহার পার্শ্বে অত্যন্ত কৃষ্ণকায়, অতি সাধারণ পোশাক পরিয়া হাস্যবদনে বসিয়া আছেন, উনি কে? ও লোকটি? শুনিয়া হয়ত হাসিবে, ইনি একাওয়ালা নামে সাহেব, লখনৌর একজন সুকবি। দিনের বেলা একা হাঁকান। লিখিতে বা পড়িতে পারেন না, কিন্তু মনে মনে অতি সুন্দর কবিতা রচনা করেন এবং স্বরচিত গজল মুসায়েরাতে পাঠ করিয়া বেশ যশ লাভ করিয়াছেন। ইঁহার নাম তখল্লুস্ সফিক্। তখল্লুস্ মানে কবির একটি বিশেষ নাম। এদেশে

কবি মাত্রেরই এক একটি করিয়া তখল্লুস্ থাকে ; এ-নামে তাঁহারা কবিসমাজে পরিচিত। কবিতার অন্তিম চরণে এ নামেই তাঁহারা আত্মপ্রকাশ করেন।

এইরূপ হিন্দু ও মুসলমান, ধনী ও দরিদ্র, বৃদ্ধ ও যুবক, শ্বেতবর্ণ ও ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ নানাশ্রেণীর কবিগণ সে সভায় আসীন। আমার দেখিয়া মনে বড় আনন্দ হইল। কবি-সমাজে এরূপ সাম্য বড়ই সুদর্শন। তারপর, পাঠ আরম্ভ হইল। কেহ সুললিত কণ্ঠে সুর করিয়া নিজের রচনা আবৃত্তি করিলেন। কেহ একটু নাকি সুরে, কেহবা গুরুগম্ভীর নিনাদে স্বীয় কবিতা পাঠ করিলেন। সকলেরই উচ্চারণ অতি স্পষ্ট, একেবারেই দ্রুত নয়। ইঁহাদের পাঠ করিবার প্রণালী অতি সুন্দর।

মুসায়েরার পদ্ধতিটা এই। যিনি মুসায়েরা আহ্বান করেন তিনি নিমন্ত্রণপত্রের নিম্নভাগে দুই এক চরণ কবিতার নমুনা লিখিয়া পাঠান, তাহাকে বলে 'মিশ্রাতরাহ'। মিশ্রাতরাহর শেষ কথটিকে বলে 'রদিফ,' আর ঠিক তাহার পূর্বের শব্দটিকে বলে 'কাফিয়া'। একটি উদাহরণ দিতেছি :

'দিলহি বুঝা হুয়া হো তো লুতফ্এ বাহার ক্যা'

ইহার বাংলা অনুবাদ :

শুষ্ক যদি অন্তর আমার, বসন্তের আনন্দ কোথায় ?

এ পংক্তিটির 'ক্যা' শব্দটি রদিফ্, আর 'বাহার' শব্দটি কাফিয়া। বাংলাতে হবে 'কোথায়' কথাটি রদিফ্ আর 'আনন্দ' কথাটি কাফিয়া।

এখন, নিমন্ত্রণপত্রে যদি কেহ এই মিশ্রাতরাহটি লিখিয়া পাঠান :

'দিলহি বুঝা হুয়া হো তো লুতফ্এ বাহার ক্যা।'

তবে বুঝিতে হইবে যে, নিমন্ত্রিত কবিগণ মুশায়েরায় পাঠ করিবার জন্য যে গজলটি লিখিয়া আনিবেন তাহার প্রত্যেক দ্বিপদীর দ্বিতীয় চরণের কাফিয়া হবে 'বাহার' অর্থাৎ বাহার কথার সঙ্গে মিল থাকিবে ; আর শেষ কথাটি হবে 'ক্যা'। যথা :

'চলতি হয় ইস চমনমে হাওয়া ইনকিলাব্ কি
শবনম্ কো আয় দামনে গুল মে করার ক্যা।'

এখানে, 'বাহার' ও 'করার' এর কাফিয়া মিলিল ; আর রদিফ 'ক্যা'ও রক্ষা হইল। উপরি-উক্ত কবিতার বাংলা অনুবাদ :

হেথাকার ফুল-বনে সদা চলে পবন চঞ্চল
তাইত শিশির-বিন্দু পুষ্পকোলে সদা টলমল।

সর্বপ্রথমে নিমন্ত্রাতা কোনও বিখ্যাত কবির দুই একটি কবিতা আবৃত্তি করিয়া মুসায়েরা আরম্ভ করেন। তারপর কবিগণ তাঁহাদের স্বরচিত গজল পাঠ করেন। গজল ছাড়া মুসায়েরাতে আর কোনরকম কবিতা পাঠ করা নিয়মবিরুদ্ধ। নিমন্ত্রিত কবিদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও মাননীয় কবি তাঁহাকেই সচরাচর প্রথমে পাঠ করিতে অনুরোধ করা হয়। অনেক সময় তিনি কৃত্রিম বিনয় অবলম্বন করিয়া নানাপ্রকার আপত্তি প্রকাশ করেন; 'আমি এখন সেকালের, আজকালকার নবীন কবিদের আমার কবিতা ভাল লাগিবে কেন? ইহাদিগকে প্রথমে পড়িতে বলা হউক'। অমনি সভাস্থ সকলে একবাক্যে তাহার প্রতিবাদ করেন, হয়ত বলিলেন, 'আমাদের পরম সৌভাগ্য যে এখনও আপনার ন্যায় কবি জীবিত আছেন—ইত্যাদি'। এরূপ অনেক প্রকার বিনয় প্রকাশের পর নিজের আঙ্গারখার পকেট হইতে একটি পরচা বাহির করেন। তাহাতে স্বরচিত গজলটি লিখা। একটি সৌজন্যসূচক সেলাম করিয়া তাঁহার গজলটি পড়িতে আরম্ভ করেন, দ্বিপদী গজলের প্রথম পদটি আবৃত্তি করিলে পর সভাস্থ কবিকুল সমস্বরে তাহার পুনরাবৃত্তি করেন। মনে করুন, উনি পাঠ করিলেন 'চলতি হায় ইস চমন্‌মে হাওয়া ইন্‌কিলাব্ কি'। অমনি সকলে বলিয়া উঠিল 'চলতি হায় ইস চমন্‌মে হাওয়া ইন্‌কিলাব্ কি'। তারপর কবি নিয়ন্ত্রিত কাফিয়া-সংযুক্ত দ্বিতীয় চরণটি পাঠ করিলেন, 'শবনম্ কো আয় দামনে গুল মে করার ক্যা'। যেমনি দ্বিতীয় চরণটি পড়িলেন অমনি কবিবৃন্দ ও শ্রোতৃগণের প্রশংসা-ধ্বনির কলরবে গৃহটি পরিপূর্ণ হইল। কেহ বলিল—'আ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!' কেহ বলিল—'সুভান্‌আল্লা, ফির দোহারাইয়ে'; কেহ বলিল—'ক্যা খুব মিশ্রা লাগায়া'; কেহ বলিল—'ওয়াহ্ ওয়া, আপনে বেনজীর মিশ্রা কহি' এইরূপ আরও অনেক স্তুতিবাদ। কবি তখনই উঁচু হইয়া উঠিয়া চারিদিকে তাকাইয়া সেলাম করিতে লাগিলেন এবং কবিভ্রাতাদের প্রশংসাবাদের জন্য অবনত মস্তকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। একটি কবির গজল পাঠ শেষ হইলে তাহার পার্শ্ববর্তী কবিটির পালা; এবং ঠিক সেইরূপ পুনরাবৃত্তি, সেইরূপ প্রশংসাধ্বনি, এবং ঠিক সেইরূপ চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেলাম। এইরূপ পাঠপরম্পরায় কবি-চক্রটি সম্পূর্ণ আবর্তন হইলে পর সর্বশেষে নিমন্ত্রাতা আপনার রচিত গজলটি পাঠ করেন। সৌজন্যের জন্যই হউক বা কাব্যমাধুর্যের জন্যই হউক প্রশংসার মাত্রাটা তাঁহার ভাগ্যেই একটু বেশি পড়ে।

মুসায়েরা-চক্রটি একটি মধুচক্র, ইহার আকর্ষণ অসাধারণ। চারিদিক হইতে,

এমন কি সুদূর নগর ও গ্রাম হইতে কাব্যামোদিগণ 'মধুগন্ধে অন্ধ অলি'র ন্যায় তথায় আসিয়া একত্রিত হন। অনেক মুসায়েরাতে অতি মনোরম ও উচ্চাঙ্গের গজল পাঠ করা হয়।

বহুদিন পূর্বে লখনৌতে একটি মুসায়েরা হয়, তার গর্ব আজও অনেক লোকে করে। সে মুসায়েরার ভাল ভাল কবিতাগুলি অনেক কাব্যপ্রিয় লোকেরই কণ্ঠস্থ। উদাহরণচ্ছলে কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি। যিনি মুসায়েরা আহ্বান করিলেন তিনি নবাব ওয়াজিদালি সাহব সময়কার বিখ্যাত কবি আতস্-এর একটি গজল হইতে 'মিশ্র তরাহ' লিখিয়া পাঠান। তার দুটি চরণ এই :

'দো রোজ হায় ইয়ে লুৎফ্ ও আয়েস
ও নিসবৎ দুনিয়া ;
বুই সবাই উরুছি মেহমান হায় পিরহন মে'।

বাংলা অনুবাদ :

দুদিনের তরে হায়, সংসারের সুখ আশা যত,
বধূর বাসরবাসে ক্ষণস্থায়ী সুগন্ধের মত।

মুসায়েরা সম্মিলনে অনেক সুকবি উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহাদের স্বরচিত গজল পাঠ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকটি গজলের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। সুকবি 'হাকিমের' গজলের দুটি লাইন :

'ফির গয়ের গয়েরহি হায় গো হায় উস্ অঞ্জুমন মে ;
বেগানগি সবজা যাসি রেহি চমন মে'।

'পিরহনমে' আর 'চমনমে'র কাফিয়া মিলিল।

বাংলা ভাবানুবাদ :

যদিও সে একসঙ্গে লভেছে আসন
তথাপি সে পর, কভু হবেনা আপন ;
ফুল-বনে বন ঘাস উঠে ফুল পাশে ;
ফুলত চায়না তারে মনে উপহাসে।

এ কবিতাতে প্রতিযোগী প্রেমিকের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করা হইয়াছে।
সুকবি মঝর আগার গজলের দুটি চরণ :

'নাজ ও নয়াজ দেখে বুলবুল কে আওর গুল্ কে,
হামভি চলে চমন্ মে তুমভি চলো চমন্ মে'।

বাংলা অনুবাদ :

চল বধু দুজনাতে যাই ফুলবনে।
দেখিগে ফুলের লীলা বুলবুলের সনে।

কবি ইউসুফের গজলের দুটি পদ :

সাগর ভরে ধরে হুয় সাকী কি অঞ্জুমন্ মে।
তহ্ রহে হুয় কৌসর ফিরোজ কে চমন্ মে।

বাংলা :

সুরা-পাত্র উছলিত সাকীর সভায়
নন্দন-উদ্যানে যেন মন্দাকিনী ধায়।

সুকবি পণ্ডিত বিষণনারায়ণ দর এ-সভায় তাঁহার সুন্দর গজল পাঠ করিয়া সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি লখনৌতে একজন খ্যাতনামা ব্যারিস্টার। ১৯১১ সালে তিনি কলিকাতার কংগ্রেস সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত গজলের দুটি চরণ এই :

'গুল্‌কে যো কাণ ওড়াই বক বক্‌কে বুলবুলোনে,
বোলি কলি ছিটক্ কর ক্যা সোর হুয় চমন মে'।

বঙ্গানুবাদ :

বুলবুলের গোলমাল শুনি ফুল-বন,
হইল অধীর, তার বধির শ্রবণ,
হেনকালে জাগি উঠি মেলি আঁখি-পাতা
ফুলকলি ফুকারিল—কার গোল হেথা ?

নবাব ওয়াজিদালি সাহের সময়ে মুসায়েরার খুব আদর ও প্রতিষ্ঠা ছিল। সে সময়কার মুসায়েরার গান এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। ওয়াজিদালি সাহ স্বয়ং খুব সুন্দর গজল রচনা করিতেন। বাদসাহ নিজেও নাকি কখনও কখনও মুসায়েরাতে সরীক হইতেন। সে সময়ে কয়েকটি কবি খুব যশস্বী হইয়া উঠেন। তাঁদের মধ্যে দুজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য : একজনের কবিনাম 'আতস্' অন্যজনের কবি আখ্যা 'নাছিখ্'। উভয়েই প্রতিভাশালী কবি, তবে আতসের প্রতিভাই উজ্জ্বলতর। অনেকে বলেন যে 'আতস্' লখনৌর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। উভয়ের মধ্যে বেশ একটু প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবও ছিল। নাছিখ্ ছিলেন একটু উদ্ধত ; উভয়ের শিষ্য ও স্তাবকের সংখ্যা বিস্তর।

একবার একটি বিখ্যাত মুসায়েরাতে দুজনেই আহূত হয়েন। নাছিখের বয়স্যেরা আতস্‌কে অপদস্থ করিবার জন্য একটি ষড়যন্ত্র করিল। নাছিখ্‌ ও তাঁহার দলবল নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বেই সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া মুসায়েরার চক্রটিকে অধিকার করিয়া বসিলেন। আতস্‌ ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ যখন আসিলেন তখন ঘর পূর্ণ। আতসের জন্য অবশ্য স্থান হইল, কিন্তু তাঁহার সহচরগণকে স্থানাভাবে পশ্চাতে বসিতে হইল। প্রথমেই পাঠ করিলেন নাছিখ্‌। তারপর তাঁহার শিষ্যবর্গ খুব লম্বা লম্বা গজল বিশেষ আস্ফালনের সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন। এমনভাবে তাঁহারা তাঁহাদের কবিতা আওড়াইলেন যেন তাহাতেই রাত্রিটি কাটিয়া যায়, যেন আতসের আর গজল শুনাইবার সুযোগ না হয়। রাত্রিও শেষ হইল—তাঁহাদের গজলপাঠও সমাপ্ত হইল এবং তৎপরমুহূর্তেই নাছিখ্‌ এবং তাঁহার অনুচরগণ সভা হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। ভাবিলেন যে, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই মুসায়েরাও সাঙ্গ হইবে, শ্রোতৃবর্গের আর ধৈর্য থাকিবে না। কিন্তু বহু লোক আতসের গজল শুনিবার জন্য উৎসুক; তাঁহারা নাছিখের ব্যবহারে বিরক্ত হইলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের ধৈর্যচ্যুতি হইল না। ঠিক সূর্যোদয়ের সঙ্গে আতসের গজল পড়িবার সময় আসিল, আতস্‌ তখন-তখনই নাছিখ্‌ ও তাঁহার স্তাবকগণকে নির্দেশ করিয়া দুটি পদ রচনা করিলেন। তাহা এই :

'রাতভর হর সবিতো ও সইয়ারা গরমে লাফ্‌ থা,
সুবোকো খুরসিদ নিকলা তো মতলা সাফ্‌ থা।'

অর্থাৎ

সারা রাত গ্রহ তারা চমকিল গর্বে মাতোয়ারা;
দিনমণি যেমনি উদিল পলাইল কোথায় তাহারা?

আতসের এরূপ অপ্রত্যাশিত ও বিদ্রূপপূর্ণ জবাবে সকলে চমৎকৃত হইলেন এবং উল্লাসে হুঙ্কার করিয়া সভাস্থলে ও সভার বাহিরে রাজপথে—'রাতভর হর সবিতো...' এ-চরণ দুটি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। সহরে এমন একটা জয়রোল উঠিল ও হৈ চৈ পড়িয়া গেল যে, নিশান্তে নিদ্রিত বাদসা ওয়াজিদালি হঠাৎ জাগিয়া উঠিলেন এবং প্রহরীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'এত গোলমাল কিসের? নিশ্চয় কোথাও ডাকাত পড়িয়াছে; যাও শীঘ্র সিপাহীদিগকে খবর দিতে বল।' সিপাহীরা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'হুজুর, ডাকাত নয়। মুসায়েরার কবি আতস

নাছিখের ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদের দুর্ব্যবহারের এমন উচিত জবাব দিয়াছে যে, সহরময় তাহার জয়োল্লাসধ্বনি উঠিতেছে'। বাদশাহ কবিতাটি শুনিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং আতসকে ডাকিয়া ইনাম দিলেন।

এত গেল সাহি-জামানার কথা। আজকালও মুসায়েরা এদেশে খুব প্রচলিত ও সমাদৃত। নগরে নগরে এমন কি গ্রামে গ্রামেও মুসায়েরা হইয়া থাকে। কলেজ ও স্কুলের ছাত্রেরাও মুসায়েরা উৎসব করে। এখনও মুসায়েরার মজলিসে বেশ ভাল ভাল গজল শুনিতে পাওয়া যায়। তবে নিকৃষ্ট রচনাও কখনও কখনও প্রশ্রয় পায়, এমন কি তাহা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হয়। সময় সময় শুধু ব্যঙ্গ রসের অবতারণার জন্য এরূপ নির্বোধ গজল-রচয়িতাকে আহ্বান করা হয়। আমি নিজে দেখিয়াছি, একজন রচয়িতা নিতান্ত অর্থশূন্য ও বালকসুলভ কবিতা আবৃত্তি করিতেছেন এবং তাহা শুনিয়া শ্রোতারা খুব তারিফ্ করিতেছে এবং কবি কৃতজ্ঞতাবনত মস্তকে সকলকে সেলাম করিতেছে। অল্পবুদ্ধি বুঝিতেছে না যে, সে তারিফ্ বিদ্রূপে ভরা।

মুসায়েরা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখিলাম। আমার মনে হয়, বাংলা সাহিত্য-সমাজে এরূপ একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিলে মন্দ হয় না।

উত্তরা, আশ্বিন ১৩৩০

আমার কয়েকটি রবীন্দ্র-স্মৃতি

রবীন্দ্রনাথের জীবনের আলোচনা এবং তাঁর কাব্যের সমালোচনা হয়ত অনেকেই করিবেন। আমি তাহা করিব না। তাঁর সম্বন্ধে আমার নিজের কয়েকটি স্মৃতির কথা বলিব।

অল্প বয়সে যখন স্কুলে পড়িতাম তখন তরুণ বন্ধুদের মধ্যে তর্ক হইত বাংলার কবিদের মধ্যে কে বড়। রবীন্দ্রনাথ তখন নবীন কবি। মাইকেল মধুসূদন দত্তের শ্রেষ্ঠত্ব তখন সর্ববাদীসম্মত ছিল। ঝগড়া হইত হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে লইয়া। হেমচন্দ্রের শিঙা তখনও খুব সজোরে বাজিতেছে। পলাশী যুদ্ধের কামান বর্ণকুহর কম্পিত করিতেছে, রবীন্দ্র তখন বেণু বাজাইতেছেন। সে বেণু একটু আদিরসাত্মক, গুরুগম্ভীর নয়, সে জন্য প্রবীণদের মনঃপূত হইতেছিল না। তাই তরুণরাও অনেকে না বুঝিয়া সে মতে সায় দিত। আমি তখন অজাতশ্মশ্রু, আমাদের দল ছোট তবু আমি রবীন্দ্রনাথের পক্ষ লইয়া অভিমন্যুর মত তাদের সঙ্গে লড়িতাম। তারা বলিত—রবিবাবুর কবিতার ভাষা নিতান্ত সহজ, কোমল ও মেয়েলি—সংস্কৃত শব্দের পাণ্ডিত্য নেই, জোর নেই ইত্যাদি। উত্তরে, আমি নানা প্রকার পশুপক্ষীদের রবের উপমা দিয়া তাদের মতের সমীচীনতার প্রতিবাদ করিতাম। তখন কোন দলের জয়, কোন্ দলের পরাজয় হইয়াছিল ঠিক স্মরণ নাই, আমি কিন্তু মনে করিতাম আমাদেরই জয়, বিপক্ষ তা স্বীকার করিত না। তারা তখন 'ভারত ভিক্ষার' দোহাই দিত। আমি তখন গান ধরিয়া দিতাম—'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক, জগতজনের শ্রবণ জুড়াক। হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক্—মুখ তুলে আজি চাহরে'। আজ বহু বৎসর পরে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী বাল্যবন্ধুদের মধ্যে যারা জীবিত আছেন তাঁরাও স্বীকার করিবেন যে আমার মতাবই ঠিক। এখনও হেমচন্দ্রের ও নবীনচন্দ্রের কোনো কোনো কবিতা আমার বেশ ভাল লাগে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ? অতুলনীয়।

আজ একবাক্যে সকলেই স্বীকার করিতেছেন যে রবীন্দ্রনাথ বাংলার শ্রেষ্ঠতম কবি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় যখন আমি ১৮৯৫ সালে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসি। তখন আমার বয়ঃক্রম প্রায় একুশ, বাইশ। শ্রীমতী সরলা দেবী আমাকে লইয়া গিয়া তাঁর সঙ্গে আলাপ করাইয়া দেন। প্রথম দর্শনেই প্রেম।

ইতিপূর্বে তাঁকে ছবিতে দেখিয়াছিলাম এবং তাঁর কবিতার অনুরাগী ছিলাম, নয়নের সম্মুখে যখন তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর স্নিগ্ধকান্তি দেখিলাম, মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ছেলে বয়সেই গোপনে একটু আধটু কবিতা লিখিতাম, দু'একটি গানও রচনা করিয়াছিলাম। নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু বা আত্মীয় ছাড়া আর কাহাকেও তা শোনাই নাই; তাও আমার কবিতার খাতা ধরা পড়িয়া গিয়াছিল বলিয়া। আমার মনে আছে কোন চায়ের নিমন্ত্রণে কবি উপস্থিত ছিলেন, আমিও একজন নিমন্ত্রিত। সেখানে তাঁর গান হয়—মনে আছে বড় ভাল লাগিয়াছিল তাঁর গান। সেই সময় আমার একজন দুষ্ট বন্ধু তাঁকে বলিয়াছিল—'দেখুন, অতুল গান করে আর নিজেও কিছু কিছু গান রচনা করে।' আমার ত তখন লজ্জায় ও সংকোচে 'পৃথিবী দ্বিধা হও' ভাব। আমি প্রতিবাদ করিলাম, কবি শুনিলেন না, বলিলেন—'সে ত খুব ভাল কথা, আপনি নিজের রচিত একটি গান করুন'। তখন ছিলাম 'আপনি' ও 'অতুলবাবু' এখন সৌভাগ্যক্রমে হয়েছি 'তুমি' ও 'অতুল'। আমি এড়াইবার অনেক চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না। বুঝিতেই পারেন, তখন আমার শরীরের ও মনের কি দুরবস্থা। ভারতের শ্রেষ্ঠতম গীতিকবি ও একজন সুগায়কের নিকট আমাকে নিজ রচিত গান গাহিতে হইবে। তিনি বুঝিলেন, আমি বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। তিনি আমাকে খুব আশ্বাস দিয়া গাহিতে বলিলেন। আমি কম্পান্বিত কলেবরে ও কম্পিত-কণ্ঠে গাহিলাম। আমার অবস্থা সকলেই লক্ষ করিল। শিষ্টতার প্রতিমূর্তি রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিলেন তাতে আমি অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম, যদিও আমার মুখের উষ্ণ ও রক্তিম ভাব কাটিতে বেশ সময় লাগিয়াছিল। যাহা হউক তিনি যাহা বলিলেন তাহাতে আশ্বস্ত হইলাম ত বটেই, উৎসাহিতও হইলাম। সে সহৃদয় উৎসাহটুকু আমার রচনার জীবনী-শক্তি।

আনন্দ ও উৎসবের মধ্য দিয়া সাহিত্য ও সংগীতের প্রচার রবীন্দ্রনাথের এক বিশেষ কৃতিত্ব। তিনি সাহিত্য, কবিতা ও গানকে আনন্দের বিকাশ বলিয়া মনে করেন। তাঁহার অনেক রচনাতে ইহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। তাঁহার এই বৈশিষ্ট্যের একটি দৃষ্টান্ত দিই।

১৮৯৬ সালে তাহার নেতৃত্বে 'খামখেয়ালী সভা' নামে একটি সাহিত্য ও সংগীতমণ্ডলী স্থাপিত হয়। আমি এ সভার সর্বকনিষ্ঠ সভ্য ছিলাম। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মহারাজা জগদীন্দ্রনারায়ণ রায়, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকেন্দ্রনাথ পালিত প্রমুখ অনেক সাহিত্যিক ও সুরসিক

'খামখেয়ালীর' সদস্য ছিলেন। এ সভার কার্যপ্রণালী ছিল একটু খামখেয়ালী, নিয়মের কোনো বাঁধাবাঁধি ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল হাস্যরসের উদ্দীপনা করা, সাহিত্যকে আনন্দে সরস করা, নানাবিধ সংগীতের দ্বারা সভ্যদের চিত্ত আকৃষ্ট করা এবং সভান্তে জঠরের সম্যক তুষ্টি সাধন করা। এ খামখেয়ালীর মজলিসকে মজগুল রাখিতেন পরম হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তিনি আমাদিগকে হাসির বন্যায় ভাসাইতেন তাঁহার হাসির গান গাহিয়া। আমরা সকলে তাঁর হাসির গানের কোরাসে যোগ দিতাম, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কোরাসের নেতা। সকলের মুখে হাসি, কণ্ঠে গান, হাসির উচ্চরোলে সভাস্থল কম্পান্বিত হইত। দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিতেন—'হোতে পাত্তেম আমি একজন মস্ত বড় বীর' আর রবীন্দ্রনাথ মাথা নাড়িয়া কোরাস ধরিতেন—'তা বটেইত, তা বটেইত'। দ্বিজেন্দ্র গাহিতেন—'নন্দলাল একদা করিল ভীষণ পণ', রবীন্দ্র গাহিতেন—'বাহারে নন্দ বাহারে নন্দলাল'। দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের নাচাইতেন হাসির উদ্বেল তরঙ্গে, রবীন্দ্র আমাদের মুগ্ধ করিতেন তাঁর অনুপম সূক্ষ্ম হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়া। খামখেয়ালীর আসরে বিখ্যাত গায়ক রাধিকানাথ গোস্বামী তাঁর উচ্চাঙ্গের তানলয় মণ্ডিত গান গাহিয়া আমাদের মনোরঞ্জন করিতেন। রবীন্দ্রনাথের সংগীত প্রতিভা এমন সর্বমুখী যে গোস্বামী মহাশয়ের উপাদেয় সুরে তিনি গান বাঁধিতেন এবং কবির সে নবরচিত গানগুলি রাধিকানাথ খামখেয়ালীর আসরে গাহিয়া শুনাইতেন। তন্মধ্যে একটি গান মনে আছে—'মহারাজ একি সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝে, চরণতলে কোটিশশী চন্দ্রমার লাজে'। খামখেয়ালী মজলিসে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অধিকারী। আমরা ছিলাম তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ। সেই আসরে কবি কত যে নূতন ও অনুপম স্বরচিত গান গাহিয়া আমাদের মনোরঞ্জন করিতেন তাহা জনমে ভুলিতে পারিব না। সেই সময় তাঁর বিখ্যাত গানের কয়েকটি মনে আছে—'মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী, সখী জাগো—জাগো!' 'বঁধু হে ফিরে এসো; মম সজল জলদ স্নিগ্ধ কান্ত অম্বরে ফিরে এসো', 'জাগি পোহাল বিভাবরী' ইত্যাদি গান ছাড়াও খামখেয়ালীর মজলিসের জন্য বিবিধ অপরূপ কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিয়া আমাদের শুনাইতেন, আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহা শুনিতাম। তাঁর আবৃত্তি করিবার ক্ষমতা অসাধারণ। সে আসরে নাটোরের মহারাজা বাঁয়া-তবলা বাজাইতেন। এ বাদ্যে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে 'রাজন' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এস্রাজ বাজাইতেন বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রচনা পাঠ করিতেন

আরও অনেক সাহিত্যিক। তন্মধ্যে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা আমাদিগকে সর্বাপেক্ষা চমৎকৃত করিত। বলেন্দ্রনাথ অল্প বয়সেই ইহলোক ত্যাগ করেন, কিন্তু সে-বয়সেই তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে অনেকেই মনে করেন যে ঠাকুর পরিবারে তিনিই সাহিত্য-সম্বন্ধে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারী।

'খামখেয়ালী'র অধিবেশন এক একজন সদস্যের বাড়ীতে হইত। তিনিই সকলকে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং ভোজের সুব্যবস্থা করিতেন। সে ব্যবস্থাতেও কলাশিল্পীর আবির্ভাব দেখিতাম। একটি দিনের কথা আমার খুব মনে আছে। সেবার বলেন্দ্রনাথের পালা। কবিবরের কবিতা ও অন্যান্যের রচনা পাঠ। সংগীত, হাসির গান ইত্যাদি খামখেয়ালীর উৎসবানন্দ সম্ভোগের পর স্বল্পভাষী ও বিনয়ী বলেন্দ্রনাথ আমাদিগকে আহারের জন্য অন্য একটি ঘরে লইয়া গেলেন। সে ঘরটি এমনভাবে পুষ্পপত্রে সুসজ্জিত ছিল যে মনে হইতেছিল নন্দনের ফুলকুঞ্জে প্রবেশ করিলাম। মাঝখানে দেখিলাম একটি জলাশয়, তার মাঝে মাঝে দু'একটি বনস্পতি, জলে রাজহংস, জলপদ্ম, সরসীর তটের চারিপার্শ্বে নবদূর্বাদল—সকলই প্রকৃতির অনুকারী। কিন্তু হংস, তরুলতা, দূর্বাদল সকলই কৃত্রিম। সেই কাচ-নির্মিত সরোবরের চারিপাশে নিমন্ত্রিতের বসিবার স্থান, প্রত্যেকটি আসনের সম্মুখে নানাপ্রকার খাদ্যসম্ভার, তাহাতেও বিচিত্র বর্ণবিন্যাস। আমরা যেই খাইতে বসিলাম অমনি কোন এক প্রচ্ছন্ন স্থান হইতে মৃদু-মধুর সানাই বাজিতে লাগিল। আমাদিগের উচ্চহাসির ও আহার্য গ্রহণের পূর্বকালীন মুখব্যাদান সেই দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া আমাদের হাসির মাত্রা আরো বাড়াইতে লাগিল। আর বাক্যশিল্পী, আলাপ শিল্পী, হাস্যরসিক রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, জগদীন্দ্র রায়, অর্দ্ধেন্দু মুস্তফী আমাদিগকে তখন এমন হাসাইতে লাগিলেন যে, সে আলোড়নে সুখ-খাদ্য কোথায় যে তলাইয়া যাইতে লাগিল বুঝিতে পারিতেছিলাম না। এরূপ নানাবিধ আনন্দের বিচিত্র সমাবেশ আমি কখনও সম্ভোগ করি নাই। এই প্রণালীতে আমাদের সাহিত্যামোদের ক্ষুধা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। মনে আছে যেদিন আমার বাড়িতে খামখেয়ালীর অধিবেশন হয় সেদিন কবি বাড়ি গেলেন রাত্রি বারোটার পরে, মহারাজ নাটোর গেলেন বাড়ি একটা-দু'টার সময় আর দ্বিজেন্দ্রলাল ও আমরা কয়েকজন সারারাত কীর্তন শুনিয়া ও তাঁর হাসির গান শুনিয়া কাটাইলাম। তারপরদিন প্রাতে হাস্যরাজকে আমি বাড়ি পৌঁছাইয়া আসি। মনে আছে,

তাঁর স্ত্রী বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁর শিশুপুত্র মন্টু (দিলীপকুমার রায়) বাবার কোল ধরিয়া ভাঙা ভাঙা সুরে 'আ, আ' করিতে লাগিল, দ্বিজেন্দ্র বলিলেন—'বেটা বোধহয় গাইতে পারবে না।' এই রস-উৎসবের স্রষ্টা ও অধিনায়ক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রেমিক হইলেও তাঁর স্বদেশীয়তা ও দেশভক্তি সর্বজনবিদিত। বিশ্বের ভাষার ভাণ্ডারে তাঁর রচিত জাতীয় সংগীতের তুলনা আর নাই। আগ্রাবাসী বাঙালি কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় দুইটি জাতীয় সংগীত রচনা করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন 'কতকাল পরে বল ভারত রে দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে' 'পর দীপমালা নগরে নগরে তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে' এবং 'নির্মল সলিলে বহিছ সদা তটশালিনী সুন্দরী যমুনে ও'। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যদি তার কয়েকটি স্বদেশ সংগীত লিখিয়াই কবিতা লিখিতে বিরত হইতেন, তাহা হইলেও তিনি গীতরচনায় ভারতের শ্রেষ্ঠতম কবি বলিয়া গণ্য হইতেন। তাঁহার একটি স্বদেশ সংগীতের ইতিহাস বলি। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে কলিকাতায় একবার কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ভারতের নানা প্রদেশ হইতে বহুসংখ্যক গণ্যমান্য প্রতিনিধিরা আসিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। প্রবাসীরা বাংলা জানেন না, অন্তত প্রাঞ্জল প্রচলিত বাংলা বোঝেন না অথচ অনেকেই সংস্কৃত জানেন, তাই সংস্কৃতবহুল একটি অপূর্ব ভারত-সংগীত রচনা করিয়াছিলেন। তিনি নিজে আমাদের অনেককে সেই গানটি শিখাইয়াছিলেন। মনে আছে বহুকণ্ঠে ও বহু বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে আমরা সেই গানটি গাহিয়াছিলাম। আমাদের সকলেই—পুরুষ ও মহিলা—শুভ্রবসন পরিধান করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে আমাদের নেতা। গাহিয়াছিলাম—

'অয়ি ভুবনমনমোহিনী '

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ সংগীতের উল্লেখ করিতে গিয়া মনে হইতেছে বঙ্গ বিভাগ ও স্বদেশী-আন্দোলনের সময় তাহার জাতীয় সংগীতের প্রভাব। সে সময়কার গানগুলি বঙ্গভাষায় ও বাঙালির প্রাণে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমার বোধহয় সে সময় বঙ্গদেশে যে দেশপ্রীতির স্রোত বহিয়াছিল তাহার উৎস রবীন্দ্রনাথের গান। বাংলার ঘরে ঘরে শোনা যাইত 'আমার সোনার বাংলা।' পথে পথে শুনা যাইত—'বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল

পুণ্য গোক পুণ্য হোক হে ভগবান।' আর একটি চিত্র আমার মনে পড়িতেছে। আমি সে সময় কলিকাতায় গিয়াছিলাম। গঙ্গার ধারে গিয়া দেখিলাম, দেশপ্রেমিকেরা গান গাহিতে গাহিতে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন—বঙ্গবিচ্ছেদের অভিশাপ ক্ষালন করিবার জন্য। শোভাযাত্রার সর্বপ্রথমে একটি অল্পবয়স্ক বালক একটি সুস্থকায় ভদ্রলোকের স্কন্ধে চড়িয়া, হাত তুলিয়া সুললিত কণ্ঠে গাহিতেছে—'বাংলার মাটি···।' আর সকলে সহস্র কণ্ঠে সে গানের পুনরাবৃত্তি করিতেছে। সে বালকটি মহারাজা জগদীন্দ্রনারায়ণ রায়ের শিশুপুত্র—অধুনা মহারাজ। সে দৃশ্য এত হৃদয়স্পর্শী যে আমার চোখে জল আসিল। রবীন্দ্রনাথও নতশিরে সে স্নানযাত্রায় যোগ দিয়াছিলেন। যুবকরা সে সময় স্ফীতবক্ষে গাহিত—'যদি তোর ডাক শুনে···।' ভারতকে উদ্দেশ করিয়া কবি যে অপূর্ব দেশ-সংগীত রচনা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ গান।

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এ দেশে···
কোন্ গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে।

জগতের গীতিসাহিত্যে এমন হৃদয়স্পর্শী গান আর একটি আছে কি না জানি না। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের গানগুলি বাংলার প্রাণকে যেমন করিয়া আন্দোলিত করিয়াছিল, বিপুল জনসভায় ওজস্বী বক্তারা তেমন করিতে পারেন নাই। এমন কি বিপ্লববাদীরাও তাঁহার গান গাহিয়া আত্মোৎসর্গের পথে অগ্রসর হইত। তাঁহার জাতীয় সংগীতে প্রতিহিংসা বা সংকীর্ণতার লেশ মাত্র নাই। অথচ তাঁহার গানে লোকের মনে আসিত দেশপ্রেম সাহস ও শক্তি। তাঁহার স্বদেশ-গীতির মন্ত্রশক্তি অবর্ণনীয়।

তাঁর গীত-সম্ভারের একটি পরম সম্পদ তাঁর বর্ষার গান। চিরদিনই বর্ষাঋতু ভারতের কাব্য-সাহিত্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কালিদাসের মেঘদূতের 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাপতির 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর' ইহার প্রমাণ দিয়াছে। তৎপরে রবীন্দ্রনাথের বর্ষা কবিতা ও বর্ষা সংগীত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম উপাদান জোগাইয়াছে। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, কোনো কালে বা কোনো দেশে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ বর্ষা-কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁর সে কবিতাগুলি একত্র করিলে ন্যূনকল্পে শতাধিক হইবে। তাঁর তরুণ বয়সের 'রিমঝিম ঘন ঘনরে' এবং পরিপক্ক বয়সের 'ওই আসিছে বরষা···নিখিল চিত্ত ভরসা' ইত্যাদি অপূর্ব বর্ষা সংগীত বাংলাভাষার

পরম সম্পদ। আমার মনে আছে বহুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বর্ষাকালে যাতায়াত করিতাম। তিনি আমাকে সে সময়ে দ্বিপ্রহরের পরে আসিতে বলিতেন এবং সেখানেই চা-পান করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাড়ী ফিরিতাম। জোড়াসাঁকোতে একটি ছোট ঘর ছিল। সেখান হইতে মেঘ ও বর্ষা দেখা যাইত। প্রায়ই আমরা তিনজন সেখানে বসিতাম। কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর বর্ষার কবিতা আবৃত্তি করিতেন এবং বর্ষার গান গাহিতেন, আর লোকেন্দ্রনাথ পালিত (তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু) ইংরাজি, ফরাসী ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় সেই কবিতাগুলির সমভাবাপন্ন কবিতা আবৃত্ত করিতেন এবং বুঝাইয়া দিতেন। আমি মুগ্ধবৎ ন্যায় তন্ময় হইয়া শুনিতাম। লোকেন্দ্রনাথ বলিতেন—জগতের কোন ভাষায় রবীন্দ্রনাথের বর্ষার কবিতা ও বর্ষা সংগীতের তুলনা নাই

আর একটি ঘটনার কথা বলি। প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ একবার কুমায়ুন প্রদেশের রামগড় পর্বতের উচ্চ দেশে একটি বাড়ি ক্রয় করিয়া কয়েক মাস সেখানে থাকেন। আমাকে তিনি কয়েকদিন তাঁর সঙ্গে রামগড়ে থাকিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি লক্ষ্ণৌ হইতে রামগড়ে ছুটিলাম। একদিন বৈকালে প্রবল বেগে বর্ষা নামিল এবং অনেক রাত্রি পর্যন্ত অবিরাম বৃষ্টি হইল। সেদিন আমাদের বর্ষার আসর বসিল। বৈকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি প্রায় দশটা পর্যন্ত কবি একাধারে বর্ষার কবিতা পাঠ করিলেন আর বর্ষার গান গাহিলেন। সেদিনটি আমি কখনও ভুলিব না। রাত্রি আটটার সময় খাবার প্রস্তুত। কবির কন্যা ও পুত্রবধূ দ্বারে দাঁড়াইয়া আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। কবির কিংবা আমাদের আহারের ভ্রূক্ষেপ নাই। বর্ষাগীতের মাদকতা আমাদের বাহ্যজ্ঞান রহিত করিয়াছে, ক্ষুৎপিপাসা তিরোহিত হইয়াছে, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় কবির বর্ষার গান ও বর্ষার কবিতা শুনিতেছি। অফুরন্ত তাঁর বর্ষার ভাণ্ডার। আকাশ অবিশ্রান্ত বারি বর্ষণ করিতেছে—আর কবি অবিশ্রান্ত সুধা বর্ষণ করিতেছেন। এ প্রসঙ্গে একটা হাসির কথা মনে হইতেছে। সে আসরে একবার রবীন্দ্রনাথ আমাকে আদেশ করিলেন—'অতুল, তোমাদের দেশের একটা হিন্দী গান গাও ত হে'। আমি গাহিলাম—'মহারাজা, কেওরিয়া খোলো, রসকি বুঁদ পড়ে।' সময়োপযোগী বলিয়া সকলের সে গানটি ভাল লাগিল। কবি সে গানটি আমার সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন। আমাদের সকলকেই বর্ষার মোহ আচ্ছন্ন করিয়াছে। এমন কি সংগীতে অজ্ঞ রেভারেণ্ড অ্যানড্রুজ

সাহেবকেও এই গানের ছোঁয়াচে ধরিল, তিনি আমার সঙ্গে অদ্ভুত উচ্চারণ করিয়া এবং ততোধিক বেসুরো কণ্ঠস্বরে আমাদের সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন, মহারাজ, কেওড়িয়া খোলো। তাঁর সংগীতের আকস্মিক উচ্ছ্বাস রোধ করা দুষ্কর দেখিয়া আমরা তাঁহাকে বাধা দিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিলাম না।

সেবারে রামগড়ে কবির গান রচনার একটি স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিলাম। তিনি যে ঘরে শুইতেন, আমার শয্যা সেই ঘরেই ছিল। আমি লক্ষ করিতাম, তিনি প্রত্যহ ভোর না হইতেই জাগিতেন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বেই তিনি বাটির বাহির হইয়া যাইতেন। একদিন আমার কৌতূহল হইল। আমিও তাঁহার অলক্ষিতে তাঁহার পিছু পিছু গেলাম। আমি একটি বৃহৎ প্রস্তরের অন্তরালে নিজেকে লুকাইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তিনি একটি সমতল শিলার উপর উপবেশন করিলেন। সেখানে বসিলেন তার চৌদিকে প্রস্ফুটিত সুন্দর শৈল কুসুম। তাঁর সম্মুখে অনন্ত আকাশ এবং হিমালয়ের তুঙ্গ গিরিশ্রেণী। তুষার-মালা বালরবি-কিরণে লোহিতাভ। কবি আকাশ ও হিমগিরির পানে অনিমেষ তাকাইয়া আছেন। তাঁহার প্রশান্ত ও সুন্দর মুখমণ্ডল ঊষার মৃদু আভায় শান্তোজ্জ্বল। তিনি গুনগুন করিয়া তন্ময় চিত্তে গান রচনা করিতেছেন—'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর'। আমি সে স্বর্গীয় দৃশ্য মুগ্ধ নয়নে দেখিতে লাগিলাম এবং তাঁর সেই অনুপম গানটির সদ্য রচনা ও সুরবিন্যাস শুনিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ তাহা দেখিলাম ও শুনিলাম এবং তিনি নামিয়া আসিবার পূর্বেই পালাইয়া আসিলাম। আর একদিন প্রাতে শুনিলাম তিনি তেমনি করিয়া গান রচনা করিতেছেন—'ফুল ফুটেছে মোর আসনের ডাইনে বাঁয়ে, পূজার ছায়ে।' এরকম করিয়া প্রায় প্রতি প্রাতে লুকাইয়া তাঁর গান রচনা শুনিতাম আর কবীর বরপুত্রের সেই দেবমূর্তি হিমালয়ের কোলে উপবিষ্ট দেখিতাম। একদিন ধরা পড়িয়া গেলাম। পালাইয়া আসিবার সময় তিনি আমাকে দেখিয়া ফেলিলেন। সুচতুর কবি বুঝিলেন যে, গোপনে আমি তার গান শুনিতেছিলাম। তিনি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'অতুল, এখানে এত ভোরে যে? কোথায় ছুটে যাচ্ছ?' আমি দেখিলাম ধরা পড়িয়াছি, আর উপায় নাই। বলিলাম—'লুকিয়ে আপনার গান শুনছিলাম।' তার দু' তিন দিন পরে তিনি যখন আমাদের শুনাইলেন—'এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর'—আমি বলিলাম—'ওই গানটি আমি পূর্বেও শুনেছি।' তিনি বলিলেন

—'পূর্বে কি করে শুনলে? আমি ত মাত্র দু' তিনদিন হল ওই গানটি রচনা করেছি।' আমি বলিলাম—'রচনা করবার সময়েই শুনেছিলাম।' কবি বলিলেন—'তুমি ত ভারি দুষ্টু, এইরকম করে রোজ শুনতে বুঝি?' আমরা সকলেই খুব হাসিলাম।

রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের আবেগ অন্তঃসলিলা। বাহিরে সচরাচর প্রকাশ হয় না। সে কয়দিন রামগড়ে তাঁহার অন্তর্নিহিত আবেগের বহিঃপ্রকাশ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। তাঁর শিশুর মত হাসি, দ্রুতগতি ও আনন্দোচ্ছ্বাস বড়ই মনোরম বোধ হইতেছিল। একদিন বৈকালে বাহিরে বসিয়া আমরা চা ও গৃহজাত নানাপ্রকার সুখাদ্যের সম্ভোগে ব্যস্ত ছিলাম, কবি হঠাৎ পিছন হইতে আসিয়া 'অতুল এস' বলিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। তাঁহার কন্যা ও পুত্রবধূ বলিয়া উঠিলেন—'বাবা ও কি। অতুলবাবুর যে খাওয়া এখনো শেষ হয়নি।' 'তা হবে এখন' বলিয়া সঙ্গে লইয়া চলিলেন। তাঁহার বালকের মত উৎসাহ আমার বড় মধুর লাগিল। আমি আগ্রহে সঙ্গে চলিলাম। তিনি অনতিদূরে লইয়া গিয়া পরম রমণীয় পত্রপুষ্প-শোভিত একটি সুন্দর নির্জন স্থান আমাকে দেখাইলেন। সত্যই মুগ্ধ হইবার মত সে স্থান। তিনি বলিলেন,—'আমি রোজ এখানে আসি, এখানে বসি, গান গাই এবং গান রচনাও করি।' আমি অনুরোধ করিবামাত্র কয়েকটি গান সেখানে বসিয়া আমাকে শুনাইলেন। কি যে ভাল লাগিয়াছিল বলিতে পারিনা। ফিরিয়া আসিলে কবির কন্যা বলিলেন,—'বাবা, তোমার যে কাণ্ড, অতুলবাবুকে না খাইয়ে কোথায় এতক্ষণ ধরে রেখেছিলে?' তিনি বলিলেন,—'অতুলকে জিজ্ঞাসা কর্।' আমি বলিলাম, 'আমি সেখানে খুব ভাল জিনিস খেয়ে এসেছি।' কথাটা প্রকাশ হওয়ায় সকলে খুব হাসিলেন।

কবির অন্তরে একটি নৃত্যশীল শিশু আছে, সে ভিতরেই নৃত্য করে। তাঁহার গীতি-কবিতা বোধহয় সেই নৃত্যেরই বিকাশ। জননী প্রকৃতি বোধ হয় সেই গীতনৃত্যশীল শিশুকে সস্নেহে ডাকিয়াছিলেন। তাই সে বাহির হইয়া আমাদিগকে শৈলমন্দিরের অঙ্গনে দেখা দিল।

রামগড়ের সে দশ দিনের অবিরাম আনন্দ ও গীতোৎসব কখনও ভুলিব না। আমাদের জয়ন্তী উৎসব তেমনি আনন্দে সরস ও সার্থক হোক। তাঁর ভক্তবৃন্দ

আমরা তাঁর আরও দীর্ঘায়ু কামনা করি। অমর কবি বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতিকে অমর করিয়াছেন। তিনি জগতের কাব্য-সাহিত্যকেও অমর করিয়াছেন। সেই অমর কবিকে আমরা আজ ভক্তি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিয়া কৃতার্থ হই।

রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ। দিল্লী।
উত্তরা, মাঘ ১৩৩৮

রবীন্দ্রজয়ন্তী

রবীন্দ্রনাথের ভক্তবৃন্দ,

অদ্যকার রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবের সভাপতির উচ্চাসনে বসাইয়া আপনারা যে অভাবনীয়ভাবে আমাকে সম্মানিত করিলেন তজ্জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আজ প্রাতে এলাহাবাদে আসার পর বন্ধুবর জষ্টিস্ লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে জানাইলেন যে আমাকে এই পদ গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব হইতে তাই প্রস্তুত হইয়া আসিতে পারি নাই। ক্ষমা করিবেন।

আপনারা সকলেই জানেন যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অসামান্য ও বহুমুখী। তিনি বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠতম কবি বলিলে বেশি অত্যুক্তি হয় না। গদ্য-সাহিত্যেও তাঁহার স্থান কাহারও নিম্নে নহে। প্রবন্ধ সমালোচনা ছোটগল্প উপন্যাস নাটক ইত্যাদি সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। বৈচিত্র্যে তাহার সমকক্ষ সাহিত্যিক বোধহয় আজকাল জগতে কেহই নাই। তিনি অশ্রান্ত কর্মী, জননেতা, চিন্তানায়ক, বিশ্বের মহান বার্তাবাহক। বিধাতা যেন অন্যমনস্ক হইয়া তাঁহার বিচিত্র দান-সম্ভার রবীন্দ্রনাথকে নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন, মনে হয় যেন তাঁর সম্বন্ধে বিধাতা একটু পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন। বাহিরে এবং ভিতরে কোন দিক দিয়াই তিনি বঞ্চিত হন নাই। বাল্যে, যৌবনে, প্রৌঢ়াবস্থায় এমনকি বার্ধক্যেও তার মত *সুদর্শন* পুরুষ খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁর চেহারা দেখিলেই লোক আকৃষ্ট হয়। তাঁর হস্তলিপি এত *সুন্দর* যে আজ শিক্ষিত বাঙালিরা অনেকেই তাঁর হস্তাক্ষর অনুকরণ করেন দেখিতে পাই।

আমি আজকার সভায় কবির এমন দু'একটি কুশলতার কথা বলিতে চাই যা হয়ত সাধারণের কাছে বিদিত নয়। আমি তাঁর আলাপ-কুশলতার কথা কিছু বলিব। আমি তাঁর মত সুনিপুণ কথা-কুশলী পুরুষ জীবনে দেখি নাই। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর কথোপকথন জগতে বিরল তাঁর আলাপ তাঁর গানের চেয়ে কোনও অংশে কম চিত্তাকর্ষক নয়।

প্রথমে তাঁর আলাপ-মাধুর্যের নজিরের দিকটার কথা বলি।

তিনি সুকণ্ঠ। তাঁর আলাপের কণ্ঠস্বরেই শ্রবণ তৃপ্ত হয়। কেহ কেহ বলেন তাঁর কণ্ঠস্বর একটু মেয়েলী, কেননা তা গুরুগম্ভীর নয়। কিন্তু গুরুগম্ভীর না হইলেও বড় শ্রুতিমধুর।

তাঁর শব্দোচ্চারণ অতি সুন্দর ও সুস্পষ্ট। তিনি যখন দ্রুত কিংবা অনর্গল কথা কহেন তখনও প্রত্যেকটি কথা খুব স্পষ্ট শোনা যায় ও বোঝা যায়। তাঁর কথা কহিবার ভঙ্গিও বড় চমৎকার। ইংরাজীতে যাকে modulation বলে তাঁর কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণে তা যথেষ্ট থাকাতে তাঁর আলাপ বড় শোভন ও শ্রুতিমিষ্ট হয়।

কথা কহিতে কহিতে তাঁর মুখসৌষ্ঠব যেন আরও উজ্জ্বলভাব ধারণ করে। তাই নয়ন ও কর্ণ দুই একসঙ্গে মুগ্ধ হয়। নয়ন ও কান দুই দিয়াই তাঁর কথা শুনিতে হয়।

তাঁর আলাপ শ্রবণ মন ও হৃদয়ের পরম সম্ভোগের বস্তু।

তাঁর কথোপকথনের ভাষা উৎকৃষ্ট সাহিত্য। সে ভাষা সহজ ও সরল হইলেও খুব মার্জিত ও উপযোগী। যেমন লিখিত সাহিত্যে তেমন আলাপের ভাষায় এমন শোভন ও উপযোগী শব্দ ব্যবহার করেন, মনে হয় যেন পূর্বে কেহ বাংলাভাষায় এমন সুন্দর করিয়া মনোভাব প্রকাশ করেন নাই। কেহ কেহ মনে করেন তাঁর পূর্বেকার কবিতার তুলনায় তাঁর আজকালকার কবিতা বুঝিতে পারা তত সহজ নয়। তা যেন মনোজগতের বড় উচ্চস্তরের ভাষা, সাধারণের ততটা বোধগম্য নহে।

কিন্তু আলাপাদিতে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করিবার ভাষা ও ভঙ্গি সরল ও সহজবোধ্য।

তিনি কখনও বাংলা ভাষায় আলাপ করিবার সময় বিদেশী ভাষা ব্যবহার করেন না।

আমাদের 'খামখেয়ালী' নামে একটি সভা ছিল। খেয়ালী সভার একটি নিয়ম ছিল—প্রত্যেক বিদেশী শব্দের জন্য একআনা জরিমানা। শুধু রবিবাবু জরিমানা দেন নাই। সামান্য কথাবার্তাতেই চিন্তাশক্তি প্রকাশ পায় ও মৌলিকতারও পরিচয় দেয়।

সামান্য আলাপেও তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, চিন্তাশীলতা ও মনস্বীতার পরিচয় পাই। এমন কোন বিষয় নাই যে সম্বন্ধে লোক তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়া নূতন কিছু শিখিতে না পারে বা আনন্দ না পায়। আমি অনেক সময় অবাক হইয়াছি তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধির শক্তির বৈচিত্র্য দেখিয়া এবং সাধারণ আলাপেও তাঁর অদ্ভুত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা দেখিয়া। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, ধর্মনীতি

এমন কি দৈনন্দিন জীবনের খণ্ড খণ্ড ঘটনা সমূহেও তাঁর আলাপে তাঁর বুদ্ধিশক্তির বিচক্ষণতা ও মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁর আলাপের এক প্রধান আকর্ষণ হাস্যরস। সে হাস্যরস নির্দোষ, সূক্ষ্ম ও মনোজ্ঞ। সে হাস্যরসে একটুও তরলতা নাই। অথচ সামান্য কথাও এমন গুছাইয়া এবং রস-সংযোগ করিয়া বলেন যে তাতে যেমন আনন্দ পাওয়া যায় তেমনি তাঁর বচন-কুশলতায় মুগ্ধ হইতে হয়।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে এমন সর্বাঙ্গসুন্দর সর্বগুণসম্পন্ন, এমন প্রতিভাশালী মহাত্মার জন্ম আমাদের বাঙালি জাতির মধ্যে হইয়াছে। আজ তাঁর গরবে আমরা গরবী। তিনি বিশ্বসাহিত্যে বাংলা ভাষাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। আজ তাঁরই জয়ন্তী উৎসবে আমরা আনন্দ প্রকাশ করি এবং তাঁকে আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি জানাই। তিনি এখন সত্তর বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন, বিশ্বনিয়ন্তা তাঁকে আরও দীর্ঘায়ু করুন। দীর্ঘকাল বাঁচিয়া রবীন্দ্রনাথ বাঙালির, ভারতবাসীর, বিশ্বমানবের গৌরব-বর্ধন করুন।

রবীন্দ্র জয়ন্তী [illegible]। [illegible]।

উত্তরা, কার্তিক ১৩৩৮

অবিনাশচন্দ্র মজুমদার

লাহোর নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মৃত্যুতে আমরা আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছি। বহির্বঙ্গীয় বাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কানপুরে জন্মগ্রহণ করেন। সিমলা-শৈলস্থিত সোলন নগরে কিছুদিন হইল তাঁহার দেহান্ত হয়। তাঁহার ন্যায় ধর্মপ্রাণ, পরহিতকামী, সেবানিষ্ঠ সাধুপুরুষ বাংলার বাহিরে কেন বাংলাদেশেও বিরল। আশা করি তাঁহার একটি সুসম্পূর্ণ জীবনী শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। আমরা জানি যে তিনি শুধু প্রবাসী বাঙালিদের প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন তাহা নহে, এ-দেশবাসীরাও তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিত ও ভালবাসিত। তিনিও বাঙালি ও এ-দেশীয়দিগকে সমভাবে ভালবাসিতেন ও তাঁহাদের সেবা করিতেন। এ বিষয়ে তিনি প্রবাসী বাঙালিদের আদর্শ ছিলেন।

জীবনের অধিককাল তিনি পাঞ্জাবেই যাপন করিয়াছিলেন। শিখভাষায় ও শিখ ধর্মশাস্ত্রে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিযাছিলেন। সোলনে যখন তিনি অত্যন্ত পীড়িত এবং এ রোগের উপশম হইবে না জানিতেন তখনও তিনি নিয়মিতরূপ শিখ-গুরুদেব বাণী ও গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেন এবং বাংলা ভাষায় উহার অনুবাদ করিতেন। তাঁহার শিখ-গ্রন্থের অনুবাদ বাংলা ভাষার একটি সম্পদ। এ সম্বন্ধে 'উত্তরা' তাঁহার নিকট বিশেষরূপে ঋণী; কেন না আমাদের পত্রিকায় তাঁহার অনূদিত গুরু তেগবাহাদুরের বাণী ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। আশা করিতেছিলাম যে 'উত্তরা'য় তাঁহার অপ্রকাশিত শিখ-গ্রন্থের অনুবাদ আরও অনেক বাহির হইবে। এ আশা পূর্ণ হইবে কিনা জানিনা।

তিনি বাংলা, গুরুমুখী ও হিন্দীভাষা খুব ভালরূপ জানিতেন। এ তিন ভাষায়ই তিনি অতি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়া লোকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিতেন।

তিনি সর্বদা সাধুচেষ্টায় কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে একথা যথার্থ যে, তিনি জীবনের এক মুহূর্তও অপব্যয় করিতেন না। চাকুরী করিয়া যে সময়টুকু অবসর পাইতেন নানাবিধ দেশহিতকর কার্যে তাহা ব্যয় করিতেন। সুরাপান নিবারণ, সামাজিক কুআচার বর্জন, 'পবিত্র হোলী'র অনুষ্ঠান করিয়া লোকের মনোরঞ্জন ইত্যাদি হিতসাধনের অনুশীলনে তিনি রত থাকিতেন। এবং সেজন্য পাঞ্জাবে সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত।

চাকুরী ছাড়িয়া দিবার পর তিনি ধর্মসাধন ও পর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি একজন পরম ঈশ্বরপ্রেমী ভক্ত ছিলেন। তাঁহার হৃদয়স্পর্শী ধর্মোপদেশে অনেকেই মুগ্ধ ও উপকৃত হইতেন। সর্বোপরি জাতি ও বর্ণনির্বিশেষে দরিদ্র ও দুঃখীদের সেবা তাহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। যেখানেই থাকিতেন সেখানেই নানা হিতকর অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন।

ভূমিকম্পে যখন কাঙ্গড়া উপত্যকায় বহু লোক গৃহহীন ও নিঃসম্বল হইয়া নিতান্ত কষ্ট পায়, তখন অনিন্দ্যকর্মী অবিনাশচন্দ্র যেরূপভাবে সেখানে আর্ত ও বিপন্নের সেবা ও সহায়তা করিয়াছিলেন, সেরূপ পরসেবা সচরাচর দেখা যায় না। সেই শ্রমেই তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গের প্রথম সূচনা হয়। ১৯০৭ সালে যখন যুক্তপ্রদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয় তখন তিনি তথায় যাইয়া দুর্ভিক্ষক্লিষ্টের সেবা করেন। অযোধ্যার অন্তর্গত বারহাইচ নগরে সে সময় তিনি একটি অনাথালয় স্থাপন করেন। তথা হইতে গ্রামে গ্রামে যাইয়া নিরন্নকে অন্ন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, পীড়িতকে ঔষধ দান করেন এবং সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েন।

সিমলার পাশে ধরমপুরে আজকাল যে যক্ষ্মারোগীদের জন্য অনেক স্বাস্থ্য-নিবাস স্থাপিত হইয়াছে তাহার প্রধান উদ্যোক্তা সাধু অবিনাশচন্দ্র।

নিতান্ত পীড়িত হইয়া যখন তিনি সোলনে অবস্থান করিতেন তখন তিনি প্রত্যহ রোগীকে ঔষধের ব্যবস্থা দিতেন এবং তাহা বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন। রোগ-যন্ত্রণায় নিজে কষ্ট পাইলেও তিনি রোগীকে বিনা ঔষধে ফিরিয়া যাইতে দিতেন না। দূর দূর হইতে আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহার কাছে চিকিৎসার জন্য আসিত। তিনি যেরূপ স্নেহ-সম্ভাষণে দরিদ্র ও পীড়িত পাহাড়ীদের সঙ্গে আলাপাদি করিতেন তাহাতে তাহারা রোগযন্ত্রণা ভুলিয়া যাইত। তাঁহার পরলোকগমনে আজ সোলনবাসীরা সকলেই নিতান্ত দুঃখিত।

স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় একজন নমস্য সাধক ও সেবক ছিলেন। প্রবাসী বাঙালি চিরকাল তাঁহার গর্ব করিবে এবং শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে স্মরণ করিবে।

উত্তরা। ফাল্গুন ..

সম্ভাষণ

স্বাগত সুধীমণ্ডলী,

আপনারা লখনৌ নিবাসী বাঙালিগণের বিনম্র নমস্কার গ্রহণ করুন। অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে সাদরে অভিনন্দন করিতেছি। এ সাহিত্যোৎসবে যোগদান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। আপনাদের অভ্যর্থনা ও আতিথ্যের যথোচিত আয়োজন করিতে পারি নাই; সে ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাহিতেছি।

হয়ত আপনারা ভাবিয়াছিলেন যে, নবাব-প্রধান লখনৌ সহরে নবাবোচিত সৌজন্য ও আতিথ্যের বিপুল ব্যবস্থা হইবে। সত্য, এককালে লখনৌ নগর প্রচুর সুখ স্বচ্ছন্দতা, মনোরম সৌজন্য ও অপরিমেয় আতিথেয়তার জন্য সর্বত্র খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। একদিন সচ্ছল-অবকাশ-সাপেক্ষ মধুর সংগীতে এদেশ ঝঙ্কৃত হইত; ঐশ্চর্য-পরিপুষ্ট শিল্পকলা এদেশে সকলের মনোরঞ্জন করিত; লখনৌর রাজগণ যদিচ কুক্কুট কিম্বা বটের সংগ্রামে যেরূপ পারদর্শী ছিলেন রাজ্য-শাসন বিষয়ে তদ্রূপ দক্ষ ছিলেন না তথাপি তাঁহাদের অধিকাংশই উদারচেতা ও মুক্তহস্ত ছিলেন। মচ্ছিভবনের অধিষ্ঠাতা নবাব আসফদ্দৌলা সাহেবের দানশীলতা এরূপ জনবিশ্রুত ছিল যে, এখনও চৌকের কোন কোন বণিক প্রাতে আপনার বিপণিদ্বার উদ্ঘাটন করিবার পূর্বে এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করে:

জিস্‌কো ন দে মৌলা উস্‌কে দে আসফদ্দৌলা।

অর্থাৎ—যাহাকে ভগবান বঞ্চিত করেন, আসফদ্দৌলা তাহাকেও বঞ্চিত করেন না।

জনপ্রবাদ আছে যে, লখনৌর উদ্যানের অপূর্ব শোভা ও পুষ্পসম্পদ ভূতকালে নন্দনেও এত খ্যাতি লাভ করিয়াছিল যে, একদা নন্দনের উদ্যানপালক লখনৌর কুসুম-সম্ভারের শোভা নিরীক্ষণ করিবার জন্য লালায়িত হইলেন; এবং দেবগণের অনুমতিক্রমে কিছু দিনের জন্য অবসর গ্রহণ করিয়া মর্ত্যভূমের উদ্যানভূমি লখনৌ নগরে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু অনতিকাল পরে স্বর্গরাজের নিকট এই মর্মে পত্র লিখিলেন—'দেবরাজ, ক্ষমা করিবেন; আমি আর নন্দনে ফিরিতে পারিব না।' কিন্তু যেদিন হইতে লখনৌর বাদসাহ 'ছোর চলে লখনৌ নগরী', যেদিন হইতে পাশ্চাত্য সভ্যতার শোষণ যন্ত্র এদেশের বক্ষস্থলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, সে দিন হইতে কমলার অনুকম্পা ক্রমেই হ্রাস হইয়া

আসিতেছে, বিশ্বকর্মাও অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমাদের অভ্যর্থনার দারিদ্র্য সেই অপহৃত বৈভবের অনুকৃতি মাত্র। 'ভুখা নবাবের' দেশে ভুখা বাঙালির নিমন্ত্রণ তাই এত সাজসজ্জাহীন।

কিন্তু যদিচ লখনৌর পুরাতন গৌরবরশ্মি নিতান্ত হীনপ্রভ হইয়াছে তথাপি এই মহানগরী সম্পূর্ণ হৃতশ্রী হয় নাই। এখনও এদেশ শস্যশ্যামলা, এখনও পূতসলিলা বঙ্কিমগতি গোমতী তাহার শীতল আলিঙ্গনে এদেশকে সুশীতল করিতেছে। এখনও লোহিতাভ সন্ধ্যায় যখন লখনৌর সমাধি-সৌধের উচ্চ মুকুট এবং শৃঙ্গাবলী আকাশপটে চিত্রিত হয় তখন গত গৌরবের ধূসর স্মৃতিতে আমাদের নয়ন মধুর বিষাদে আর্দ্র হয়। যদিও প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞগণ লখনৌ নগরী হইতে চিরবিদায় লইয়াছেন তথাপি এখনও লখনৌর রাজপথ পথচারীর সুললিত সংগীতে মুখরিত। এখনও সুকবিগণ তাঁহাদের মধুর 'মারসিয়া' সংগীতে হিন্দু মুসলমান-নির্বিশেষে সকলের চিত্তবিনোদন করেন। এখনও 'মুসায়েরা' সম্মিলনে ধনী ও দরিদ্র, সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত কাব্যামোদিগণ একাসনে বসিয়া একপাত্রে কাব্যসুধা পান করেন। পুরাতন শিল্পকলা ও কারুকার্য যদিও এখন নিঃশেষপ্রায় তথাপি তাহার ক্ষীণাবশিষ্ট এখনও বিদ্যমান। যদিও মুসলমান-রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সভ্যতার প্রাতপত্তি প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে তথাপি এখনও অসামান্য সৌজন্য, উর্দুভাষার অপূর্ব সৌষ্ঠব, কথোপকথনের মোহন প্রণালী, মনোহারী ভাষাবিন্যাস ইত্যাদি সভ্যতার বাহ্যিক নিদর্শন তিরোহিত হয় নাই। অত্যন্ত সুখের বিষয় এই যে, আমাদের লখনৌ নগরী উত্তরোত্তর পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভের পথে অগ্রসর হইতেছে। হয়ত অচিরে লখনৌ নবীন সম্পদে সম্পন্ন এবং নবীন গৌরবে গৌরবান্বিত হইবে।

তিন বৎসর পূর্বে কানপুরের কতিপয় সাহিত্যপ্রেমী বাঙালি বহির্বঙ্গে বাংলা সাহিত্যের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার একান্ত আবশ্যকতা অনুভব করিয়া এই সাহিত্য-সম্মিলনের সূচনা করেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। যাহারা এই মহৎ ব্রত সাধনের প্রথম পথপ্রদর্শক তাঁহাদের মধ্যে আমাদের পরমবন্ধু কানপুরের জনপ্রিয় শুভকর্মী লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় অন্যতম। তৎপর-বৎসর ভাগীরথী তীরে পুণ্যভূমি কাশী নগরে তথাকার সাহিত্যানুরাগী ও উদ্‌যোগী বাঙালিগণ বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের এক চিরস্মরণীয় মহাসভার অনুষ্ঠান করেন। বর্তমান সাহিত্য-জগতের শ্রেষ্ঠতম কবি অতুল-প্রতিভাসম্পন্ন বাংলার কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সে সাহিত্যযজ্ঞের পৌরোহিত্য গ্রহণ

করিয়া সে অনুষ্ঠানের সফলতা সম্পাদন করেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার অপূর্ব অভিভাষণে শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

গত বৎসর গঙ্গাযমুনার সন্ধিস্থলে পবিত্র প্রয়াগনগরীতে এই সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হয়। সেখানকার কৃতী ও সাহিত্য-সেবী বাঙালিগণ অতি সুচারুরূপে সম্মিলনের কার্য সুসম্পন্ন করেন। বাংলা সাহিত্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রবাসীকুলগৌরব শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সে সভার সভাপতিত্বে বৃত হন; কিন্তু অসুস্থতা-নিবন্ধন তিনি সে সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই; তাঁহার মনোরম ও সারগর্ভ অভিভাষণ সভাস্থলে পঠিত হয়। তাঁহার অনুপস্থিতির জন্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় সভাপতির কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

এ বৎসর লখনৌ সে সৌভাগ্যের অধিকারী। কাশী কিম্বা প্রয়াগের ন্যায় এ নগর তীর্থভূমি নহে; তথাপি এ প্রদেশ পুণ্যভূমি। পূর্বদিকে পুণ্যতোয়া সরযূর উপকূলে রঘুকুলমণির রাজধানী অযোধ্যা নগরী—অধুনা দেবমন্দির-সমাকুল তীর্থভূমি। পশ্চিমে গোমতীতীরে মহাভারত-রচয়িতা ঋষিকুলপুঙ্গব বেদব্যাসের পবিত্র তপোবন নৈমিষারণ্য। উত্তরে দেবত্রাতা আত্মত্যাগের চরম আদর্শ রাজর্ষি দধীচির সমাধিভূমি এবং তীর্থসমূহের মিশ্রণভূমি মিশ্রিখ। দক্ষিণে পূতসলিলা জাহ্নবী। কেন্দ্রস্থলে বিনয়াবতার লক্ষ্মণদেবের রাজধানী ক্ষুদ্রগ্রাম লক্ষ্মণপুর—যে স্থলে আজ বৃহৎ লখনৌ মহানগরী বিরাজিত। আমরা অযোগ্য হইলেও ভারতীর পূজার জন্য এদেশ অযোগ্য নহে।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এ ভারতীর পূজায় ভারতীয় বরকন্যা ভারতী-সম্পাদিকা অধিনায়িকার পদ গ্রহণ করিয়াছেন। বহুকাল প্রবাসে থাকিয়া, কর্মসাধনার পঞ্চধারার মধ্যেও যে তিনি বাংলা-সাহিত্য-সেবা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন ইহা প্রবাসী বাঙালিদের পক্ষে বিশেষ শ্লাঘার বিষয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই বিদুষী মহোদয়ার নেতৃত্বে ও সস্নেহ পরিচর্যায় আমাদের এই প্রবাসী সাহিত্য-শিশু স্বাস্থ্য ও সৌষ্ঠবে বর্ধিত হইবে।

আমাদের এই নবীন শিশুটি আমাদের এত আদরের যে ইতিমধ্যেই ইহার একাধিকবার নামকরণ হইয়া গিয়াছে। প্রথম ইহার নাম রাখা হয় 'উত্তর-ভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন।' গত বৎসর ইহাকে 'প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যদি এ সম্মিলন 'বাংলা'র বহির্ভূত বাঙালি মাত্রেরই সম্মিলন হয় তবে উহাকে 'উত্তর ভারতীয়' বলা সংগত নহে; কেন না

মধ্য-ভারত ও দক্ষিণ ভারতে বাঙালি বাস করেন, তাঁহারাও এ সম্মিলনের সভ্যপদের অধিকারী।

'প্রবাসী' নামটি অপেক্ষাকৃত সুপরিচিত ; কিন্তু এ নামটিও সম্পূর্ণ নিরাপত্তিতে গ্রহণ করা চলে না ; ইহার কারণ প্রধানতঃ এই যে, এদেশে বহুসংখ্যক বাঙালি এমন আছেন যাঁহারা দীর্ঘকাল হইতে এবং বংশপরম্পরায় এখানে স্থায়িভাবে বাস করিতেছেন ; তাঁহাদিগকে ঠিক প্রবাসী বলা চলে কি না সন্দেহ। তারপর 'প্রবাসী' শব্দ দূরত্বব্যঞ্জক ও আগন্তুকতার পরিচায়ক। বাঙালি এবং এদেশবাসী আমরা সকলেই ভারতমাতার সন্তান, সুতরাং ভারতে বাস করিয়া নিজেকে 'প্রবাসী' বলা সমীচীন বোধ হয় না। আমরা নিজবাসভূমে পরবাসী নহি, বরঞ্চ যদি আমরা নিজেকে পরবাসভূমে নিজবাসী বলিয়া মনে করিতে পারি তবেই প্রশস্ততার সমর্থন করা হইবে। তবে নামকরণ লইয়া আমি পুনবায় মতান্তর কিম্বা আলোচনার সৃষ্টি করিতে চাহি না। সম্মিলনের সদুদ্দেশ্য সিদ্ধিই আমাদের মুখ্য সাধনা, নামকরণ অতিশয় গৌণ।

এমন বাঙালি বোধ হয় কেহই নাই যাঁহারা সাহিত্য সম্মিলনের উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দিহান। এদেশবাসী আমরা অনেকেই বহুকাল হইতে মাতৃভাষার প্রচার ও প্রসার সাধনকল্পে ও বাঙালিজাতির উন্নতি ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা মানসে সম্মিলিত চেষ্টার আবশ্যকতা বিশেষভাবে অনুভব করিয়া আসিতেছি। ভগবৎ কৃপায় আমাদের এ উদ্দেশ্য ফলবতী হইবার পূর্বাভাস দৃষ্টি-গোচর হইতেছে। কিন্তু আমাদের এ সম্মিলনকে স্থায়ী ও হিতপ্রদ করিতে হইলে যে নিরলস সাধনা ও দলবদ্ধ প্রয়াসের প্রয়োজন তাহা আমাদের ন্যায় জীবিকান্বেষী ও নিরবসর বাঙালির সাধ্যায়ত্ত কি না সে সম্বন্ধে মনে দ্বিধা উপস্থিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। তথাপি প্রবাসী বাঙালিদের হৃদয়ে অধুনা মাতৃভাষার প্রতি যে নবীন অনুরাগের উদ্দীপনা দেখিতেছি তাহাতে আশা হয় যে, আমাদের এ নব-প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যমন্দির নিতান্ত ভঙ্গুর হইবে না।

অভিনন্দন সমিতির সম্ভাষণে বাংলা-সাহিত্য সম্মিলনের সার্থকতা এবং বহির্বঙ্গে বাংলাভাষা ও বাংলা-সাহিত্যের প্রচার ও উৎকর্ষতা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়ত সুশোভন হইবে না। কেবল সংক্ষেপে আমার দুই একটি বক্তব্য নিবেদন করিবার অনুমতি চাহিতেছি।

প্রবাসী বঙ্গসন্তানগণের অন্ততঃ বৎসরান্তে একবার সাহিত্যোৎসবে সম্মিলিত হওয়ার সফলতা বহুবিধ। সামাজিকতার দিক দিয়া বিচার করিলেও ইহার

উপকারিতা অতি সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। সামাজিক পরিচয় ও আত্মীয়তার সাফল্য হয়ত কেহই অস্বীকার করিবেন না। অথচ প্রবাসী বাঙালি আমরা অনেকেই পরস্পরের নিকট অপরিচিত। বরঞ্চ অনেক স্থলে বাংলাদেশের বাঙালিদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ অধিকতর ঘনিষ্ঠ। আমাদের অভাব, আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির অন্তরায়, ভবিষ্যৎ উন্নতির পন্থা, আত্মরক্ষার এক উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু একত্র হইবার সুযোগ না থাকায়, পরিচয় ও ভাববিনিময়ের অভাবে আমরা বিচ্ছিন্ন, পরস্পরের সহায়তা হইতে বঞ্চিত, সুতরাং আমরা দুর্বল। যদি সাহিত্যসূত্রে আমরা কখনও কখনও একত্র হইতে পারি এবং আমাদের শুভাশুভের আলোচনা করিবার অবসর পাই তবে আমাদের সমূহ লাভ, ইহা সকলেরই স্বীকার্য।

প্রবাসে বাংলা-সাহিত্যের প্রচার ও উন্নতিসাধন করিতে হইলে সাহিত্য-সম্মিলন অপরিহার্য। এদেশে সাহিত্যসাধনা কি প্রকারে হইতে পারে, কোন পন্থা প্রশস্ত সে সম্বন্ধে বিবেচ্য বিষয় অনেক আছে, তন্মধ্যে মাত্র দু-একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।

সর্বপ্রথমে আমাদের কর্তব্য প্রবাসে বাঙালি বালক বালিকাদিগের বাংলা-শিক্ষার সুব্যবস্থা করা। যেখানে বহু সংখ্যক বাঙালির বাস সেখানে সুপরিচালিত বাংলাস্কুল সংস্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক। তাহা ব্যয়সাপেক্ষ সন্দেহ নাই, কিন্তু যদি সকলে নিজের উপার্জনের এক ক্ষুদ্রাংশও এ উদ্দেশ্যে ব্যয় করেন, তবে তথায় অন্ততঃ মেয়েদের একটি পাঠশালা উত্তমরূপে চলিতে পারে।

প্রবাসে বাঙালিদের বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বোধ হয় নিতান্ত অল্প হইবে না, কিন্তু যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার খুব সুবন্দোবস্ত আছে এরূপ বিদ্যালয় বিরল। তাহার কারণ এ বিষয়ে আমরা কথঞ্চিৎ অলস ও উদাসীন। যাহাদের সংগতি অল্প তাহারা যদি আপন পুত্রকন্যাদের শিক্ষার ব্যয় বহন করে তাহা হইলেই যথেষ্ট। কিন্তু যাহাদের সাংসারিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল, তাহাদের এ সম্বন্ধে গুরুতর দায়িত্ব আছে। তাহাদের দরিদ্র বাঙালি ভাইয়ের পুত্র-কন্যারা যদি অর্থাভাবে বাংলাভাষা শিক্ষা করিতে না পারে তাহা হইলে তাহাদের সাংসারিক স্বচ্ছন্দতা নিরর্থক।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা দেব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বংশধর, স্বর্গীয় তারকনাথ পালিত এবং রাসবিহারী ঘোষের স্বজাতি। আমাদের

নিকট বিদ্যা বিতরণ বিষয়ে দানশীলতার পরম সার্থকতা কেবলমাত্র শাস্ত্রের অনুশাসন নহে · উহা প্রত্যক্ষীকৃত সত্য। বাঙালি জাতির মধ্যে এ ব্রতে সিদ্ধ স্বার্থত্যাগী পুরুষের অভাব নাই।

তৎপর, বাঙালি জনসাধারণের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের প্রচার করিতে হইলে, যেখানে যেখানে সম্ভব বাংলা পুস্তকাগার সংস্থাপন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। লাইব্রেরি সংক্রান্ত একটি কথা নিবেদন করা যুক্তিসংগত মনে করি। পুস্তকালয়ের উদ্দেশ্য পাঠকসাধারণের মধ্যে সুশিক্ষা বিস্তার করা। যে সাহিত্যপাঠে মনের উচ্চবৃত্তিগুলি পরিস্ফুট হয় সেই সাহিত্যপাঠে পাঠক-সমাজকে প্রলুব্ধ করাই পুস্তকাগারের মুখ্য উদ্দেশ্য। জনসাধারণ যাহা পাঠ করিতে চায় শুধু তাহা সংগ্রহ করাই পুস্তকাগারের কর্তব্য নহে, উহা পুস্তকবিক্রেতার লক্ষ হইতে পারে। লঘু সাহিত্যের প্রতি স্বতঃই লোকের আকর্ষণ অধিক, যে সাহিত্য চিন্তাশক্তিকে সক্রিয় করে তৎপ্রতি সাধারণের দৃষ্টি অল্প। তাই সচরাচর পুস্তকাগারে গল্প ও উপন্যাসের বাহুল্য দেখিতে পাই। সে বিষয়ে আমাদের একটু সতর্ক হওয়া আবশ্যক। বাংলা ভাষায় সুখপাঠ্য সদ্‌গ্রন্থের অভাব নাই; লোকের মনোরঞ্জন করিতে হইলেও কেবলমাত্র হা হুতোস্মপূর্ণ কিম্বা রোমাঞ্চক সাহিত্যের শরণাপন্ন হইবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু আজকাল লঘু সাহিত্য যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং যেরূপ ত্বরিতগতিতে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে মনে আশঙ্কা হয়, গল্প-সাহিত্যের অসামান্য কলেবর বৃদ্ধি দেখিয়া মনে ভীতির সঞ্চার হয়। আজকাল একশ্রেণীর ছোটগল্পের প্রাবল্য দেখা যায়। এগুলিতে প্রশংসার যোগ্য যদি কিছু থাকে তাহা এই যে, সেগুলি ছোট। পাঠক-সমাজকে বিশেষতঃ পাঠাগার-সংস্থাপকদিগকে এ সাহিত্যের প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষার জন্য সচকিত হইতে অনুরোধ করি। বাংলা সাহিত্যে অনেক অমূল্য রত্ন রহিয়াছে। এ রত্নভাণ্ডার ক্রমেই নূতন ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যশালী হইতেছে। অতি অল্পকালের মধ্যে সুলেখক ও সুসাহিত্যিকের সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। পাঠক-সমাজকে আজকাল অন্য সাহিত্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না। প্রায় সকল প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয় আমাদের বাংলাভাষায় লিখিত হইয়াছে এবং হইতেছে। তবে আমাদের সাহিত্যের পরিমাণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবর্জনাও বাড়িতেছে; সুতরাং প্রবাসী পাঠক-সমাজের একটু সাবধান হওয়া আবশ্যক। এক প্রকার নব্যসাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে তাহার গতিবিধি আমার নিকট শিব কিংবা সুন্দর মনে হয় না। উহার ভাব ভাষা ও

ভঙ্গি আমাদের সাহিত্যকে লঘু করিতেছে। উহার ভাব নিতান্তই প্রচ্ছন্ন, ক্ষীণ এবং কখনও কখনও মলিন; ভাষা অযথা উদ্বেলিত ও তরল, ভঙ্গি অন্যের অনুকারী এবং কৃত্রিম। এ দলের সাহিত্যিকেরা এবং এ সাহিত্যের পাঠকেরা না বুঝিতে পারার আনন্দে বিভোর। মহাকবি কালিদাস হইলে বলিতেন—"ইহাদের বাক্ আছে অর্থ নাই; পার্বতী আছে পরমেশ্বর নাই।" প্রবাসী পাঠকবর্গ এবং নবীন সাহিত্যিকেরা যেন এ সাহিত্যের মোহে মুগ্ধ না হন।

প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে সাহিত্য-সাধনার একটা প্রবল ইচ্ছা দেখা দিয়াছে, তাহার ফলে বাঙালিবহুল কাশীনগরী হইতে কয়েকখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে 'অলকা' অলখিত, প্রবাস-জ্যোতি নির্বাপিত প্রায়। সম্প্রতি সাহিত্যপ্রেমী শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী কাশীধাম হইতে 'প্রবাসী-বাঙালি' নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা বাহির করিতেছেন। আমি তাঁহার সাহিত্যোৎসাহের প্রশংসা করি এবং তাঁহার সুলিখিত পত্রিকার স্থায়িত্ব কামনা করি।

আমি কিন্তু তাহাকে একটি মনোরম ও সারগর্ভ মাসিক পত্রিকা সম্পাদন বিষয়ে সহায়তা করিতে অনুরোধ করিতেছি। পত্রিকাখানি সচিত্র হইবে। উত্তর-ভারতে আজকাল একাধিক খ্যাতনামা বাঙালি চিত্রশিল্পী বাস করেন। আমার বিশ্বাস, এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার, শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকিল প্রমুখ চিত্রবিদ্যাবিশারদ বাঙালিদের সহায়তা অনায়াসে পাইতে পারি। সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক বন্ধুবর ডাক্তার রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন এরূপ আশা করি। পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ, লখনৌ এবং লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অনেক সুযোগ্য বিদ্বান্ বাঙালি অধ্যাপনার কাযে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা অনেকে সাহিত্যিক ও সুলেখক। তাঁহারা কষ্ট স্বীকার করিলে অনেক সারগর্ভ প্রবন্ধাদি এ পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে পারে। ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়; যদুনাথ সরকার প্রমুখ প্রবাসী ঐতিহাসিকেরা এদেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধীয় অনেক অনাবিষ্কৃত তথ্য প্রকাশিত করিতে পারেন। যাঁহারা উর্দুভাষায় পারদর্শী তাঁহারা দাগ, গালিব, জোখ, আমির, আতস, রতননাথ, আকবর, হালি প্রভৃতি সুকবিগণের কাব্যভাণ্ডার হইতে রত্নসঞ্চয় করিয়া আমাদের বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন। যাঁহারা হিন্দি ভাষায় সুশিক্ষিত, তাঁহারা তুলসীদাস, সুরদাস, কবীর, বিহারীদাস, কেশবদাস, ভূষণ, মীরাবাই, রসখান, পদ্মাকর, রহীম, হরিশ্চন্দ্র, প্রতাপ, শ্রীধর পাঠক প্রমুখ প্রসিদ্ধ হিন্দি কবিগণের কাব্যকুসুম হইতে

মধু আহরণ করিয়া আমাদের মধু-চক্রটিকে আরও মধুময় করিতে পারেন। এদেশের তীর্থাদি, এদেশের জনপ্রবাদ, এদেশের লোকাচার ইত্যাদি সাহিত্যের প্রকৃষ্ট উপকরণ যথেষ্ট বিদ্যমান। আমার ধারণা এসব উৎকৃষ্ট উপাদান অবলম্বন করিয়া যদি একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রবাসে নিয়মিতরূপে সম্পাদন করা যায় তাহা হইলে বহির্বঙ্গীয় বাঙালিগণের মাতৃসাহিত্যসেবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করা হইবে, সাহিত্য-প্রেমীদিগকে মাতৃভাষায় প্রবন্ধ ও কবিতাদি রচনা করিতে উদ্বুদ্ধ করা হইবে। প্রবাসী বাঙালিদিগের জাতীয়তা রক্ষা ও উন্নতিসাধন বিষয়ে চিন্তাশীলেরা এ পত্রিকায় আলোচনা করিবেন।

বাংলা-সাহিত্য আমাদের অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া আরও সমৃদ্ধ হইবে। আমি এ বিষয়ে সাহিত্য-সম্মিলনের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

প্রবাসী বাঙালির আর একটি দায়িত্ব আছে যাহা সাহিত্যসেবী বাঙালিদের মনে রাখা কর্তব্য। যাহাতে বাঙালিজাতি ভিন্ন এ-দেশীয়দের মধ্যেও বাংলা সাহিত্যের প্রতিপত্তি ও প্রসার সংসাধিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে আমাদিগকে যত্নবান হইতে হইবে। আপনারা লক্ষ করিয়া থাকিবেন যে আধুনিক হিন্দি ভাষা অনেকটা বাংলাভাষার অনুকরণে গঠিত হইতেছে। হিন্দি, মারাঠি, গুজরাটি ভাষায় বাংলা-সাহিত্যের বিস্তর গ্রন্থাদি অনূদিত হইয়াছে—বিশেষতঃ বাংলার গল্প ও উপন্যাস। আমার বোধহয় বাংলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠগ্রন্থগুলি দেবনাগরী অক্ষরে প্রকাশিত করিলে এবং অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যের উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলি সংক্ষিপ্ত টিকাসহ বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত করিলে আদান-প্রদানের দ্বারা বাংলা-সাহিত্যের সম্পদবৃদ্ধি ত করা হইবেই, অন্যান্য ভারতীয় ভাষাকেও আমাদের বাংলা-সাহিত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত করা হইবে। আজকাল ভারতের অন্য প্রদেশীয় সাহিত্যিকেরা বাংলা-সাহিত্য সাদরে শিক্ষা করিতেছেন। হয়ত কালে আমাদের বাংলা-সাহিত্য বিশ্বভারতের সাহিত্য হইবে। প্রবাসী বাঙালিদের যত্ন ও অধ্যবসায় দ্বারাই আমাদের এ অভিষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে।

প্রবাসী বন্ধুগণ, আপনাদিগের সহিত মিলিত হইয়া আজ আমি কৃতার্থ বোধ করিতেছি। সম্মিলনের শুভ ফল অবশ্যম্ভাবী—যদি আমরা আমাদের গুরুতর দায়িত্ব সকল ভুলিয়া না যাই। মনে রাখিবেন—আমাদিগকে বঙ্গবাণীর পূজার জন্য নূতন উপচার সংগ্রহ করিতে হইবে। নূতন ভূষায় তাঁহাকে ভূষিত করিতে হইবে; বিবিধ সাহিত্যকুসুম হইতে পরিমল সংগ্রহ করিয়া আমাদের মধুভাণ্ডারকে আরও মধুর করিতে হইবে। সাহিত্যসম্রাট রবীন্দ্রনাথ আজ বিশ্বজগতে

আমাদের সাহিত্যকে যশস্বী করিয়াছেন। ভারতেব দেশ-বিদেশে প্রবাসী বাঙালিগণ বাংলা-সাহিত্যের মহৎ বার্তা বহন করিবেন এবং প্রচার কবিবেন। আমাদের সাহিত্য সত্য; আমাদেব সাহিত্য শিব; আমাদের সাহিত্য সুন্দর। এই সত্য-শিব-সুন্দবের মন্দির ভাবতেব সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত কবিতে হইবে। বাঙালির সর্বোচ্চ সম্পদ তাহাব সাহিত্য; ইহাকে সযত্নে রক্ষিত ও বর্ধিত করিতে হইবে।

সাহিত্য-প্রেমী বন্ধুগণ, আমবা বহুদিন পরে প্রবাসে বঙ্গবাণীর উৎসব-মন্দিরে স্থাপন কবিলাম। পুবোহিত কিম্বা উপাসকেব অভাব হইবে না, কিন্তু ইহাকে চিবস্থায়ী কবিতে হইলে হৃদযের ভক্তি চাই। গভীব নিষ্ঠা চাই, প্রচুব ধৈর্য চাই, নতুবা আমাদেব সাহিত্য-সাধনা নিষ্ফল হইবে। ক্ষণিক উৎসাহ কিম্বা ভাবুকতায় আমাদেব অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না, কাযতৎপবতা, অধ্যবসায, শৃঙ্খলা, স্বার্থত্যাগ, পরার্থপরতা এ সদ্‌গুণ সমূহেব সমাবেশ হইলে তবে আমবা সকল মনোবথ হইব। ভগবৎচবণে প্রার্থনা কবি, তিনি আমাদেব সাহিত্য-সেবা সর্থক করুন।

পুনবায আমি শ্রদ্ধা-সহকাবে প্রতিনিধি মহোদযগণকে আমাদেব সাদব সম্ভাষণ জানাইতেছি। আপনারা ভক্তিভরে ভাবতীব পূজায় প্রবৃত্ত হউন।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনে
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির সম্ভাষণ। লক্ষ্ণৌ।
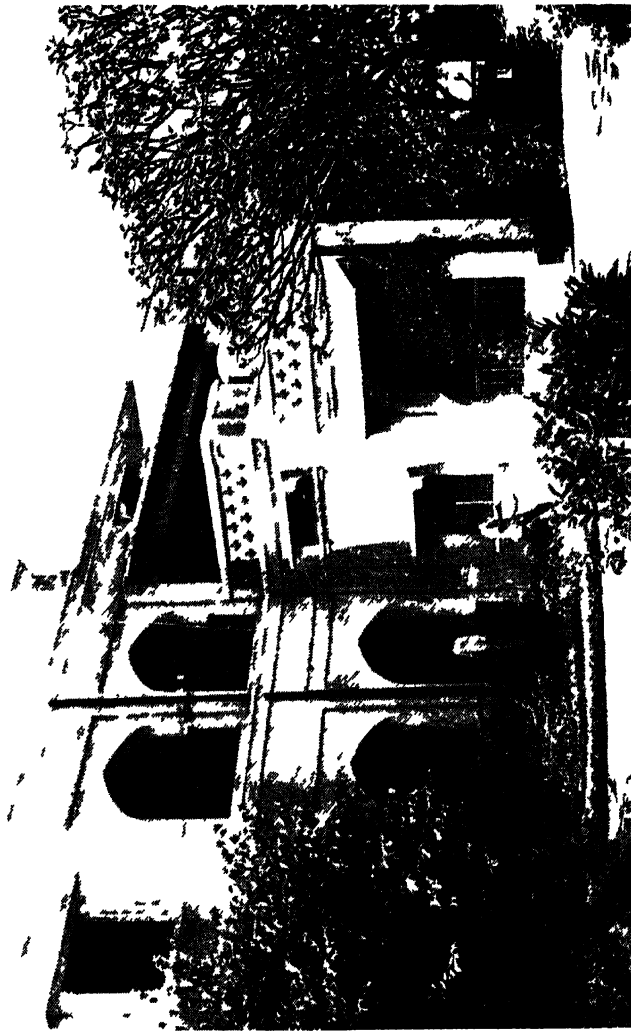
উত্তরা, আশ্বিন ১৩৩২

অতুলপ্রসাদের স্ব-ভবন লখনৌ

আলোকচিত্র শ্রীচিত্রজিৎ রায়

লখনৌতে অতুলপ্রসাদের গৃহের বৈঠকখানা

আলোকচিত্র শ্রীচিত্রজিৎ ঘোষ

অভিভাষণ

প্রিয় সুহৃদ্বর্গ
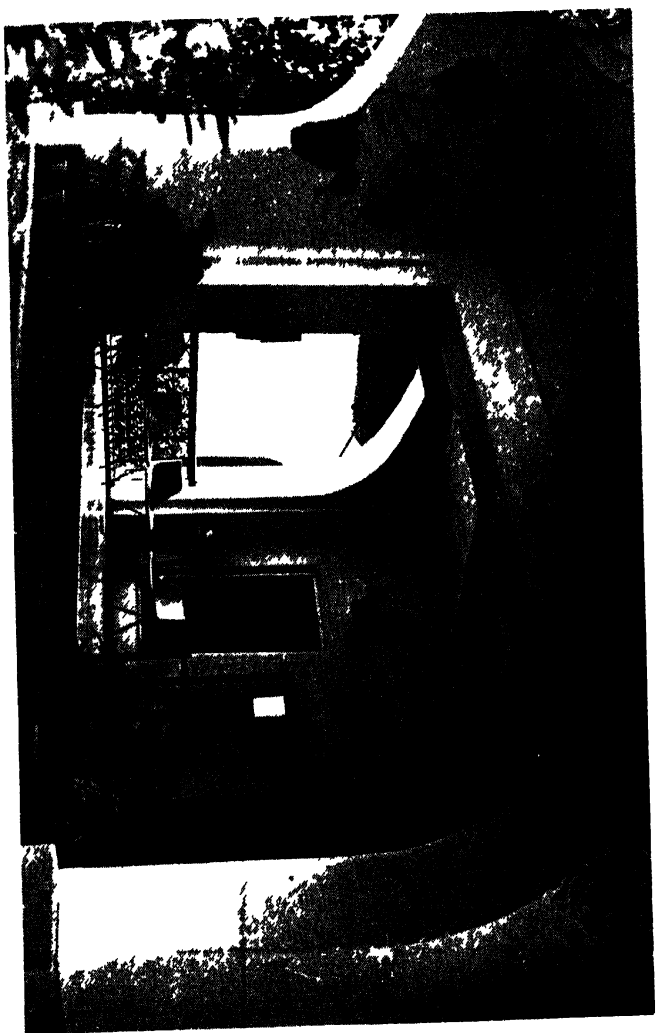
ডা ক্তা রে র অনুশাসন পালন করলে আমার আসা হ'ত না কিন্তু এতবার নানা কারণে এ সম্মেলনের উৎসবে অনুপস্থিত হয়েছি যে এবারে কর্তব্যের অনুরোধে ত বটেই লজ্জার খাতিরেও আপনাদের সাদর নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারলাম না, এসে হাজির হয়েছি। আমার সভাপতিত্বের ও অভিভাষণের ত্রুটি মার্জনা করবেন এ আশা রাখি বলেই আসতে সাহসী হয়েছি।

যদি বলি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তাহ'লে একটা মামুলি প্রথার কথা বলা হবে, যদিও কথাটা অতি সত্য। তার চেয়ে সত্যি কথা হবে আমি আমার বাঙালি ভাই-বোনদের প্রাণের ভালবাসা জানাচ্ছি, আর যাঁরা আমার বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁদের শ্রদ্ধা অর্পণ করছি। আমি আপনাদের কাছে আসতে পেরে, আপনাদের আনন্দে ও সাহিত্য সেবায় যোগ দিতে পেরে বড় সুখী হয়েছি।

যে উচ্চাসন আজ আপনারা আমায় দিলেন তার যোগ্য আমি নই তা আমিও জানি, আর আপনারাও জানেন। আর যদি না জানেন তাহলে জানতে বেশি বিলম্ব হবে না। আমি যে এ আসন গ্রহণ করেছি তা সম্মানের উচ্চাসন বলে নয়; স্নেহের আসন বলে। সম্মানের সিংহাসনের চেয়ে স্নেহের কোল উঁচুতে। আজ আপনারা আমাকে দেশমাতার কোলে স্থান দিয়েছেন; মাতৃভাষার অঙ্কে বসিয়েছেন; তাই আমার আজ এত গর্ব। বাংলা ভাষাকে সম্বোধন করে আমি একদিন লিখেছিলাম—'মা তোমার কোলে তোমার বোলে কতই শান্তি ভালবাসা।' প্রাণের কথাই লিখেছিলাম।

যাক্, ভূমিকা সংক্ষেপেই শেষ করি।

আমি কয়েকটি সোজা কথা নিতান্ত সোজা ভাষায় আপনাদের কাছে নিবেদন করব। আমরা যে বাংলার বাইরে এতগুলি বাঙালি প্রতিবৎসর একত্রিত হই, এবং বাংলা দেশের প্রতিষ্ঠাপন্ন বাঙালিদের এ অনুষ্ঠানে আহ্বান করি এবং তাঁদের নেতৃত্ব কামনা করি; তার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে আমরা আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশের সঙ্গে এবং মাতৃসাহিত্যের সঙ্গে যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে চাই এবং সে বন্ধন আরও দৃঢ়তর করতে চাই। যদিচ আমরা বাংলাদেশের

বাইরে বাস করি, তবু নিজেদের প্রবাসী বলতে আমি সংকোচ বোধ করি। ভারতে বাস করে ভারতবাসী নিজেকে পরবাসী কি করে বলবে? সেটা বড়ই অশোভন। তাই আমি প্রথম থেকেই প্রবাসী আখ্যার বিরোধী। একবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার এ সম্বন্ধে কথা হয়; তিনিও 'প্রবাসী' নামের পক্ষপাতী নন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'বহির্বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন' বল্লে কিরকম হয়। তিনি বলেছিলেন—বেশ ভাল কথা, 'বহির্বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন' বলতে পার অথবা 'বঙ্গেতর সাহিত্য সম্মেলন' বলতে পার। যদিও আমাদের এ সম্মেলনের একাধিকবার নাম পরিবর্তন হয়েছে তবু আমি এ বিষয়ে পরিচালক-বর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তবে একথা বলতেই হবে 'প্রবাসী' নামটা চলে গেছে, কেমন যেন ছাড়ানো যায় না। প্রবাস কথাটার মানে হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলা দেশের বাইরে। প্রবাসী নামে যত কিছুই আপত্তি উত্থাপন করি না কেন এ কথা স্বীকার করতেই হবে বাংলাদেশ আমাদের আপন দেশ, আমাদের মাতৃভূমি, বাংলাভাষা আমাদের মাতৃভাষা। প্রতি বৎসর এ সম্মেলন আমাদের এ কথাটি নূতন করে যেন মনে করিয়ে দেয়। এদেশকে আমরা আপন দেশ বলে মনে করব, কিন্তু জন্মভূমি যে সকল দেশের চেয়ে আপন তা ভুললে চলবে কেন? তাতে এদেশকে একটুও অবজ্ঞা করা হয় না। আমরা অনেক স্ত্রীলোককে 'মা' বলে সম্বোধন করি, তাতে মাতৃত্বের গৌরব বৃদ্ধি পায়, কিন্তু যে মা পেটে ধরেছে সে মা কিন্তু অন্য মাদের চেয়ে একটু পৃথক; সে জননী, শুধু মা নয়। বাংলাদেশ আমাদের জননী একথাটি মনে রাখা বড় দরকার। এ সম্মেলনে প্রতি বৎসর আমরা যেন আমাদের সেই সুজলা সুফলা 'মা'টিকে সম্মিলিত-ভাবে স্মরণ করি।

লখনৌর সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনের জন্য যে উদ্বোধন সংগীত রচনা করেছিলাম তাতে লিখেছিলাম:

সুজলা সুফলা ওগো শ্যামা।
ওগো বাঙালির হৃদি-রমা।
ভোলেনি তোমায় ভোলেনি মা,
তোমার প্রবাসী সন্ততি।

সেদিন আমার দেশের কয়েকটি ভাই আমাকে তাদের নবজাত পত্রিকার জন্য একটি কবিতা বা গান লিখে পাঠাতে বিশেষ করে অনুরোধ করেছিলেন।

তখন আমার দেশের গ্রামখানির কথা মনে পড়ে গেল। সেই পদ্মানদীর ধার, সেই খোলা মাঠ, খোলা প্রাণ; পাখির গান, বকুল ফুল, হরির লুটের বাতাসা, মায়েদের ভালবাসা, ছেলেদের সঙ্গে খেলা, সব মনে পড়ে গেল। আমার সেই মিষ্টি দেশটি আমার চোখের সামনে আমার প্রাণের সামনে ভাসতে লাগল, ভাল করে মনে হ'ল আমি ভুলিনি, ভুলিনি আমার দেশমাতাকে যদিও প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর সে গ্রামখানিতে যাইনি। দূর দেশে থাকলে কি হবে, মার টান বড় টান। তাই মনে করে একটি কবিতা অল্পদিন হ'ল সেই দেশের পত্রিকার জন্য লিখে পাঠিয়েছিলাম। তা উদ্ধৃত করলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সে গানটিতে নিজেকে প্রবাসী বলেই উল্লেখ করেছিলাম ক্ষমা করবেন।

প্রবাসী, চল্‌রে দেশে চল
আর কোথায় পাবি এমন হাওয়া,
এমন গাঙের জল।

যখন ছিলি এতটুক্,
সেথাই পেলি মায়ের সুধা ঘুম-পাড়ানো বুক,
সেথাই পেলি সাথীর সনে বাল্য-খেলার সুখ,
যৌবনেতে ফুটল সেথাই হৃদয় শতদল।
—প্রবাসী, চলরে দেশে চল্।

হরির লুটের বাতাসা আর পৌষ-মাসের পিঠা,
পীরের সিন্নি, গাজির গান, আর কলিম ভাইয়ের ভিটা,
আহা মরি সেই স্মৃতি আজ লাগছে কত মিঠা।
শিউলি, বেলি, কদম, চাঁপা এমন কোথায় বল।
—প্রবাসী, চল্‌রে দেশে চল।

মনে পড়ে দেশের মাঠে খেত-ভরা সব ধান,
মনে পড়ে তরুণ চাষির করুণ বাঁশীর তান,
মনে পড়ে পুকুর-পাড়ে বকুল গাছের গান,
মনে পড়ে আকাশভরা মেঘ ও পাখির দল।
—প্রবাসী,চল্‌রে দেশে চল।

যদিও এ-দেশও আমাদেরই দেশ, এদেশেই আমরা অনেকে ঘর বেঁধেছি; নানা কাজে এদেশেই নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি, এদেশের লোকদের বড় আপন মনে হয়, তাদের স্নেহ করি, তাদের স্নেহ পাই, তাদের সেবা করে আনন্দ পাই,

কৃতার্থ হই, হয়ত এদেশেই ছাইটুকু রেখে যাব, তবু—তবু—সেই যে বড় বড় নদীর দেশ ; বর্ষা ও ঝড়ের দেশ, সেই যে ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ট আমার ভাই-বোনগুলি, সেই যে ভাটিয়ালী, বাউল ও কীর্তন গান, সেই যে ভাবপ্রবণ জাতিটি, আর সেই যে আমার অতি মিষ্ট বাংলা কথা ও বাংলা ভাষা, সে যে আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি, তাকে ত ভুলতে পারি না। বহুকাল পূর্বে ছাত্রাবস্থায় বিলাতে অদ্বিতীয়া গায়িকা মাদাম প্যেটির মুখে একটি গান শুনেছিলাম—'Home sweet home'—তা এখনও আমার কানে ও প্রাণে মধুবর্ষণ করে।

তবে এ কথা আমাদের মনে রাখতেই হবে যে যদিও আমরা জন্মভূমি থেকে দূরে রয়েছি, তবু এদেশও আমাদেরই দেশ, এ আমাদের জন্মভূমি না হ'লেও কর্মভূমি, অন্নভূমি। এদেশই আমাদের জীবিকার সংস্থান করে দিচ্ছে। অনেক বাঙালি আছেন যাঁদের এদেশই জন্মভূমি। এদেশের অধিবাসীরা আমাদের ভাই-বোন ; ভাই-বোন ভেবেই এদের বুকে টেনে নিতে হবে। এদের অন্তরের ভালবাসা দেওয়া চাই। মনে বা মুখে এদেশের লোকেদের তাচ্ছিল্য করলে নিজেদেরই হীনতা ও অনুদারতা প্রকাশ পাবে। চাণক্য বলে গেছেন—'উদার-চরিতানাম্ বসুধৈব কুটুম্বকম্' ; মনে রাখবার কথা ; জীবনে পালন করবার কথা। এই গোরক্ষপুরের সন্নিকটেই দেবদেব বুদ্ধদেবের জন্ম ও মহাপ্রস্থানের স্থান। এই অতি পবিত্র দেশে দাঁড়িয়ে আমি আজ মানবপ্রীতির ও অহিংসার অবতার সেই মহাত্মাকে স্মরণ করে তাঁকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির অঞ্জলি অর্পণ করি। আমিও আজ ভক্তিভরে বলি 'বুদ্ধায় নমো।' তাঁর উপদেশ 'জীবে প্রীতি জীবে দয়া' যেন এদেশের বাঙালিরা কখনও না ভোলেন। সিদ্ধার্থের জন্মভূমি আজ আমাদের একথাই বলছে 'বাঙালি, মানব মাত্রকেই প্রীতির চক্ষে দেখিও ; অহিংসা, বিশ্ব-প্রীতি, জীব-সেবাই মানবের পরম ধর্ম।' হয়ত অনেকেই জানেন না যে এক সময় আমাদের বাংলা-দেশ বৌদ্ধ রাজগণের অধীনে ছিল ; বাংলাদেশে বৌদ্ধ-ধর্মের বিস্তৃত প্রভাব ও প্রসার ছিল। জানি না, আমার মনে হয় যদি বৌদ্ধধর্ম এদেশ থেকে অপসৃত না হ'ত তা হ'লে হয়ত এদেশের এত দুর্গতি হ'ত না। বৌদ্ধধর্মের সাম্য ও একজাতীয়তা ভারতবাসীকে এত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'তে দিত না। যে সাধনার উপায়গুলি বুদ্ধদেব নির্দেশ করে গিয়েছেন তা আজ আবার আমাদের মনে করবার দিন এসেছে—সদ্দৃষ্টি, সৎসঙ্কল্প, সদ্বাক্য, সদ্ব্যবহার, সদুপায়ে জীবিকা অর্জন, সৎচেষ্টা, সৎস্মৃতি। আমি আমাদের বাঙালি ভাই-

বোনদের বিশেষ করে আজ এ উপদেশ কয়টি মনে রাখতে অনুনয় করি। তাহ'লে আমরা এদেশীয়দের সঙ্গে সখ্যভাব রক্ষা করে চলতে পারব।

এখন আমাদের নিজেদের কথা দু' একটা বলি।

প্রথম কথাই হচ্ছে বহির্বঙ্গীয় বাঙালিদের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন। এ মিত্রতার অভাব আমরা মাঝে মাঝে বেশ অনুভব করি। এ নিতান্তই আক্ষেপের বিষয়। দলাদলি এদেশের বাঙালিদের মধ্যেও বিস্তর দেখতে পাই। বিজয়ার সাম্বৎসরিক আলিঙ্গন বাঙালিকে এ অনিষ্টের কবল হ'তে মুক্তি দিতে পারেনি। বড় দুঃখ হয় দেখলে, যেখানে মুষ্টিমেয় বাঙালি সেখানেও মৈত্রীর অভাব, সেখানেও দলাদলির সৃষ্টি। যেখানে দু'শ বাঙালি সেখানেও হয়ত দুটি ক্লাব; তিনটে থিয়েটার; পাঁচটি কনসার্ট। এ যে অত্যন্ত অশোভন; তা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করবেন। এতে দলক্ষয় ত হয়-ই, বলক্ষয়ও হয়। আমরা যদি প্রীতিবদ্ধ ও দলবদ্ধ হয়ে মিলেমিশে থাকি তাহ'লে আমরা বাইরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও প্রতিযোগিতায় আরও ভালো করে নিজেদের আত্মরক্ষা করতে পারি এ কথাটি ভুলে যাওয়া আমাদের পক্ষে নিতান্ত হানিকর। আমি আমার বাঙালি ভাইদের বিশেষ করে মিনতি করি, এ দুর্ভাগ্যের হাত হ'তে নিষ্কৃতি পেতে যেন সকলেই চেষ্টা করেন।

আর একটি অতি প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ করি। বাংলার বাইরে বাঙালি ছেলেমেয়েদের প্রতি আমাদের একটি গুরুতর কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে। এদেশে তাদের বাংলা শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করতে আমাদের বিশেষ যত্নশীল হতে হবে। বহুকাল এদেশে থেকে এককালে বাঙালি ছেলেমেয়েরা প্রায় অবাঙালি হয়ে যাচ্ছিল। কেহ কেহ হয়ত বাংলা ভাষা একেবারে বলতে পারত না। আর যা বলত তা এক হাস্যাস্পদ বাংলা ও হিন্দির অদ্ভুত সংমিশ্রণ। বড়ই সুখের বিষয় আজকাল সে ত্রুটি বড় দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রবাসে সর্বত্র বাংলা-শিক্ষার সুবন্দোবস্ত চাই। বাঙালি ছেলে-মেয়েদের শুধু বাংলা লিখতে পড়তে শেখালেই যথেষ্ট হবে না। একথা সর্ববাদীসম্মত যে মাতৃভাষাই শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম বাহন। যেথায় যেথায় সম্ভব বাংলা ভাষার সাহায্যে বাঙালি ছেলেমেয়েদের অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা যাতে হয় সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ ও চেষ্টার আবশ্যক। এ কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা যেন আমরা কখনও না ভুলি।

আর একটি আমাদের প্রধান প্রয়োজন ও কর্তব্য—বাংলার বাইরে বাংলা-

সাহিত্যের সাধনা ও প্রচার। আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তোমাদের বাঙালি জাতির সবচেয়ে গর্বের বিষয় কি? আমি কোন দ্বিধা না করে তৎক্ষণাৎ আমার নিজের গানের কথায়ই বলব—'মোদের গরব মোদের আশা, আমরি বাংলা ভাষা।' ভারতের সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে যে বাংলা-সাহিত্য সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কি করে করবে। জগৎ যে সে কথা স্বীকার করে বসে আছে। আজও জগতের নানা দেশ বাংলার সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথকে সম্মান-মুকুট পরাবার জন্য লালায়িত। তারপর অকস্মাৎ আমাদের শরৎচন্দ্র এসে ভারতের সাহিত্য-সভায় প্রথম পঙ্‌ক্তিতে আসন গ্রহণ করেছেন, সকলেই বলছেন এ আসন তাঁরই প্রাপ্য। ভারতের অন্য সব কথা-সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ও গল্প অনুবাদ করে সমৃদ্ধ হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে একটি পুরাতন কথা মনে হ'ল। তখন আমি পাঠ্যাবস্থায় বিলাতে ছিলাম। ১৮৯৩ সালের কথা। ছেলেবেলা থেকেই আমার বাংলা-সাহিত্যে একটু অনুরাগ ছিল। লণ্ডনে British Museum-এর লাইব্রেরি জগদ্বিখ্যাত পুস্তকাগার, এত বড় লাইব্রেরী বোধ হয় জগতে শুধু আর একটি আছে। সেখানে আমি মাঝে মাঝে অবসর কালে পড়তে যেতাম। লাইব্রেরির ক্যাট্‌লগগুলির মধ্যে দেখি একখানা বাংলা বইয়ের ক্যাট্‌লগ। তাতে একটা জিনিস দেখে আমার খুব গর্ব হ'ল। বাংলায় যত পুস্তক ছাপা হয়েছে এবং জগতের যে যে ভাষায় বাংলা পুস্তকের তর্জমা হয়েছে তার তালিকা তাতে দেখলাম। দেখলাম বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের তর্জমা ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভাষায় তর্জমা হয়েছে। কপালকুণ্ডলার তর্জমা করেছিলেন Mr. H. A. D. Phillips, I. C. S. এবং সে ইংরাজী তর্জমা থেকে জার্মান ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় কপালকুণ্ডলা অনূদিত হয়েছে। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের কাল থেকেই জগতের সাহিত্যে বাংলা সাহিত্যের প্রতিপত্তি স্থাপিত হয়েছে। যেদিন থেকে British Museum-এ এ জিনিসটি আবিষ্কার করলাম সেদিন থেকে মাতৃসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ দশগুণ বেড়ে গেল। তারপর রবীন্দ্রনাথের ত কথাই নাই। যদি আপনারা কখনও বোলপুরে যান সেখানকার লাইব্রেরিতে দেখতে পাবেন—জগতের এমন ভাষা নেই যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথের পুস্তকাবলী অনূদিত হয় নি। দেখলে গর্বে বক্ষ স্ফীত হয়। এমন যে আমাদের ভাষা—আমাদের অপূর্ব সম্পদ, তা আমরা বঙ্গের বাইরে বাঙালিরা কি সম্ভোগ করব

না? না করলে যে পাপ হবে। তাই বলি এদেশীয় বাঙালি ভাইবোনেরা এদেশেও মাতৃভাষার পূজা সমারোহে কর। এ পূজায় যে আমাদের শুধু আনন্দ তা নয়; এ বিষয়ে আমাদের দায়িত্বও আছে। বাঙালি ছোট ছোট মেয়েরা যখন বাংলা অলঙ্কারের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে এদেশীয় অলঙ্কারও পরে, বড় মধুর দেখায়। তেমনি আমরাও এদেশীয় সাহিত্যের ভূষণ-ভাণ্ডার থেকে রত্ন সংগ্রহ করে বাংলা সাহিত্য-সুন্দরীকে নূতন ভূষণে অলঙ্কৃত করতে পারি। এদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। এক সময়ে বাংলাদেশে কোনও কোনও সাহিত্যিকেরা ফারসী সাহিত্যে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন এবং পারস্য সাহিত্যের সাহায্যে বাংলা ভাষার সৌষ্ঠব বর্ধন করতেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায় পারস্য কবিতার অনুবাদ যথেষ্ট পাওয়া যায়। হাফিজের অনেক কবিতা তিনি অনুবাদ করেছেন অথবা তা অবলম্বন করে—কবিতা লিখেছেন। 'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত হও কমল তুলিতে,—দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে'—এটি তরজমা, অথচ এ কথা ক'টি অনেক বাঙালির কণ্ঠেই শুনতে পাওয়া যায়। অনেকেই জানেন বৈষ্ণব পদাবলী বাংলা সাহিত্যের অতুল সম্পদ। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী হিন্দিবহুল। ব্রজভাষা বাঙালির ভাষা নয়, কিন্তু বাঙালির সাহিত্য। আমরা যারা বাংলার বাইরে থাকি আমাদের কর্তব্য হিন্দি, উর্দু, পারসী, গুরুমুখী ইত্যাদি ভাষার উদ্যান থেকে মধু আহরণ করে আমাদের বাংলা-সাহিত্যকে আরও মধুময় করা। লখনৌ সাহিত্য-সম্মেলনে আমি বলেছিলাম, 'যাহারা উর্দু ভাষায় পারদর্শী তাঁহারা দাগ, গালিব, জৌক, আমির, আতস, রতননাথ, আকবর, হালি প্রভৃতি সুকবিগণের কাব্যভাণ্ডার হইতে রত্ন সঞ্চয় করিয়া আমাদের বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন। যাঁহারা হিন্দি ভাষায় সুশিক্ষিত তাঁহারা তুলসীদাস, সুরদাস, কবীর বিহারীদাস, কেশবদাস, ভূষণ, মীরাবাই, রসখান, পদ্মাকর, রহিম, হরিশ্চন্দ্র, প্রতাপ, শ্রীধর পাঠক প্রমুখ প্রসিদ্ধ হিন্দি কবিগণের কাব্যকুসুম হইতে মধু আহরণ করিয়া আমাদের মধুচক্রটিকে আরও মধুময় করিতে পারেন—' এ কর্তব্যের দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সাহিত্য-সম্বন্ধে আর দু'একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। প্রবাসী সাহিত্য-সেবী বাঙালিদের প্রতি আমার দু' একটি নিবেদন আছে। অতি স্নেহ-সহকারে ও শুভ অভিপ্রায়ে আপনাদের কাছে সে নিবেদন জানাচ্ছি।

যদি কাহারও মনঃপূত না হয় তা হ'লে আমায় মার্জনা করবেন। যে নিবেদন করছি সাহিত্য-সেবীরা সে দিকে মনোনিবেশ করলে সুখী হব।

আমার মতে সাহিত্যের উপকরণ প্রধানতঃ তিনটি :—ভাব, ভাষা ও ভঙ্গি।

ভাব

যদিও আমি ভাবের নিরাময়তাব পক্ষপাতী, তথাপি আমি কখনও বলি না যে কতকগুলি হিতোপদেশই সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ। বর্তমান বাংলা-সাহিত্যে দু'একটা জিনিস দেখে একটু দুঃখিত ও শঙ্কিত হই। কয়েকটি আবর্জনা আমাদের সাহিত্য-সম্পদকে কিঞ্চিৎ পঙ্কিল করে তুলছে। কোনও কোনও লেখা অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট। আর্টের দোহাই দিয়ে, বাস্তবতার দোহাই দিয়ে সাহিত্যে অশ্লীলতা প্রচলন ও প্রচার কবলে অন্যায় করা হবে। উদীয়মান সাহিত্যিকেরা এ বিষয় একটু সতর্ক হবেন। বাস্তবতাকে বর্জন করলে সাহিত্য চলে না একথা ত' স্বতঃসিদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র কেহই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করেননি। সত্যের উপবেই সাহিত্যের আসন। তবে সব মলিন সত্য ব [illegible] বাস্তবতাই সাহিত্যেব আধার নয়। কতগুলি বাস্তবতা সুসাহিত্যে বর্জনীয়। কেননা সাহিত্যের আশ্রয় শুধু সত্য নয়, শিব ও সুন্দরও সাহিত্যের আশ্রয়। যে সাহিত্য অশিব, অসুন্দব সে সাহিত্যের যত বাস্তবতাই থাকনা কেন পবিত্যজ্য।

বর্তমান বঙ্গসাহিত্যে আব একটি ত্রুটি কখনও কখনও লক্ষিত হয়। সেটি হচ্ছে ভাবের অস্পষ্টতা। ভাবের কুজ্ঝটিকার সঙ্গে ভাষাবও বাষ্পাকুলতা দেখতে পাই। সাহিত্য যদি এত দুরধিগম্য হয় যে তাব অর্থ বুঝবাব চেষ্টা পদে পদে প্রতিহত হয় তাহলে সাহিত্য শুধু একটা সমস্যাতে দাঁড়ায়। সাহিত্যের লক্ষ বোধ হয় তা নয়। অবশ্য এ দলের লোকেবা হয়ত বলবেন, এ পাঠকের বুঝবার ক্ষমতাব অভাব, লেখকের লেখার দোষ নয়। কোনও কোনও স্থলে হয়ত একথা সত্য, কিন্তু আমার মনে হয় না যে একথা সম্পূর্ণ সত্য। কোনও কোনও স্থলে হয়ত লেখকেরা নিজেরাই ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না কি লিখছেন। তাঁদেব কাছে না বুঝতে পারা অথবা না বোঝাতে পারা সাহিত্যকলার একটা কৃতিত্ব। সেই না বুঝতে পারার আনন্দে লেখক ও পাঠক উভয়েই বিভোর। মাঝে মাঝে দেখতে পাই—ভাব যখন খুব প্রচ্ছন্ন বা আচ্ছন্ন, ভাষার আড়ম্বর ও সাজসজ্জা ততই বেশি। ভাষার আচ্ছাদন ও আভরণ এত

বেশি যে ভাবের শুভদৃষ্টির পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। সাহিত্যের উদ্দেশ্য পুরাতনকে নূতন করে দেখানো, যে নূতন ভাব-সৌন্দর্য পূর্বে চোখে পড়ে নি তা চোখের সামনে, মনের সামনে ধরা—কিন্তু দেখাতে পারা চাই, দেখতে পারা চাই। লেখক যদি শুধু নিজেই বুঝলেন, বা না বুঝলেন আর যদি পাঠকেরা অন্ধকারে পথ খুঁজে না পায় তবে সাহিত্যের সার্থকতা কি? প্রবাসের নবীন লেখকদের এবিষয়েও একটু সতর্ক হতে অনুরোধ করি। কালিদাস বলে গেছেন—বাক্য এবং অর্থ দুইয়ের সমাবেশ হ'লে তবে হরপার্বতীর মিলন হয়। সাহিত্য-সম্বন্ধেও তাই।

ভাষা

সাহিত্যের ভাষা-সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা বড় কঠিন। এ বিষয়ে গোঁড়ামি করা ধৃষ্টতা। সাহিত্যের ভাষা কিরূপ হওয়া উচিৎ সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকবেই। আমার মতে ভাষার বৈচিত্র্য সাহিত্যের সম্পদ। ইহা লেখকদের রুচি, শিক্ষা ও অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। আমি নিজে যদিও সরল ও সুস্পষ্ট ভাষার পক্ষপাতী, তবু আমি মার্জিত ও সংস্কৃতভাষা খুব সম্ভোগ করি। কাঁচা-বয়সে রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভাষার বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করেছিলেন, কিন্তু তার পরে তিনি সে সমালোচনার ভ্রম নিজেই স্বীকার করেছিলেন। যে ভাষা শ্রুতিমধুর, যে ভাষা ভাবকে সুন্দররূপে প্রকাশ করতে পারে, যে ভাষা নিতান্ত আড়ষ্ট বা অস্পষ্ট নয় তাই সাহিত্যের সমীচীন ভাষা। আমি নিজে সরল ভাষার পক্ষপাতী, কিন্তু তরল ভাষার বিরোধী। আধুনিক সাহিত্যে কখনও কখনও তরলতা লক্ষ করি। আমি নিজে লিখিত ভাষায় প্রাদেশিকতার আতিশয্য অপছন্দ করি। কলিকাতার ভাষা যদিও সাহিত্যের ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে তবু তারও আতিশয্য নিরাপদ নয়। ধরুন, যদি চট্টগ্রামবাসী কিম্বা শ্রীহট্টবাসী এবং বঙ্গের অন্যান্য স্থানের সাহিত্যিকেরা জেদ করেন তাঁদের স্থানীয় ভাষাও বাংলা সাহিত্যে চালাতে হবে তাহলে বাংলা-সাহিত্যের কি দুর্দশা হবে বুঝতেই পারেন। মনে রাখতে হবে বাংলা-সাহিত্য সমগ্র বাংলার সাহিত্য, বাঙালি যে যেখানে আছেন তাঁদেরই সাহিত্য। বড়ই গৌরবের বিষয় আমাদের বাঙালি মুসলমান ভাইদের মধ্যে অনেক সুসাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়েছে। অধিকস্থলেই তাঁদের বাংলা ভাষা বড়ই মনোরম। আমি তাঁদের রচনা খুব আদরের সহিত পাঠ করি। তাঁরা অনেকেই সাহিত্যের উচ্চস্থান অধিকার

করেছেন। তাঁরাও বাঙালি, তাই তাঁদের ভাষাও বাংলা। আমি অন্তরের সহিত কামনা করি হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্যিকদের ভাষায় যেন কোনওরূপ প্রকট পার্থক্য না এসে পড়ে। উভয়ের আদর্শের আদান-প্রদানে যেন বাংলা-সাহিত্যের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পায়।

ভঙ্গি

ভাষার ভঙ্গি অর্থাৎ style, সাহিত্যকলার এক প্রধান অঙ্গ। লেখকের ভাষায় ভঙ্গির উপর তাঁর রচনার মনোজ্ঞতা অনেক নির্ভর করে। রচনার ভাব ও ভাষা যত গুরুগম্ভীর হোক না কেন, যদি তার প্রকাশভঙ্গি মনোহর না হয় তাহলে সাহিত্য-হিসাবে সে রচনা পঙ্গু। রচন-ভঙ্গির কোন বাঁধা নিয়ম নেই। ভঙ্গির বৈচিত্র্য সাহিত্যের ঐশ্বর্য। বড় বড় সাহিত্যিক যারা তাঁদের রচনাভঙ্গি মনোহারী ও স্বতন্ত্র। যুগ-হিসাবে হয়ত সাহিত্যের style-এর অনেকটা ঐক্য ও সমতা লক্ষ করা যায়, যেমন বৈষ্ণব কবিদের যুগ, মাইকেল হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের যুগ, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ, রবীন্দ্রনাথের যুগ আর এখন শরৎচন্দ্রের যুগ। এঁদের লেখার ছাপ সমসাময়িক লেখকদের সাহিত্যের উপর পড়ে এবং সেই যুগপ্রবর্তকের style-ই সে যুগের style বলা যেতে পারে। কিন্তু সুলেখক মাত্রেরই একটা নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি আছে, যাহা অননুকরণীয়। অনুকরণের চেষ্টা বিস্তর হয় কিন্তু সফল মনোরম হওয়া তত সহজ নয়। যদিও বাস্তব অনুকরণ দুঃসাধ্য তবু সাহিত্য-মহারথীদের প্রভাব এড়ানো সাধারণ লেখকদের পক্ষে তত দরই দুঃসাধ্য। বর্তমান বাংলা-সাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের প্রভাব বাঙালি লেখকমাত্রেরই উপর অল্পবিস্তর পড়েছে। শত চেষ্টায়ও যেমন প্রকৃত অনুকরণ সহজ নয় তেমনি শত চেষ্টায়ও প্রধান সাহিত্যিকদের রচনাভঙ্গির প্রভাব এড়ানো সহজ নয়। তবু আমি নবীন লেখকদের বলি, তাঁরা যেন শুধু অনুকরণের চেষ্টা না করেন, তাঁদের নিজের প্রকাশ-ভঙ্গি যেটা আপনা হতে আসে সেটিকে যেন যত্নে রক্ষা করেন, অজ্ঞাতসারে অপরের প্রভাব পড়ে পড়ুক। সুলেখক মাত্রেরই রচনাভঙ্গির স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখা বাঞ্ছনীয় মনে করি। মুখোশ পরে নিজের আকৃতির দৈন্য অনেকদিন ঢেকে রাখা যায় না। নিজের সাহিত্যের আকৃতিকেই সুপরিমার্জিত করে, স্বাভাবিক উপায়ে তার সৌষ্ঠব বর্ধন করাই শ্রেয় মনে করি। তাতে অন্ততঃ হাস্যাস্পদ হতে হয় না। সাহিত্যের ভঙ্গি-সম্বন্ধে একথাটি আপনাদের কাছে নিবেদন করলাম।

এবিষয়ে উপসংহারে আমি গর্বের সহিত বলি, বর্তমান বাংলা সাহিত্যের যা কিছু ত্রুটিই থাক না কেন, আমাদের বাংলা-সাহিত্য ক্রমোন্নতির স্তরে আরোহণ করছে। এক সময় ছিল যখন বাংলা সাহিত্যে কয়েকজন মাত্র মহারথী ছিলেন আর বাকি সব নিতান্তই নিম্নস্তরের। আজকাল সুসাহিত্যের স্তর ও বিস্তার অনেক উঁচুতে—যাকে ইংরাজীতে বলে level। যেটি পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নতিলাভ করেছে। সেটি খুবই শ্লাঘার বিষয়। যদি কিছুক্ষণের জন্য রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, কেদারনাথ প্রমুখ সাহিত্যিকদের লেখা ভুলেও থাকা যায়, তবু সুপাঠ্য ও সুখ-পাঠ্য সাহিত্যের দৈন্য কেহ লক্ষ করবেন না। আমাদের সাহিত্যকলা নবীন সৌষ্ঠবে সুন্দর। কবিতা ও গান বাংলা সাহিত্যকে ও বাঙালি জাতিকে চিরদিন অমর করে রাখবে। এমন কবিতা-প্রিয় জাতি জগতে আছে কিনা জানি না।

বিভাতির সাগর,
গান [illegible] টর।
[illegible],
[illegible]
[illegible]।

পরিশেষে আমি আপনাদিগকে পুনরায় অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। পূর্বেই বলেছি, যে শ্রেষ্ঠ আসন আপনারা আমাকে দিয়েছেন তার আমি নিতান্ত অযোগ্য। বাংলা-সাহিত্যের ও বাঙালি সমাজের নেতৃত্বের অধিকার আমি রাখি না, সেবকত্বের অধিকার রাখি মাত্র। সেই সেবকরূপেই আমি আপনাদের নিকট উপস্থিত হয়েছি। প্রথমে যখন প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সূচনা কানপুর সহরে শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের পরিচালকতায় হয়, তখন তথায় কানপুরের বাঙালি বন্ধুবর্গ সেই সূচনা-যজ্ঞের পৌরোহিত্য করতে আমায় আহ্বান করেন। আমি সে আহ্বান শিরোধার্য করছিলাম। আবার সেই কানপুর সহরেই সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতির আসন গ্রহণ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেটি দৈবাৎ ঘটেছিল। সাহিত্য-রথী শরৎচন্দ্র সেবারের সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন। তিনি কোন কারণে অনুপস্থিত থাকায় আমার স্নেহবান বন্ধুরা সে বরমাল্য আমার গলায় পরিয়েছিলেন। এ আকস্মিক সম্মানের জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। আজ আবার আমার

গোরক্ষপুরের বন্ধুরা এ উচ্চ আসন আমায় দান করলেন। আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করুন। কায়মনোবাক্যে আমি সম্মেলনের সফলতা কামনা করি। এ সম্মেলন বাঙালি জাতির ও বাংলা-সাহিত্যের গৌরব বর্ধন করুক এই আমার হৃদয়ের একান্ত প্রার্থনা।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনীর একাদশ
অধিবেশনে মূল সভাপতির অভিভাষণ। গোরক্ষপুর।
উত্তরা, পৌষ ১৩৭০

['আমার স্মৃতিতে অতুলপ্রসাদ' রচনার অন্তর্গত পত্র-সমূহের প্রতিলিপি]

['আমার স্মৃতিতে অতুলপ্রসাদ' রচনাব অন্তর্গত পত্র-সমূহের প্রতিলিপি]

Carlton Hotel
Simla
23.6.25

প্রিয় সুরেশ

আমি সিমলায় ছুটিতে এসেছি।

[illegible]

['আমার স্মৃতিতে অতুলপ্রসাদ' রচনার অন্তর্গত পত্র-সমূহের প্রতিলিপি]

['আমার স্মৃতিতে অতুলপ্রসাদ' রচনার অন্তর্গত পত্র-সমূহের প্রতিলিপি]

Cloneley, Tank
Sumpigay Road
Bangalore
9. 7. 26.

[illegible]

['আমার স্মৃতিতে অতুলপ্রসাদ' রচনার অন্তর্গত পত্র-সমূহের প্রতিলিপি]

HEMANTANIBAS
CHARBAGH
LUCKNOW

1. 5. 27

অতুলপ্রসাদকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

অতুলপ্রসাদ সেনের পরলোকগমনের পর রচিত রবীন্দ্রনাথের যে কবিতা এই গ্রন্থের সূচনাতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে তাতে অতুলপ্রসাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রীতির স্বাক্ষর; এই প্রীতি চিঠিপত্রের সূত্রেও প্রবাহিত হয়েছিল, এখানে সেগুলি যথাসাধ্য সংগৃহীত হল। এগুলি এখনও কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়নি। কয়েকখানি উত্তরা পত্রে ১৩৩৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, কয়েকখানি শ্রীসোমেন্দ্রনাথ গুপ্ত দেশ পত্রে ১৩৭৫ বিনোদন সংখ্যায় প্রকাশ করেন। বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে এই পত্রাবলী এই গ্রন্থে সংকলিত হল।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগের স্মৃতি অতুলপ্রসাদ সেন লিপিবদ্ধ করেন তাঁর 'আমার কয়েকটি রবীন্দ্রস্মৃতি' প্রবন্ধে—এই গ্রন্থের অন্যত্র সে রচনাটি প্রকাশিত।

৩

ওঁ

১

সুহৃদবরেষু,

সসম্মানসম্ভাষণমেতৎ,

বাড়িতে রোগ তাপ লইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি; সেই কারণে আজ রাত্রে আপনার ওখানে খাইতে যাওয়া সম্ভব হইবে না আমাকে মার্জনা করিবেন। আমার ভগিনীপতি সতীশের অবস্থা অত্যন্ত সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। আপনার সহিত সাক্ষাতের পরদিন হইতেই আমার শিশুপুত্রটিও এমন পীড়িত হইয়াছে যে আমি সরলার সহিত সাক্ষাতের অবসর পাই নাই। কাল সন্ধ্যার সময় তাহার সহিত দেখা হইয়াছিল। সরলা বলে যে, গানে যোগ দিবার উপযুক্ত মেয়ের অভাব। আপনাদের পরিচিতবর্গের কাহাকেও সংগ্রহ করিয়া একবার সরলাকে জানাইতে পারেন না? আপনি জানেন আজকাল আমি প্রকাশ্যে গান গাওয়া একপ্রকাব ছাড়িয়া দিয়াছি, আমার গলা গিয়াছে—বিশেষতঃ দুই তিন দিন হইতে আমি কুইনিন খাইয়া সর্দিজ্বরের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছি। তাহার পরে ঘরে রোগের প্রাদুর্ভাবে সমস্ত রাত্রি জাগরণে যাপন করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত অবস্থায় আছি। ইতিমধ্যে পরশু একটা নতুন গান রচনা করিয়া রাখিয়াছি—যদি পছন্দ করেন কীর্তনের সুরে বসাইয়া কাহাকেও দিয়া গাওয়াইয়া লইতে পারেন—সেই গানটি এই সঙ্গে পাঠাই। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

ওঁ

কল্যাণীয়েষু শান্তিনিকেতন

আমি শান্তিনিকেতনেই আছি—এইখানেই থাকব। তুমি তোমার আমের ঝুড়ি-হাতে নিশ্চয়ই এই ঠিকানায় আসবে। আমের ঝুড়ি যদি নেহাৎ দুর্লভ হয় তবে বিনা-আমেই আসতে হবে। তোমাকে অনেকদিন দেখিনি; তোমার গান অনেকদিন শুনিনি, তোমাকে অনেকদিন গান শোনাইনি—আমার মত ব্রাহ্মণের মনের এই সমস্ত খেদ যদি না মেটাও, তবে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে' আমার দ্বারে তোমাকে অনেক হাঁটাহাঁটি করতে হবে। এছাড়া, কাজের কথা বিস্তর আছে—তোমার সঙ্গে মোকাবিলায় পরামর্শ করতে পারলে আমার অনেকটা মন খোলসা হবে। পুনর্বার উপসংহারকালে জানাচ্ছি, তোমাকে আমার নিতান্তই চাই। ইতি ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

৩

কল্যাণীয়েষু শান্তিনিকেতন

বোধকরি পূর্বজন্মে ইন্‌কম্‌ট্যাক্সের দারোগা ছিলুম। সেই পাপে এই জন্মে দেশে দেশে, জেলায় জেলায়, দ্বারে দ্বারে টাকা সংগ্রহ চেষ্টায় ঘুরছি। এম্‌নি কপাল, যৎসামান্য সোনা যা পাই, তার থেকে বাণী ঢের বেশি মেলে, পেটও ভরে না, জাতও যায়। দুঃখ এই যে, শিশুকাল থেকে লেখনী চালনাই অভ্যাস করেছি, সিঁধকাঠি চালাতে শিখিনি, সেই বিষম ভুলের ফলে এ পর্যন্ত কেবল শব্দই জম্‌চে, অর্থ জমল না। রঘুবংশের গোড়াতেই কালিদাস লিখেছেন, বাক্য এবং অর্থ পরস্পর-সংলগ্ন, এখনকার কবিদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এ-কথা মেলে না। স্পষ্টই বোঝা যায় বিক্রমাদিত্যের রাজত্বে বাক্যের সঙ্গে অর্থকে সঙ্গত করবার জন্যে কবিদের ব্যারিস্টার হবার দরকার ছিল না, তাঁদের তরফে শব্দকোষ যেমন খোলা ছিল, রাজার তরফে অর্থকোষও তেমনি অকৃপণ ছিল। যাই হোক অনুশোচনা করে' কোনও লাভ নেই, চাঁদার খাতা হাতে করে' নিয়ে বেরতে হবে। এখান থেকে বিদায় গ্রহণ কালে তুমি আমাদের কিছু ফলের আশা দিয়ে

গিয়েছিলে; দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলে' গেল, অবশেষে যখন গীতার উপদেশই আমার একমাত্র সম্বল হ'ল, যে, 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন,' অর্থাৎ 'তোমার অধিকার হচ্ছে একমাত্র খেটে মরা কিন্তু ফলের বেলা কজলীও, দশেরিও না' এমন সময় তোমার চিঠি পাওয়া গেল। তার থেকে অন্তত: এটুকু বোঝা গেল যে আগামী বৎসরে আশার ফল হয়ত ফলবে।—চেষ্টা করা যাচ্ছে এবার কলকাতায় শারদোৎসব অভিনয় করবার। রিহার্শাল চলেচে, হয়ত মন্দ হবে না। যদি তুমি এসে একবার দেখে যেতে পার তা'হলে সেই উপলক্ষে তোমারও দর্শন আমরা পেতে পারি। সময়টা হচ্ছে, ১৬ই এবং আঠারই সেপ্টেম্বর। ইতি ১৯ ভাদ্র, ১৩২৯

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

কল্যাণীয়েষু,

লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে সম্মতি দিয়েছি দক্ষিণার লোভে। আমাদের সমস্ত জামিদারিক সম্পত্তি বন্যায় ভেসে গিয়ে পথে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু পথে দাড়ানো সহজ, পাথেয় জোটানো সহজ নয়। তাই চক্রবর্তী মহাশয়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। কিন্তু তার বেশি আর কিছু সইবে না—বক্তৃতা জীবনে অনেক করেছি; এখন ছুটি নেবার সময় হয়েছে। যা হোক তোমার ওখানে গিয়ে যা হোক্ স্থির করব। আমার খাতিরে লখনৌতে শীতকালে আম ফলবে না, সে জন্য কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। নিষ্ফল হওয়া এতই স'য়ে গেছে যে, ফলের লোভ এখন আর মনে রাখিনে। কিন্তু, উপযুক্ত ঋতু উপস্থিত হ'লে যে মনের পরিবর্তন হবে না একথা বলাও শক্ত। ইতি—২৭ মাঘ, ১৩২৯।

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

৭

Mount Petit
Peddar Street
Bombay

কবিবন্ধু,

শনিগ্রহ এখনো রবিকে চালনা করে নিয়ে বেড়াচ্চে—বোধ হয় অন্তকাল পর্যন্ত এই রকমই চলবে। এখানে আধমরা হয়ে পৌঁছেচি—দু'দিন অর্ধশয্যাশায়ী হয়ে কাটিয়েছি। আজ সকালে উঠে মামুদাবাদের রাজাসাহেবকে একটি চিঠি লিখেছি—নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলুম :—

I must let you know how deeply I was touched by warm expression of symp thy with which you accepted my appeal for th Visvabharati. It has specially delighted me because of the rarity of any real understanding of its ideals which I find among my countrymen who almost rudely refuse to realise the true perspective of their country's problems in the larger background of humanity. Please accept my hearty thanks not only for the ready welcome you accorded to the ideals I beg to represent in my life's work but also because you had difficult respect for my personality not to hurt my cause with an inpatient gesture of an indifferent charity made all the more conspicuous by the high position which you and your peers in Oudh hold in India.

মামুদাবাদকে মাঝে মাঝে তাঁর প্রতিশ্রুতি যদি স্মরণ করিয়ে দিতে পার তাহলে উপকার হয়। মনে আছে তিনি বেনারসের রাজা মাধোলালকে সংস্কৃত অধ্যাপনার পাকা ব্যবস্থার জন্য লিখবেন বলেছিলেন। আর তিনি মার্চের শেষে দিল্লীতে গিয়ে চেষ্টা করবেন এমন কথাও হয়ে গেছে। সম্প্রতি বিনা বিলম্বে দু'টি জিনিস আমাদের চাই—সংস্কৃত বিদ্যার সিংহাসনে ব্রজেন্দ্রবাবুকে, আরেকটি ধর্মশালা যেখানে ভারতীয় অভ্যাগতেরা এসে স্বয়ং ব্যবস্থা করে কিছুকাল যাপন করে যেতে পারেন। বিস্তর লোক আসতে চান জায়গা দিতে পারিনে তাতে অত্যন্ত ব্যথা পাই।

সেদিন তোমার দরবারে শেষ গান গেয়ে এলুম। শেষের পরের গানের কথা সেদিন আমাকে বলেছিলে। গাড়ীতে চলতে চলতে সেই পরের গানটি বানিয়েছি —তার আরম্ভ দুই লাইন হচ্ছে :—

"তোমার শেষের গানের রেশ নিয়ে কানে চলে এসেছি,
কেউ কি তা জানে।"

একথা নিশ্চয়ই মনে জেনো, কর্তা Wheeler-এর চক্রধ্বনির রেশ কানে আনিনি—তোমার সমাদরের মধুর সুর হৃদয়ে আছে, আর আশা আছে মধুর ফলেব আকাঙ্ক্ষা যথাসময়ে মিটবে। কথাটা বিশেষ করে মনে পড়ল যেহেতু এখানে এসে পৌঁছে অবধি আমার ভাগ্যে আম পেকে উঠেছে—বন্ধুমহলে আমার লোভের কথা রাষ্ট্র হয়ে গেছে। আমিও কবুল জবাব দিয়ে বসে আছি—প্রতিবাদ করিনে। চলে এসেছি বলেই মক্কেলদের কাছে তোমার হৃদয় মন সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিও না—এই ঘূর্ণাবাযগ্রস্ত হতভাগ্যের কথা স্মরণ করে অবকাশ মত দু'একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলো। সেই দীর্ঘ নিশ্বাস হয়ত বিধাতার কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারে। ইতি ১২-৩-২৩

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

কিছুদিন থেকে ডাকে যত চিঠি আসছিল আমি দেখছিলুম তার খামের উপর লখনৌয়ের ছাপ আছে কিনা। ভূগোল খণ্ডের নানা মহাদেশ, দেশ ও প্রদেশের মুদ্রাচক্র দেখলুম, কেবল লক্ষ্মণাবতীর কোনো চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল না। মনে সন্দেহ হ'ল যে, তোমাদের সহরের সকলেই বুঝি রাজার কাছে দীক্ষা নিয়েছ, অতএব ফলের আশাই পাওয়া যাবে কিন্তু সফলতা পাওয়া যাবে না। এমন সময় তোমার পত্র এবং ফলসমেত পাত্র এসে পৌঁছল। ১১৯টা পাওয়া গেছে, সে জন্যে প্রধানতঃ তোমাকে ধন্যবাদ দেব, না, রেলপথের সদারদের, তা বলতে পারি নে।

আগামী কাল কলকাতায় যাচ্ছি। আগামী ২৮।২৯।৩০শে জুলাই বিসর্জনের অভিনয় হবে—আমি তাতে আবদ্ধ আছি। তুমি দেখ্‌তে আসতে পারবে ত ?

এই সমস্ত উপদ্রব নিয়ে কলকাতায় দীর্ঘ কাল কাটাতে হবে। যদি আসতে পার.ত বিশেষ খুশি হব। আমাকে শীঘ্রই কিছুকালের জন্যে দূর দেশে যেতে হবে, এই কারণে তোমাদেব কাছ থেকে বিদায নিয়ে যেতে চাই। ইতি তারিখ জানিনে।

তোমাদেব
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

৭

কল্যাণীয়েষু,

আজকাল হাঙ্গার স্ট্রাইক চলছে কিন্তু মৌনব্রত এখনো বাষ্ট্রনৈতিকবা স্বীকার করেননি—ব্যাবিস্টারদেব তো কথাই নেই। তাই তোমাব স্তব্ধতা দেখে মনে হচ্ছে ছুটিতে আছ বলেই ঐ বাকসংযম—অন্ততঃ এখন তোমাব বাক্যেব সঙ্গে যথেষ্ট অর্থের সংযোগ নেই। মনে সংকল্প ছিল বিজয়া দশমাতে তোমাকে কবির আশীর্বাদ পাঠাব—ঠিকানাব অপেক্ষায় ছিলুম। তাবিখ একাদশীতে এসে ঠেকলো আর দেরী কববো না। বিশেষ কিছু নয়, আমাব স্বরচিত গুটিকতক বই—সম্পাদকেব সমালোচনাব জন্য নয়, সমজদাবেব সম্ভোগেব জন্যে। শেষ বেলাকাব ফসল, সুতবা আশা করি পাক ধবেছে, কিন্তু স্বাদ হয়েচে কিবকম তাব বিচার তোমাদেব পবেই বইলো। অভিমত দাবী কবে বিপদে ফেলতে চাইনে—আমাদের শাস্ত্রমতে আহাবকালে কথা কইতে নেই—কাব্য আস্বাদনকালেও সেই নিযম প্রচলিত থাকলে অশান্তিব কাবণ ঘটে না। ইতি—২৯শে আশ্বিন ১৩৩৬।

তোমাদেব
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুব

ওঁ

৮

কল্যাণীয়েষু,

একটা কাজের কথা আছে। আমাদের বিদ্যালয়ে হিন্দুস্থানী গান শেখাবার ব্যবস্থা করতে চাই অথচ পেবে উঠচিনে। অর্থের অভাবের চেয়ে লোকের অভাবই সবচেয়ে বেশি। ভাটখণ্ডের কোনো ছাত্রকে কি এই কাজে পাবার

কোনো আশা আছে? মাসে একশো টাকার বেশি বেতন দেবার সাধ্য নেই—কিন্তু যোগ্য লোক তার চেয়ে বেশি দাবী করেন তবে তা' পূরণ করবার জন্যে কোনো একটা উৎকট চেষ্টা করা যাবে। ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা শূন্য ঝুলি ভরাতে পারিনি তাই স্থির করেছি আবার একবার নটবর বেশে যদি কিছু সংগ্রহ করতে পারি। ভেবেছিলুম শীতকালটা কর্মক্ষেত্রের বাইরে কাটা'ব কিন্তু পেটের দায়ে এখানকারই মাটি আঁকড়ে থাকতো হোলো। বরোদা যাবার পথে তোমার দুয়ার ঠেলা দিয়ে যাবার সংকল্প মনে রইলো। যে পর্যন্ত না তুমি মুখ ভার করো তোমার ঘর জুড়ে দিন যাপন করবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু একদিকে বরোদায় বক্তৃতার আসর অন্যদিকে ভবানীপুর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীতে সভাপতির পালা এই দু'য়ের মধ্যবর্তী সময়টি সঙ্কীর্ণ, অতএব আগমনী এবং বিজয়ার মধ্যে দীর্ঘ আয়োজন তোমাকে করতে হবে না। যাই হোক নিতান্তই একজন গায়ক চাই। ইতি ১৫ই নবেম্বর ১৯ ৯।

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

উত্তরায়ণ

কল্যাণীয়েষু,

উত্তরায় রবীন্দ্রনাথ নামক এক ব্যক্তির সম্বন্ধে যে কয়টি কথা লিখেছ তা পড়ে উক্ত নামধারী খুশি হয়েছেন। হবার কারণ এই যে অনেক কথা মনে পড়ে গেল। খামখেয়ালী পর্বের একটা কথা বোধ হয় অযথা হয়েছে—সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের অভিমুখে কৃষ্ণপক্ষের কালিমা উদ্ঘাটন করেছেন তাঁকে আমাদের মজলিসে পাবার সৌভাগ্য হয়নি। তুমি যে ব্যাপারের বর্ণনা করেছ সেটা প্রাক্-খামখেয়ালী যুগের। তখন আমি আমার স্বজন বন্ধুমহলে দ্বিজেন্দ্রলালের খ্যাতির ভূমিকা রচনা করে বেড়াচ্ছিলুম। বস্তুত আমি ছিলুম তাঁর প্রথম ও প্রধান নকীব। তুমি সেদিনকার ইতিহাসের দুই অধ্যায়কে এক অধ্যায়ে মিলিয়েছ। রামগড়ের সেই নির্জন আনন্দের স্মৃতি তোমার এই রচনা

যোগে অন্তরের মধ্যে উদ্বোধিত হোলো।—পলাতকা দিনগুলোকে ফিরে পেতে ইচ্ছে করে, সেদিনকার অমৃতের ভাণ্ডটা সুদ্ধ নিয়ে তারা দৌড় দিয়েছে। আমি পড়ে গেছি ভীড়ের মধ্যে—শান্তির স্নিগ্ধ রসের পাত্রটা উজাড় করে দিয়ে তার মধ্যে খ্যাতির ঝাঁঝালো মদ ভরে দিয়েছে। ইতি ২৮।৩।৩২

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ

১০

শান্তিনিকেতন

প্রিয়বরেষু,

তোমার আম্রাতক পাওয়া গেল। ভোগ সুরু হোলো। লাগচে লখ্‌নৌয়ের টপ্পার মতো—নবাবী স্বাদ অল্পটুকুর মধ্যে গন্ধ ও রস আঁট হয়ে আছে।

এই উপলক্ষে সাঙ্গীতিক ভাষা কেন ব্যবহার করলুম তা' ধূর্জটিকে দেখালে অধ্যাপক হয় তো বুঝতে পারবে। একটা কারণ, তোমার কাছ থেকে যা' কিছু মাধুর্য আসে তার সঙ্গে সিন্ধু-খাম্বাজের মিল পাওয়া যায়, দ্বিতীয় কারণটার আলোচনা আশাজনক বলে বোধ হচ্ছে না। তবু একটা কথা বলে রাখি—প্রাংশুলভ্য ফলের কামনা ত্যাগ করেছি। উদ্বাহু বামনের দাবী যতদূর পৌঁছতে পারে সেখানেও মিঠুয়া গেছের কোনো ফল যদি পতনোন্মুখ হয়ে থাকে তাতেই কাজ চলবে। মাঝারি জাতীয় মানুষ যদি বাঙালী হয় তবে তাকে পেরে উঠ্‌বো না, অন্য প্রদেশীয় হলে বোধ হয় নরম হবে। আর কিছু নয়, এখানে কতকগুলি ভালো গলা আছে তারজন্যে কতকগুলি মিষ্টি গান যদি জোগান দেওয়া যায় তাহলেই আপাততঃ সন্তুষ্ট থাকব। গ্রহ যখন সুপ্রসন্ন হবে তখন প্রণালী পদ্ধতির কথা চিন্তা করে দেখব। কাৎলা রুই তোমাদের ঘরেই থাক আপাততঃ ট্যাংরা হলেই আমাদের লজ্জা নিবারণ হবে। ইতি ২২শে জুলাই ১৯৩২

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর